বিজ্ঞান ও শিক্ষা

দায়বদ্ধতার নিরিখ

দ্বিজেন শর্মা

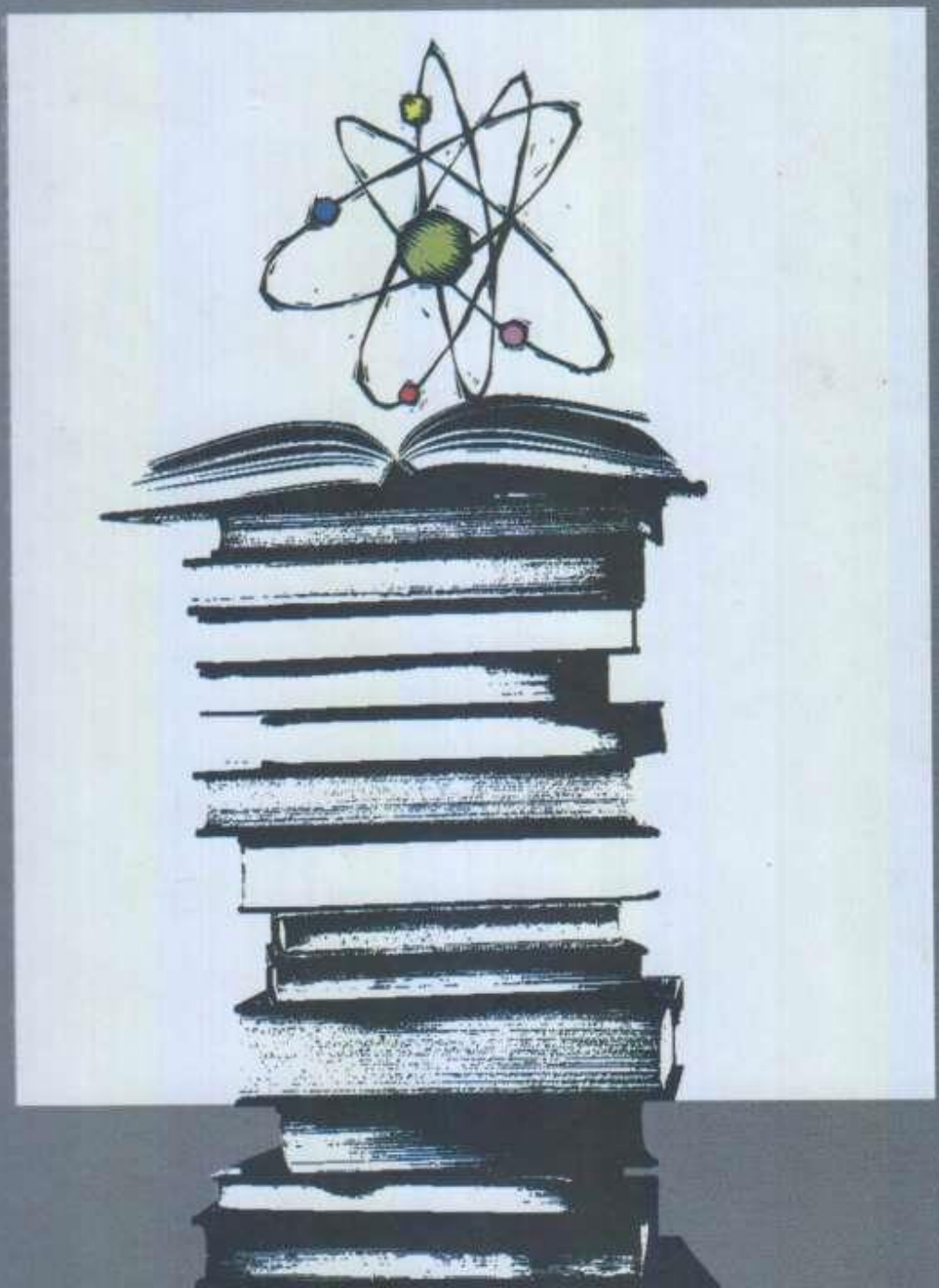

www.pathagar.com

বিজ্ঞান ও শিক্ষা দায়বদ্ধতার নিরিখ

দ্বিজেন শর্মা

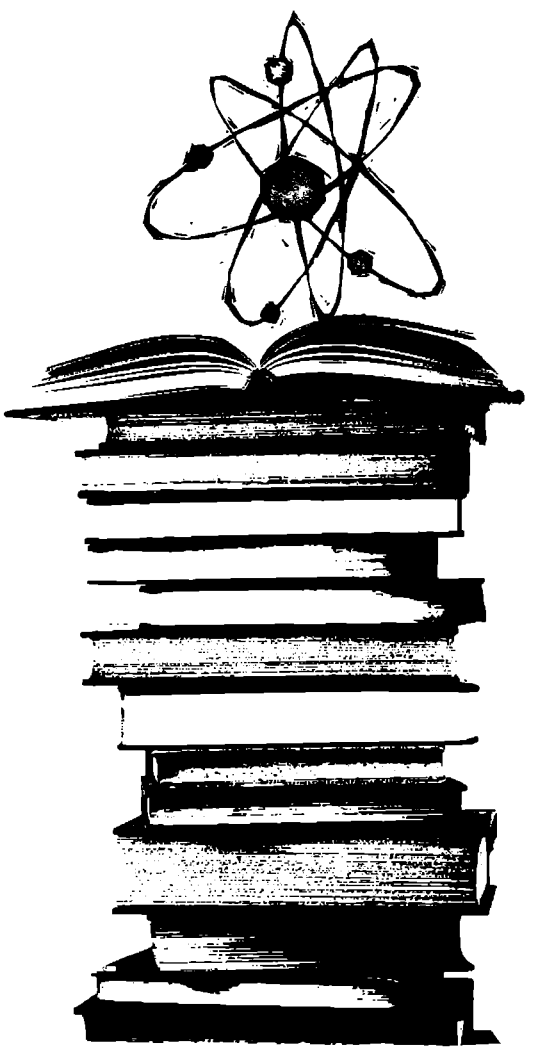

অনিন্দ্য প্রকাশ

www.pathagar.com

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত
অনিন্দ্য সংস্করণ
মাঘ ১৪১৮ বইমেলা ২০১২

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭২৯৬৬, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার
মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৪০৩, ০১৭১৮-০৮২৫৪৫

অক্ষর বিন্যাস
সৃজনী
৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

বানান সমন্বয় : কে. এম মাসুম

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণে : অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭২৯৬৬, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ২৫০.০০

SCIENCE, EDUCATION & SOCIAL COMMITMENT by Dwijen Sarma
Publised by Afzal Hossan Anindya Prokash
30/1Ka Hemendra Das Road Dhaka-1100
Phone 7172966, 01711664970
e-mail : anindy.aprokash@yahoo.com

First Published February 2012

Price : Taka 250.00

US @ 10.00

ISBN : 978-984-414-319-7

www.pathagar.com

'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়'

পূরবী দত্ত
জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত
যুগলেষু

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কিছু কথা
(প্রথম সংস্করণের ভূমিকা)

'একজন শিক্ষকের প্রভাব কোথায় গিয়ে থামবে সেটা তিনি নিজে কখনও বলতে পারেন না'– মার্কিন ইতিহাসবেত্তা ও শিক্ষাবিদ হেনরি অ্যাডামসকৃত (১৮৩৮-১৯১৮) এই উক্তিটি আমাকে নিরন্তর ভাবায়। তবু এটিই আমাকে এই প্রবন্ধগুলি সংকলনে উদ্বুদ্ধ করেছে বলা যাবে না। বরং বহুকাল আগের এইসব লেখার প্রতি এক ধরনের মমত্ববোধই চালিকাশক্তির কাজ করেছে। আরেকটি ইচ্ছাও অন্তর্লীন ছিল – নবপ্রজন্মকে আমার ভাবনাগুলি জানান যাতে তারা বিজ্ঞানী ও শিক্ষকের পেশার প্রতি আকৃষ্ট এবং জনকল্যাণের সঙ্গে বিজ্ঞান ও শিক্ষাকে যুক্ত করতে আগ্রহী হয়। প্রযুক্তির প্রাধান্যের এ-যুগে বিজ্ঞান ও শিক্ষা আপন সমাজপ্রেক্ষিত হারিয়ে ক্রমেই যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। বিশেষীকরণ ও উপযোগবাদে সমর্পিত বিজ্ঞান ও শিক্ষা পরিকল্পনায় ইতিহাস ও সামাজিক অনুষঙ্গগুলি উপেক্ষিত হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায় এবং বাস্তব দৃষ্টান্তও আছে ভুরিভুরি। এক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বড় ক্ষতিটি ঘটেছে শিক্ষার একেবারে ভিত্তিমূলে, স্কুলশিক্ষায় – নবম ও দশম শ্রেণীতে একটি সমন্বিত পাঠক্রমের বদলে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য ইত্যাদি ধারার পৃথকীকরণ এবং অধঃস্তন স্তরে ইতিহাস ও ভূগোলের পরিবর্তে সমাজবিদ্যার পাঠ প্রবর্তন। পরিতাপের বিষয় আমরা এই ভ্রান্তি আজও লালন করে চলেছি।

লেখাগুলি বেরয় মাসিক 'সমকাল', 'গণসাহিত্য', 'দৈনিক সংবাদ' ও 'শিক্ষাবার্তা' সহ নানা পত্রপত্রিকায়। 'সমকাল' সাময়িকীর দুই কর্ণধার সিকান্দার আবু-জাফর ও হাসান হাফিজুর রহমান প্রয়াত এবং সকল প্রশস্তির উর্ধ্বে। লেখাগুলি পত্রস্থ হওয়ার জন্য আমি মফিদুল হক, আবুল হাসনাত, অধ্যাপক ম. আখতারুজ্জামান ও এ. এন রাশেদার কাছে কৃতজ্ঞ। এই ধরনের বই প্রকাশের আর্থিক ঝুঁকি সত্ত্বেও সাহিত্যিকা যে আমাকে নিরাশ করেননি এজন্য এ প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ।

দ্বিজেন শর্মা

৪২ সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা
আগস্ট, ২০০১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গ

দশ বছর পর দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রবন্ধগ্রন্থের জন্য স্বাভাবিক কিন্তু লেখকের জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ, দেশের জন্যও, যেখানে রাজনৈতিক ও আনুষঙ্গিক নানা পরিবর্তন প্রায় নিয়মিত ঘটনা। সামাজিক দায়বদ্ধতার দরুণ লেখক তাতে বিক্রিয়ালিপ্ত হন, লেখেন, পুরানো বইতে সেগুলো যোগ করেন, ফলত নতুন সংকলনের আয়তন বাড়ে। ইদানীং আমার ক্ষেত্রে এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের শিক্ষা ও বিজ্ঞান জগতের দুটি সাম্প্রতিক ঘটনা : একটি নতুন শিক্ষানীতি এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের ছাত্রসংখ্যা হ্রাস। ১৯৭২ সালে প্রণীত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা-কমিশনের পরিকল্পনা ১৯৭৫ সালে বাতিল হওয়ার পর দেড়-দশক সামরিক ও আধা-সামরিক শাসনে অনেকগুলো শিক্ষা-কমিশন গঠিত হলেও কোনো শিক্ষাপরিকল্পনাই কার্যকর হয়নি। কেন হয়নি সেই হিসাব হয়তো মিলান যায়, কিন্তু ক্ষতির অঙ্ক মিলান কঠিন।

যা হোক, অবশেষে একটি নতুন শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। স্কুল পর্যায়ে কিছুটা সুফলও দৃশ্যমান হচ্ছে। কিন্তু বিপুল সংখ্যক ছাত্র, সীমিত আর্থিক সামর্থ্য, সামন্ততান্ত্রিক-ঔপনিবেশিক মানসিকতার জের ইত্যাকার বাধা ঠেলে শেষ পর্যন্ত কতটা সাফল্য অর্জিত হবে বলা কঠিন। আর বিজ্ঞান শিক্ষায় ছাত্রদের বর্ধমান অনীহা কেবল আমাদের নয়, উন্নত দেশেরও সমস্যা। প্রযুক্তি আদতে বিজ্ঞানের উপজাত হলেও প্রযুক্তির চাপে খোদ বিজ্ঞান এখন কোণঠাসা। উৎপাদন ও পরিভোগ সর্বস্ব পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির সংকট, পরিব্যাপ্ত পরিবেশ দূষণ এবং সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনজনিত হতাশা ইত্যাকার প্রকোপে গোটা বিশ্বে মূল্যবোধের মারাত্মক অবক্ষয় ঘটেছে। ফলত দূরদর্শিতার স্থানাপন্ন হচ্ছে নগদ প্রাপ্তি আর সেজন্যই শিক্ষায় প্রযুক্তি ও ম্যানেজমেন্টের এতটা রমরমা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা এখন বিলাসিতায় পর্যবসিত, শুদ্ধ জ্ঞানচর্চা কোণঠাসা। শিক্ষা আজ গোটা বিশ্বে অন্যতম পণ্যে এবং বিদ্যায়তন কারখানায় পরিণত। 'পৃথিবীর গভীরতর অসুখ এখন'। এই অসুখ হতে পারে নতুন কোনো সভ্যতার জন্মপূর্ণ প্রসববেদনার আলামত। এই ধরনের কিছু লেখা আছে এই সংস্করণে আর নতুনত্ব বলতে এটুকুই। বইটি প্রকাশের জন্য অনিন্দ্য প্রকাশ সংস্থার স্বত্বাধিকারী আফজাল হোসেনকে ধন্যবাদ।

দ্বিজেন শর্মা

৪২ সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা
১১ জানুয়ারি, ২০১২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

বিজ্ঞান	**১৩**
গল্পবিজ্ঞান	১৫
বাঙালির বিজ্ঞান সাধনা	১৮
লিসেঙ্কোর বংশগতিতত্ত্ব	২৫
বিজ্ঞান ও সামাজিক বাস্তবতা	৩৬
মানুষের জীবতাত্ত্বিক সম্ভাবনা	৪০
ডেলিভিলস্ চ্যাপ্‌লিন	৫৫
ডারউইন : বিশ্বে ও মহাবিশ্বে	৬৩
ডারউইনবাদ ও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিভাবনা	৬৭
বিজ্ঞান-গবেষণা ও জননৈকট্য	৭২
বোটানিক্‌সের পুরান প্যাঁচাল	৭৮
ব্যাখ্যাতীত ব্যাখ্যার নির্বন্ধ	৮১
উদ্ভিদচর্চায় কল্পনা ও উৎকল্পনা	৮৬
বিশ্বকর্মার বিকল্প	৮৯
রল্যাঁর দিনপঞ্জী : জগদীশচন্দ্র	৯৪
এ কী সমাপন	১০৩
জঙ্গি জে.বি.এস	১০৫
বিজ্ঞানীদের জীবনীপাঠ কেন?	১১২
জীববৈচিত্র্য বিনাশের পূর্বাপর	১১৬
শিক্ষা	**১২৭**
ব্রাত্যজনের শিক্ষাচিন্তা	১২৯
শিক্ষার মুখ ও মুখোশ	১৩৫
শিক্ষাদর্শন, শ্রেণিদৃষ্টি ও বাংলাদেশের বাস্তবতা	১৪৪
শিক্ষানীতির যৎকিঞ্চিৎ	১৪৮
আমলাতন্ত্রের গাঁট	১৫১
শিক্ষকের চিরায়ত দায়ভার	১৫৪
এ কেবল ফুটাপাত্রে	১৫৯
বরিশালে একদিন	১৬২
রত্ন ও রত্নগর্ভা	১৬৫
নিষিদ্ধ কথা, অসভ্য কথা	১৬৮

www.pathagar.com

স্মরণ ১৭৩
আছো অন্তরে ১৭৫
উষর জমিনের হলধর ১৭৭
চোখ জুড়ে আছে ১৮০
কী ফুল ঝরিল ১৮৪
অঝোর অশ্রুজলে ১৮৬
স্যারকে হার্দ ভালোবাসায় ১৮৮
অধ্যাপক ইসলাম : বন্ধু ও শিক্ষক ১৯১
মীজান ক্ষমা করো ১৯৬
অধ্যাপকের স্মরণসভা ১৯৯

www.pathagar.com

বিজ্ঞান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গল্পবিজ্ঞান

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ন্যাচারাল হিস্ট্রি বিভাগের হল-ঘরে ঢুকেই সামনে স্যার রিচার্ড ওয়েনের আবক্ষ মর্মরমূর্তিটি দেখে সে বিরক্ত হয়। সব দেশে সব যুগেই যে একদল কর্তাভজা আত্মোন্নতিকামী বিজ্ঞানী থাকেন তাদের দলভুক্ত বলেই নয়, রিচার্ড ওয়েনে আত্যন্তিক অসূয়াই এই বিজ্ঞানীকে তার কাছে অশ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। সে খুঁটিয়ে তাঁর মূর্তিটি দেখে : বোঁচা নাক, ধূর্ত চাহনি এবং বিখ্যাত সেই 'সার্জিক্যাল হাসি'। একদা চার্লস ডারউইনের বন্ধু ও সহযোগী এবং পরবর্তীকালে ডারউইন ও বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে কুটিল ষড়যন্ত্রের জালবিস্তারের নায়ক হিসাবে কুখ্যাত এই বিজ্ঞানীকে 'শয়তানকে প্রদেয় প্রশংসাযোগ্য' নীতিতে বিশ্বাসী ইংরেজরা প্রাজ্ঞ প্রত্নজীববিদ ও দক্ষ সংগঠকের প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করে নি। তখনই বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বিভাগীয় প্রধানের কথা মনে পড়ে। চেহারা ভিন্নতর হলেও চরিত্রে ওয়েন-সদৃশ এই বিজ্ঞানীটিকে নিয়ে সে অনেক ভেবেছে এবং এখন আরও তীব্রভাব ভাবছে। বিশ বছর আগে তার এখানে আসার কথা ছিল, কিন্তু তার ওই শিক্ষকের জন্যই তা সম্ভব হয় নি। নিজেকে নমনীয় করার জন্য কতবার সে আপন ভাগ্যকে দোষ দিয়েছে, 'স্লিপ আন্ডার দ্য মাইক্রস্কোপ' গল্পের নায়কের নিয়তিতে তুষ্টি খুঁজেছে, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার ঐতিহ্যে অনড় থাকতে চেয়েছে, কিন্তু বৃথা। একজনের একটি কলমের খোঁচায় নির্দোষ একটি মানুষের ভাগ্যে যে কতটা বিড়ম্বনা ঘটে, দুর্ভর অভিজ্ঞতার সেই দুঃসহ বোঝাটি সে অদ্যাবধি বয়ে বেড়াচ্ছে এবং বাকি জীবনও বয়ে বেড়াবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষবর্ষে থিসিসের মালমস্‌লা সংগ্রহকালে অন্ত্যজ উদ্ভিদবর্গের একটি নতুন প্রজাতি সে খুঁজে পেয়েছিল। তার তত্ত্বাবধায়ক এই সাফল্যে শোরগোল তোলেন, বিভাগে হৈ চৈ পড়ে যায় এবং পরীক্ষা শেষে একটি প্রথম শ্রেণী প্রাপ্তির নিশ্চয়তা নিয়ে সে স্বগ্রামে ফেরে। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণার স্বপ্নে মশগুল থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল এবং এই সুবাদে নিজেকে প্রাণের উৎসসন্ধানী এক বিজ্ঞানী বানিয়ে একটি চটকদার গল্পও লিখে ফেলেছিল। কাগজে গল্পটি ছাপা হলেও তার স্বপ্ন সফল হয় নি। তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে রেষারেষি কিংবা অবোধ্যতর কোন কারণে বিভাগীয় প্রধান তার গলায় দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিগ্রির যে ঘন্টিটি ঝুলিয়ে

www.pathagar.com

দেন তাতে মধ্যযুগীয় কুষ্ঠরোগীর মতো গুহাবাস তার নিয়তি হয়ে ওঠে এবং মফস্বল কলেজের বিবর্ণ প্রাত্যহিকতায় কালাতিপাত ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

দুই দশক পর আজ যখন তার অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছেছে তখন সে তো চিটায় পর্যবসিত, খোলসের ঠাট থাকলেও অন্তর্বস্তু ততদিনে বন্ধ্যাত্বপ্রাপ্ত। এক সময় দু'তলার সিঁড়ি বেয়ে সে আপন দুর্ভাগ্যের একক শরিক ওই অন্ত্যজ উদ্ভিদ-প্রজাতির খোঁজে একটি দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। ঘন্টি বাজাতেই যে-ইংরেজ যুবকটি দরজা খুলে দাঁড়ায় সে তার জৌলুসহীন কৃষ্ণাঙ্গ চেহারাটি জরিপ করে যখন জানায় যে কক্ষটি সাধারণ প্রদর্শনী নয়, শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞদের মৌরসী এলাকা তখন গোটা জীবনের ব্যর্থতাজনিত ক্রোধের দাহ তাকে আত্মবিশ্বাস যোগায় ও সে নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করে : 'আমি একজন বিশেষজ্ঞ।' সাহেব তনয় তার ঐতিহ্যিক ভব্যতায় নত হয় এবং সহাস্য স্বাগত জানায়। সে ঘুরে ঘুরে গোটা বিভাগটা দেখে। অসংখ্য হার্বোরিয়াম শিটের সঙ্গে শত শত বয়ামে রাখা অজস্র তরতাজা নমুনা। কতক সে চেনে, কতক অচেনা। সারা বিশ্বের নমুনাসমৃদ্ধ এই সংগ্রহশালায় কাজ করার কল্পনা তাকে উজ্জীবিত করে এবং সে তার আবিষ্কৃত প্রজাতিটি খোঁজে। না, কোথাও হদিশ মেলে না। তবে কি সন্ত্রস্ত তত্ত্বাবধায়ক নমুনাটি পাঠান নি, কিংবা পৌঁছয় নি কোন অজ্ঞাত কারসাজিতে, নাকি আরেকটি অন্তর্ঘাত? সে ক্লান্তি বোধ করে এবং কোণের একটি চেয়ারে বসে হাঁপায়। এই মুহূর্তে ঘরটিকে অত্যন্ত শ্বাসরুদ্ধকর মনে হয়। সে ছুটে বেরিয়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচতলায় এসে দাঁড়ায় আর তখনই চোখে পড়ে দেয়ালে টানান ছোট ফ্রেমে বাঁধান কাগজের একটি কাটিং—এক মহিলার ছবি, পাশে এক টুকরো ফসিল, ভূবিদ গিডিওন ম্যান্টেলের স্ত্রী ও তাঁরই আবিষ্কৃত ডায়নোসরের দাঁত। এক যুগ আগে পড়া পুরো ঘটনাটি তার সামনে ঝলকে ওঠে।

ইংল্যান্ডের মিডহার্স্ট শহরের বাসিন্দা গিডিওন ম্যান্টেল একাধারে নামী সার্জন ও ভূবিদ। ছায়াসঙ্গিনী বিদুষী স্ত্রীকে নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান পাহাড়ে, গিরিখাতে, খনিগহ্বরে, সংগ্রহ করেন নানা ধরনের পাথর আর বিলুপ্ত জীবজগতের সাক্ষ্যবহ বিচিত্র ফসিল। স্ত্রী একদিন খুঁজে পান জুরাসিক যুগের তৃণভোজী ডায়নোসর ইগুয়েনডনের একটি দাঁত এবং এই সূত্র ধরেই স্বামী আবিষ্কার করেন ওই অতিকায় দানবের অস্থিপুঞ্জ। এভাবেই সংগৃহীত হয় 'দ্য ফসিলস্ অফ সাউথ ডাউন' গ্রন্থের মালমশলা এবং এর সবগুলো ছবি আঁকেন ম্যান্টেলের স্ত্রী। কিন্তু বিজ্ঞানের আদর্শে উৎসর্গিত এই দম্পতির জীবন শেষাবধি সুখের হয় নি। তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে এবং নিঃসঙ্গ, চরম হতাশাপীড়িত ম্যান্টেল ভূতত্ত্ব পরিত্যাগ করেন, বিপুল সংগ্রহসহ ব্রাইটন শহরের তাঁর নিজস্ব ভবনটি দান করেন স্যাসেক্স বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটকে।

ব্রিটেনের বিজ্ঞানী সমাজ ম্যান্টেল পত্নীর সামান্য অবদানটুকুও ভোলে নি, সেটা সযত্নে ধরে রেখেছে দেশের সেরা জাদুঘরে। কিন্তু তার নীলমণি প্রজাতিটি? তার

www.pathagar.com

কি হদিশ আছে স্বদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংরক্ষণাগারে? কেউ কি মনে রেখেছে তাকে? সে নিশ্চিত হতে পারে না। বিভ্রান্ত হয়ে সে হেঁটে বেড়ায় লন্ডনের পথে পথে। এক সময় যানবাহন, যাত্রীদের কোলাহল আর কানে পৌঁছয় না, দূরাগত অন্যতর এক শব্দপুঞ্জ মন্ত্রধ্বনির মতো তাকে আবিষ্ট করে — 'কাট ইওর ডিজায়ার, ইউ উইল বি হ্যাপি,' বুদ্ধভক্ত তার অবাঙালি তত্ত্বাবধায়ক ড. খানের মুখে বহুশ্রুত স্বগতোক্তি। তবে কি আকাঙ্ক্ষার বিনাশেই সুখ? সে কেবলই ভাবে আর ভাবে, হাঁটে আর হাঁটে, তবু বিধ্বস্ত আকাঙ্ক্ষার দুঃসহ অন্তর্জ্বালা কিছুতেই প্রশমিত হয় না।

www.pathagar.com

বাঙালির বিজ্ঞান সাধনা

'বড় অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলো কেবল ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এ দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।'

—রবীন্দ্রনাথ, *বিশ্বপরিচয়*

বিজ্ঞান আলোকবাহী হয়েও ম্যাজিকের আত্মজ এবং ম্যাজিক যেহেতু অন্ধকারাশ্রয়ী, তাই জন্মলগ্নের পরপরই বিজ্ঞানের সঙ্গে অন্ধকারের সংঘাত শুরু এবং জয়-পরাজয় অদ্যাবধি অমীমাংসিত। বিজ্ঞানের আলোকিত দিগন্তের পারে যে অন্ধকার, তার অবয়ব আমাদের পূর্বধারণা অপেক্ষা বিশালতর। আশাবাদ সত্ত্বেও এখন মনে হয়, বিজ্ঞান যেন সিসিপাসেরই অন্বিষ্ট, অন্ধকারের দুর্ভর বোঝা বহন যার কোনোদিনই শেষ হবার নয়।

বিজ্ঞানে দুর্দৈবের অনুপ্রবেশ ইদানিংকালের ঘটনা। আগ্রাসী ধনতন্ত্রের পরিণতি হিসেবে বিশ্বযুদ্ধ ও উপনিবেশবাদের সঙ্গে তা জড়িত। বিজ্ঞান একদা মানব-সভ্যতার সামনে সম্ভাবনার এক দীপ্র দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। সভ্যতার যাত্রাপথে বিজ্ঞান ছিল আলোকবর্তিকা।

শিল্পবিপ্লবোত্তর ইউরোপে যখন বিজ্ঞান বিকশিত, আমাদের দেশে তখন মধ্য-যুগের অন্ধকার। ইউরোপে অন্ধকার যুগ অর্ধ-সহস্র বৎসর স্থায়ী হলেও আমাদের দেশে তার পরমায়ু ছিল প্রায় দ্বিগুণ। প্রতাপান্বিত এই অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের অর্জিত বিজয়ের মাত্রাই আজ আমাদের বিজ্ঞান সাধনায় সাফল্যের মাপকাঠি। আমরা জানি, এ সাফল্য কতো সীমিত এবং নিকটতম পরিপার্শ্বের অন্ধকার কতো নিশ্ছিদ্র ও নিবিড়।

পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমাদের সংযোগের ফল যে-রেনেসাঁ, বাঙালির বিজ্ঞানচিন্তা তা থেকে অবিচ্ছিন্ন। তাই নবজাগৃতির বহুমাত্রিকতায় বিজ্ঞানও বিদ্যমান ছিল। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, আব্দুল লতিফ প্রমুখের বিজ্ঞানোৎসাহ এবং সর্বজ্ঞানকে আত্তীকরণের রেনেসীয় প্রবণতা সহজলক্ষ্য। এই মনীষীরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের মতো ফিউডালমনস্ক ছিলেন না বলেই নব্য চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে বিজ্ঞানও সাদর সমাদর পেয়েছিল। আমরা জানি, সমৃদ্ধ অতীত সত্ত্বেও গুপ্তযুগের পর ভারতীয়

www.pathagar.com

উপমহাদেশে বিজ্ঞানচর্চার আর প্রসার ঘটে নি। তাই একাদশ শতকে আল-বিরুনী ভারত ভ্রমণে এসে আর্যভট্ট বরাহমিহিরের উত্তরসূরিদের দেখে হতাশ হয়েছিলেন। জাতিভেদপ্রথার জাড্য, সংস্কৃতের দাপটে নবোদ্ভূত ভাষাসমূহের অবদমন, বিদেশের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা, নিরন্তর দ্বন্দ্বকলহ, শ্রম থেকে কল্পনার বিচ্ছেদ ইত্যাদি কারণে হিন্দু-রাজত্বের শেষপাদে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সাধানায় যে-সংকট প্রকট ছিল, মুসলিম শাসনের স্বর্ণযুগেও তার কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্ব একচেটিয়া সামন্ততন্ত্রের যুগ। সম্রাট যেখানে সর্বধনের অধিকারী সেখানে মধ্যবিত্তের পুঁজি-সঞ্চয় এবং শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষিত সৃষ্টি অসম্ভব এবং সেজন্য বিজ্ঞান সেখানে দরবারাশ্রিত সংস্কৃতির একটি উপাঙ্গ এবং সেইসঙ্গে বিষ্টব্ধও।

অবশ্য এ নিয়ে নব্যবাঙালি বিজ্ঞানীর কোন উদ্বেগ ছিল না। তার বিজ্ঞানের উত্তরাধিকার প্রাচীন অথবা মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে মূলিভূ নয়। এদেশের আধুনিক বিজ্ঞান পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের অবদান এবং তা সমুদ্রপার থেকে আমদাকৃত ও অভিযোজিত। সন্দেহ নেই, এই বিজ্ঞান প্রাকৃতিক অরণ্যের অবয়ব অর্জন করে নি, লালিত হয়েছে গ্রিনহাউসের নাজুক গাছপালার মতো বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারের নিরাপদ চত্বরে। আজ কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বিজ্ঞানের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে আমরা বরাহমিহির অথবা জাবির ইবনে হাইয়ান অপেক্ষা কুপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন ও ডারউইন প্রমুখদেরই ঘনিষ্ঠতর উত্তরসূরি। ইউরোপের ক্ষেত্রেও তা সত্য। তাদের বিজ্ঞানও গ্রিক-ঐতিহ্যের ক্রমবিকাশের ফসল নয়, শিল্পবিপ্লবেরই অবদান এবং মাঝখানে মধ্যযুগের দীর্ঘ বিস্তার। তাই হিন্দু রসায়নের ইতিহাস, বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান, হিন্দু-প্রাণিবিজ্ঞান ইত্যাদি গ্রন্থের গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দেহ না করেও বলা যায়, এগুলো থেকে আধুনিক বাঙালি বিজ্ঞানীর পক্ষে সৃজনশীল অনুপ্রেরণা লাভের সম্ভাবনা তেমন উজ্জ্বল নয়। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের আলোচনা থেকে এমন সব বিভ্রান্তির উদ্ভব ঘটে, যা স্পষ্টতই বিজ্ঞানের পক্ষে ক্ষতিকর। সংগঠিত ধর্ম ও উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা মুক্তচিন্তার বিরোধী বিধায় ঐতিহ্যের নামে বিজ্ঞানে এদের অনুপ্রবেশ ঈপ্সিত নয়। বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকতা সর্বজন ও সর্বকাল স্বীকৃত এবং ধর্মের সঙ্গে তার আত্মীয়তা কোনোকালেই নিবিড় নয়। অবশ্য ধর্ম যেখানে ব্যক্তিক বিশ্বাস এবং আত্মিক সাধনামাত্র সেখানে বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সহাবস্থান যৌক্তিক। মুক্তবুদ্ধি ও নব্য-জাতীয়তাবাদী চেতনায় প্রটেস্টান্টবাদ একদা বিজ্ঞানের অনুকূলে যে-ভূমিকা পালন করেছিল ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা এক নতুন ঘটনা। সমাজবিবর্তনের অভিঘাতে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি হিন্দুর ধর্মচিন্তায় সূচিত পরিবর্তন এদেশে বিজ্ঞানবিকাশের অন্যতম পূর্বশর্ত পূরণ করেছিল। সংগঠিত ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সংঘাত মূলত সমাজের অন্তরাশ্রয়ী শক্তিদ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশের অংশমাত্র। সামন্ততন্ত্র

www.pathagar.com

থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণকালে প্রাচীন মূল্যবোধের অনিবার্য পরিবর্তনের সময় প্রাচীন ম্যাজিকের দুই আত্মজ ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব শুরু হয় আসলে স্থান-বিনিময়ের জন্যই। বিজ্ঞান ধনতন্ত্রের দর্শন এবং ধর্ম তখন একটি ব্যক্তিক বিশ্বাসে পর্যবসিত। রূপান্তরকালীন এই দ্বন্দ্ব অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না, সমাজে স্থিতাবস্থা ফিরলে ধর্ম ও বিজ্ঞান অবশেষে স্ব-স্ব স্থান খুঁজে পায় এবং নির্বিঘ্ন সহাবস্থানে স্বস্তি আবিষ্কার করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুধর্মের সংস্কার আন্দোলনে উদ্ভূত ক্ষোভ এবং শেষাবধি গড়ে ওঠা আপস মূলত এ প্রক্রিয়ারই ফল। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য এ আন্দোলন গ্রামবাংলার সংস্কৃতিকে স্পর্শ করে নি, সেখানে ধর্ম, দারিদ্র্য ও আনুষঙ্গিক কুসংস্কার মধ্যযুগীয় অন্ধকারের আশ্রয়ে নির্বিঘ্ন ছিল এবং ইংরেজের ভূমিসংস্কার তার জন্য অধিকতর দারিদ্র্য ব্যতীত আর কোনো আশ্বাসই বয়ে আনেনি।

কেরী সাহেব যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকবর্তিকা নিয়ে এদেশে আসেন, তখনো বঙ্গভূমিতে মধ্যযুগ অবসিত নয়। আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতৃপুরুষেরা সেকালেও সতীদাহ ও গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জনের পুণ্যপরিমাপে ব্যস্ত। তাই কেরী সাহেব তাদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি থেকে এ দীপশিখাকে সযত্ন সতর্কতায় আড়াল করে রেখেছিলেন দীর্ঘদিন। কেরী বাংলাদেশে নবজাগৃতির উদ্বোধক। পাশ্চাত্য মনীষার প্রতীক এ ব্যক্তি ছিলেন বিবিধ জ্ঞানের এক আশ্চর্য সংশ্লেষ। কেরীর বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সর্বাধিক স্বল্পজ্ঞাত তাঁর বিজ্ঞান-সাধনা। বাংলাদেশে উদ্ভিদবিজ্ঞানে কেরীর অবদান উল্লেখ্য। তাঁর স্বনামখ্যাত পুত্র ফেলিক্স কেরী 'বিদ্যাহারাবলী' দিয়েই বঙ্গজননীর কণ্ঠে বিজ্ঞানের প্রথম হারটি পরিয়েছিলেন। মূলত এ ছিল বিজ্ঞান-বিশ্বকোষের অধ্যায়বিশেষ। অতঃপর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত প্রায় সব ক'টি বিজ্ঞানগ্রন্থই ইউরোপীয়দের রচনা : ইয়েট্‌স লিখেছেন পদার্থবিদ্যাসার, মে গণিত, হার্ল ভূগোল, ম্যাক কিমিয়াবিদ্যাসার (রসায়ন), লোসন পশ্বাবলী (জীববিদ্যা)। এসব গ্রন্থ দিয়েই বাঙালির বিজ্ঞানশিক্ষার সূত্রপাত। এই বাংলা বইগুলো সংস্কৃত ও ফার্সিতে লেখার প্রস্তাবও ছিল, কিন্তু শেষাবধি বাংলারই জয় হয়েছিল। এতে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যার বই লিখেছিলেন রামমোহন। বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন বিজ্ঞান বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ। স্মর্তব্য, 'নেটিভদের' মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশে যথাক্রমে ১৮১৭ ও ১৮৫৪ সালে 'স্কুল বুক সোসাইটি' ও 'শিক্ষাপরিষদ' গঠিত হলেও ডালহৌসির শাসনকালের (১৮৪৬-৫৬) আগে সঙ্গত কারণেই এদেশে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসার ঘটেনি। মার্কস নির্ভুলভাবে এ সময় ভারতবর্ষে রেললাইন নির্মাণ ও টেলিগ্রাফ প্রবর্তনের তাৎপর্য লক্ষ করেছিলেন। যন্ত্রশিল্পের প্রসার ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণের মধ্যেই অনেকটা নিহিত ছিল এদেশের প্রগতির সম্ভাবনা ও বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ।

www.pathagar.com

১৮৫৭ সালটি বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যশীল। সিপাহীবিদ্রোহের ঘটনাটি শুরু বাংলাদেশের ব্যারাকপুরে। অথচ ভারতবর্ষের এই প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিঘাতে বঙ্গদেশ আলোড়িত হয় নি। এসময়ই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রতিষ্ঠা, বিদ্যাসাগর তখন শিক্ষাপুনর্গঠনে ব্যস্ত এবং তাঁরই উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে 'পশ্বাবলী' দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ' ও 'পদার্থবিদ্যাসার' এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'প্রকৃতিবিজ্ঞান'। সিপাহীবিদ্রোহে বাঙালির অনীহা এজন্য যে, নবজাগ্রত মধ্যবিত্তরা তখন এক নতুন প্রত্যাশায় পাশ্চাত্যমুখী। মধ্যযুগের ভারতবর্ষ থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতা তখন বহুদূর সম্পূর্ণ এবং স্বীয় শ্রেণীস্বার্থে ইংরেজের ঔপনিবেশিক অভীপ্সার সঙ্গে স্পষ্টতই গ্রন্থিবদ্ধ। অথচ মাত্র অর্ধশতাব্দী পরই স্বাধীনতা সন্ধানী বাঙালি মধ্যবিত্ত অনুপ্রেরণার জন্য সিপাহী বিদ্রোহের দ্বারস্থ হয়েছে।

বাঙালি মধ্যবিত্তের এ দোদুল্যমান চরিত্রের কারণ দুর্লক্ষ নয়। যে-শ্রেণী ঔপনিবেশিক প্রয়োজনে উদ্ভূত, পর্যাপ্ত সম্ভাবনা সত্ত্বেও তার পরমায়ু স্বল্পস্থায়ী। গ্রামবাংলার ধ্বংস ও শোষণের মধ্যে যে-শ্রেণীর উদ্ভব, কোন শিল্পবিপ্লব যাদের লালন করে নি, বিষ্টব্ধতা ও ক্ষয়ই তার নিয়তি। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিস্তৃত বিকাশও অসম্ভব। শিল্প-সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞানের বিকাশ অধিকতর বস্তুনির্ভর বিধায় বাঙালি সংস্কৃতিতে বিজ্ঞানের অবদান অপেক্ষাকৃত কম। বিজ্ঞানশিক্ষার প্রারম্ভকালে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, বাঙালি বিজ্ঞানীরা নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পান নি।

মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন বাংলায় আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম সংগঠক। চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্নাতক অথচ হোমিওপ্যাথ, এ অদ্ভুত চরিত্রের মানুষটির নিরলস চেষ্টার ফল 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব সায়েন্স'। ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থার ছত্রছায়াতেই লালিত এদেশের বিজ্ঞানান্বেষা। বাঙালির বিজ্ঞান সাধনার এ পর্বে মহেন্দ্রলালের সঙ্গে যারা বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখ্য সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ফাদার লাফোঁ, নবাব আব্দুল লতিফ, বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। জগদীশচন্দ্র বসুর শিক্ষক ফাদার লাফোঁ বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ। নবাব আব্দুল লতিফের উদ্যোগে এসময়ই 'মুসলিম লিটারারি সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা, যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজে বিজ্ঞান প্রচার এবং ফাদার লাফোঁ ছিলেন এই সমিতির অধিবেশনে নিয়মিত বক্তা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং মহেন্দ্রলালের বিজ্ঞানসংস্থাকে কেন্দ্র করেই বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার সূত্রপাত। এসব সংস্থার সামগ্রিক অবদান জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখের বিজ্ঞান

www.pathagar.com

সাধনায় মূর্ত। স্বনামখ্যাত সরোজিনী নাইডুর পিতা অঘোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম বাঙালি বিজ্ঞানী। ১৮৮৩ সালে এডিনবরা থেকে রসায়নে ডি.এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেও স্বদেশে তিনি বিজ্ঞানী হিসেবে কোন চাকরি পান নি। শাসনবিভাগে তাঁর প্রতিভার অপচয় ঘটেছিল। স্যার সি. ভি. রমনের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটে নি। বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও অর্থবিভাগের আমলা হয়েই মাদ্রাজ থেকে তাঁর কলকাতা আসা। গণিতে মৌলিক গবেষণা সত্ত্বেও শেষাবধি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। এঁরা সকলেই যুক্ত ছিলেন মহেন্দ্রলালের বিজ্ঞানসংস্থার সঙ্গে। প্রতিভার এ অপচয়ে ক্ষুব্ধ মহেন্দ্রলাল তাই বিজ্ঞান সংস্থার পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে বলেছিলেন *I have failed in fulfilling a task which I have imposed upon myself.* এমন পরিণতি অনিবার্য ছিল। বন্ধ্যাভূমিতে লাগান বীজের মহীরুহত্ব অত্যাশা বৈকি।

কিন্তু মহেন্দ্রলালের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। তাঁর বিজ্ঞানসংস্থার কল্যাণেই সি ভি. রমন, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ বিজ্ঞানীর সার্থক গবেষণা এবং বাঙলা সংস্কৃতিতে তাঁদের পরবর্তীকালীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্ভব হয়েছিল। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র যেন বাঙালি মানসের দুই সমান্তরাল ধারার প্রতীক। জগদীশচন্দ্র দর্শনান্বেষী ও কাব্যানুরাগী, কিন্তু বাস্তববাদী প্রফুল্লচন্দ্রের মন ইতিহাস ও রাজনীতিতে আকৃষ্ট। তাই জগদীশচন্দ্র যখন বসুবিজ্ঞানমন্দিরে মৌলিক গবেষণায় নিরলস, প্রফুল্লচন্দ্র তখন রসায়নের 'ফল ফলাবার আশায়' ওষুধপ্রস্তুত কারখানা সংগঠনে ব্যস্ত। বাঙালিকে ব্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রয়াস তাঁর সমাজ সচেতনতার সাক্ষী। সম্ভবত এ দুই সমান্তরাল দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালির বিজ্ঞান সাধনায় আজও অস্পষ্ট নয়। মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন বসুর মধ্যে স্পষ্টতই এ দুই প্রবহমান ধারা বিদ্যমান। উৎপাদনী শক্তির কেন্দ্রভূমিতে বিজ্ঞানের স্থায়ী ভূমিনির্মাণের প্রয়াসে মেঘনাদ সাহার বামপন্থী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং আনুষঙ্গিক বিয়োগান্তক ঘটনাবলি আমরা জানি। সত্যেন বসু তাঁর দার্শনিক বিচ্ছিন্নতায় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকেও বিষণ্নতার গ্রাস এড়াতে পারেন নি। বিজ্ঞানকে স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠায় তাঁর চেষ্টা মেঘনাদ সাহার মতো বৈপ্লবিক না হলেও প্রচ্ছন্ন প্রতিরোধে সফল হয় নি। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গত দাবি সম্পর্কে শ্রী বসুর আন্দোলন আজও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে নি। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের এ দুই উত্তরসাধক স্বাধীন স্বদেশে তাদের পূর্বসূরিদের তুলনায় আশানুরূপ উজ্জ্বলতা লাভে ব্যর্থ এবং এতেই সুস্পষ্ট বাঙালির বিজ্ঞান সাধনার সংকট।

পাকিস্তানের উপনিবেশ পূর্ববঙ্গে বিজ্ঞান সমস্যা স্বাভাবিক কারণেই জটিলতর ছিল। পশ্চিমা প্রভুদের মনোযোগ এখানে উৎপাদনী শক্তির উন্নয়ন অপেক্ষা শোষণেই অধিকতর নিবিষ্ট থাকায় বিজ্ঞান এখানে ব্রিটিশ আমলের মতোই

www.pathagar.com

অবহেলিত হয়েছে দীর্ঘদিন। একসময় কলকাতা প্রত্যাগত বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার জন্য চাকরিস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে শিক্ষাপ্রশাসনে। পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্য হ্রাসের নামে এখানে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সংস্থাগুলো ছিল শিক্ষা ও উৎপাদান ব্যবস্থা থেকে দূরস্থ, গজদন্তমিনারবৎ। দেশের মূল প্রাণপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন এ বিজ্ঞানে ব্যর্থতা অনিবার্য ছিল। তাই পাকিস্তানের দু'দশকে এখানে বিজ্ঞানভবন, গবেষণাগার এবং কিছু সংখ্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানকর্মী তৈরি হলেও জন্মলাভ করে নি সৃজনশীল বিজ্ঞান-মানসিকতা, বরং স্থূলবর্তী হয়েছে বিজ্ঞানের প্রধান প্রতিপক্ষ, আমলাতন্ত্র। তাছাড়া ধর্মান্ধতার জোয়ারে প্রগতিকে প্লাবিত করার রাজনৈতিক অপচেষ্টায় বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সমভাবেই।

বাংলাদেশ আজ স্বাধীন বিধায় এ প্রত্যাশা খুবই সঙ্গত যে, বিজ্ঞান এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমাজে তার যথাযথ ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে প্রায় সর্বদাই আসমান-জমিন ফারাক থাকে। উন্নতিকামী দেশে দৃশ্য-অদৃশ্য প্রতিবন্ধে প্রায় কোন প্রকল্পই সঠিকভাবে রূপায়িত হয় না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটে না। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতবর্ষের বিজ্ঞান প্রয়াস এজন্য বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার উদাহরণ থেকে শিক্ষালাভ আবশ্যক। প্রসঙ্গত জনৈক ভারতীয় বিজ্ঞানীর কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য : *'while more and more investment is being made on research apparatus in the country, the investigation is getting stagnant, if not worse...ninety percent of the research personnel and research units in our country is unproductive...a colosae wastage of scientific manpower and facilities...it is quite clear that there is a crisis of leadership in Indian science. Our nation does not lack idealism particularly in science, However, the idealism among the young aspeirants is nipped at the bud due to unwholesome atmosphere where we see organized groups of sycophants, snobs, scientists, politicians and self-seekers putting spoke in the wheel of scientific progress in our country.'* উন্নতিকামী দেশসমূহের সমস্যাবলির পারস্পরিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও তাদের বিভিন্নতাও কম নয়। তাই সমাধানের পথনির্দেশও কোন বিশেষ ফর্মুলায় নিহিত নেই। আমাদের উন্নয়ন ও বিজ্ঞান পরিকল্পনা নিজেদের বিশেষ অবস্থা ও প্রত্যাশার ওপরই নির্ভরশীল। বাংলাদেশে বিজ্ঞান গবেষণা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই প্রয়োজন; ১. উৎপাদনী শক্তির সার্বিক বিকাশের সঙ্গে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের সংযোগ; ২. মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসার; ৩. বিজ্ঞানশিক্ষার মানোন্নয়ন; ৪. নিরক্ষরতা দূরীকরণ; ৫. যথাযথ অবকাঠাম ব্যতিরেকে উচ্চশিক্ষার অবাধ প্রসার রোধ; ৬. বিজ্ঞান গবেষণার জন্য সুসমন্বিত

www.pathagar.com

কার্যক্রম গ্রহণ এবং একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট কালক্রম নির্দেশ; ৭. বিজ্ঞানসংস্থাসমূহের পরিচালনা গণতন্ত্রীকরণ এবং তরুণ বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দান; ৮. গবেষণা-অনীহ প্রবীণ বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানসংস্থা থেকে অপসারণ; ৯. বিজ্ঞানপরিকল্পনায় বিজ্ঞানসংস্থার সমস্ত সক্রিয় গবেষকদের মতামত গ্রহণ; ১০. বেতন ও চাকরির শর্তাবলির ক্ষেত্রে অসঙ্গতি বিলোপ; ১১. ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও সরকারি প্রভাবের পরিমণ্ডল থেকে বিজ্ঞানসংস্থার মুক্তি; ১২. সরকারাণুগত্য অপেক্ষা বিজ্ঞানানুগত্যে উৎসাহ দান; ১৩. স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পঠনপাঠন ও গবেষণার প্রসার; ১৪. মেধাপাচার বন্ধ; ১৫. বিজ্ঞান সংস্থায় আমলাতন্ত্রের প্রসার রোধ; ১৬. বিদেশে বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণের জন্য বাস্তবানুগ ও ফলদ পরিকল্পনা; ১৭ বিদেশি কৃতী বিজ্ঞানী ও বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙালি বিজ্ঞানীদের জন্য দেশে কাজের সুযোগ সৃষ্টি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, বলাবাহুল্য, বিজ্ঞানীদের নিজস্ব ভূমিকাই এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যতর কোন বিকল্প নেই। সৃজনশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি সমাজের দায়িত্ব, কিন্তু সৃজনশীলতা একটি ব্যক্তিক গুণ এবং প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে তাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়ও খোদ ব্যক্তির। উন্নতিকামী দেশে বিজ্ঞানে ব্যক্তিক ভাবমূর্তির প্রভাব ও প্রয়োজন অপরিসীম। নিরলস কর্ম, নিষ্ঠা ও সহকর্মীদের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধের মধ্যেই আমাদের বিজ্ঞানীরা গড়ে তুলতে পারেন একটি সৃজনশীল বিজ্ঞানীগোষ্ঠী। গবেষণার ক্ষেত্রে বিদ্যমান যাবতীয় প্রতিবন্ধ ইচ্ছার প্রাবল্যে অপসৃত হতে পারে। প্রসঙ্গত আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর একটি উক্তি স্মরণীয় : *'It is the habit of weakness to throw blame on others, on the university, on the government, on unfavourable circumstances in general. It in not for a man to complain of circumstances but bravely accept them, confront them and dominate them.'*

তবু একথা অনস্বীকার্য, বিজ্ঞান আজ বৃহদায়তন সংস্থাবিশেষ এবং এখানে একক ব্যক্তির ভূমিকা ক্ষীয়মাণ। আধুনিক বিজ্ঞান ব্যয়বহুল বিধায় উৎপাদনী শক্তি ও সরকারের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিবিড়। বিজ্ঞানের নিজস্ব যুক্তিবিচারের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রশক্তির কল্যাণকামী অভীপ্সার সুসমন্বয় ব্যতীত বিজ্ঞানের সার্থক বিকাশ আজ কোথাও সম্ভব নয়, বাংলাদেশেও না।

১৯৭৩

তথ্যসূত্র :

১. *A Science and Society, Hilary Rose and Steven Rose,* Pelican Book, P 12.

২. *বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান,* ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কোলকাতা।

৩. *Science in India,* A. k. Biswas, A. k. Mukherjee & Co, Calcutta, P 124-132.

www.pathagar.com

লিসেঙ্কোর বংশগতিতত্ত্ব

সমসাময়িক চিন্তায় বিবর্তনবাদ ও বংশগতিতত্ত্ব যতোটা প্রভাব ফেলেছে, তাতে সেদিকে অবিজ্ঞানীদেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। দেহসংগঠন ও মস্তিষ্কের উৎকর্ষে, মনন ও প্রজ্ঞায় মানুষ প্রাণিজগতের সমস্ত তুলনাকে অতিক্রম করেছে বলেই পশুর ক্রমবিবর্তিত সত্তায় নিজেদের পরিচয় আবিষ্কারে তার এতোটা কুণ্ঠা। তবু সত্য অনস্বীকার্য। মানুষ ক্রমেই এ কুণ্ঠা অস্বীকার করছে। আজ বিবর্তনবাদ ও বংশগতিতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল প্রবল, জিজ্ঞাসা অসংখ্য। বার্নার্ড'শ বিশ্বখ্যাত নাট্যকার, বিজ্ঞানী নন। তবু বংশগতি সম্পর্কে তার কৌতূহলপ্রদ আলোচনা আছে। দেবীপ্রসাদ দার্শনিক হয়েও 'জীববিজ্ঞানে বিপ্লব' বইটি লিখেছেন। জ্ঞানের জগতে একচেটিয়া মালিকানা অচল। জ্ঞানাধিকারের সীমা অতিক্রমের বৈধতা প্রশ্নাতীত। তবু বিজ্ঞানের মতো জটিল টেক্‌নিক্যাল বিষয়ের কোন বিতর্কমূলক প্রসঙ্গে মতামত দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, অনেকেই এ শর্ত পালন করেন না। অধ্যাপক জুলিয়ান হাক্সলি এসব ভদ্রলোকের শিথিল মন্তব্যের কঠোর সমালোচক। জীববিজ্ঞানকে কোয়ান্টামবাদ থেকে সহজতর মনে করে যথেচ্ছা সমালোচনার কারণ অধ্যাপক হাক্সলি বুঝতে পারেন না। অবশ্য হাক্সলির এ-সতর্কবাণী বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। অনুরূপ ভ্রান্তিদুষ্ট আলোচনা আজও হচ্ছে, আগামীতেও হবে।

বংশগতির ক্লাসিক চিন্তার সঙ্গে সোভিয়েত জীবজ্ঞানের মতানৈক্য একটি আগ্রহোদ্দীপক বিষয়। ১৯৪৮ সালে সোভিয়েত দেশে বংশগতিতত্ত্বের ক্লাসিক গবেষণা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে সারাবিশ্বে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ থেকেই পৃথিবীর সমস্ত দেশে এ দুই বিরোধী মতবাদের সপক্ষে ও বিপক্ষে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কোন বাঙালি বিজ্ঞানী এ সম্পর্কে আলোচনায় সচেষ্ট হন নি। দেবীপ্রসাদ বিজ্ঞানী না হয়েও এ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছেন। তিনি ধন্যবাদার্হ। কিন্তু একজন অবিজ্ঞানীর পক্ষে এ বিতর্কের সত্য স্বরূপ উদঘাটন সুকঠিন এবং দেবীপ্রসাদ তাতে উত্তীর্ণ হন নি।

বংশগতিতত্ত্বের ক্লাসিক চিন্তার সঙ্গে ম্যান্ডেল অবিচ্ছিন্ন বিধায় একে 'ম্যান্ডেলবাদ'ও বলা হয়। ক্রমোজম যে বংশগতির বাহন, আজ তাতে সন্দেহের

www.pathagar.com

ন্যূনতম অবকাশ নেই। অবশ্য ক্রমোজম বহির্ভূত কোষপঙ্কেরও জীবের দেহলক্ষণ বহনের কিছুটা ক্ষমতা আছে। কিন্তু অনুরূপ দৃষ্টান্তের আত্যন্তিক স্বল্পতা বংশানুক্রমিক লক্ষণ সংক্রমণে ক্রমোজমের ভূমিকাকেই মুখ্য করে তোলে। তবু কোষপঙ্কীয় বংশগতি স্পষ্টতই ক্রমোজমতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিহীন এবং ক্লাসিক চিন্তার অন্যতম অমীমাংসিত প্রশ্ন আর সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের এটাই মূল হাতিয়ার।

প্রতিটি দেহকোষের কোষকেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াসে ক্রমোজমের অবস্থান। প্রতিটি প্রজাতির ক্রমোজম সংখ্যা সুনির্দিষ্ট। মানুষের ক্রমোজম সংখ্যা ৪৬। আমরা দেহকোষে এ সংখ্যা জীবনের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত বহন করে চলি। প্রতিটি ক্রমোজম নির্দিষ্ট সংখ্যক জিনের সমষ্টি। জিন হলো জীবের দেহলক্ষণের বস্তুভিত্তি। ক্রমোজমের আকৃতিকে মালার সঙ্গে তুলনা করলে প্রতিটি দানাকে এক-একটি 'জিন' বলা যায়। এগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি বিভিন্ন। এ মালায় তাদের প্রত্যেকের একটা নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে।

পরমাণুর রহস্য আজ অবিজ্ঞানীরাও অবগত আছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীর ভাগ্যে চর্মচক্ষে পরমাণু-দর্শন ঘটেনি। তবু পরমাণুর অস্তিত্ব সম্পর্কে কারও সন্দেহ নেই। কারণ, দর্শন ব্যতিরেকেও বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণের বিশ্বাস্য কৌশল মানুষের করায়ত্ত। জীবের বংশানুক্রমিক লক্ষণের অভিব্যক্তি গাণিতিক নিয়মে বাঁধা। জীবের দেহলক্ষণকে জিনের মতো নির্দিষ্ট গুণ-অণুর নিরিখে কল্পনা না করলে এই গাণিতিক ব্যাখ্যা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

দু'জাতের মটরশুঁটি আছে। লাল ও সাদা ফুলের রঙেই শুধু পার্থক্য। তারা একই প্রজাতিভুক্ত। তাদের মধ্যে কৃত্রিম পরপরাগায়নে সংকর সন্তান সৃষ্টি করলে তাদের ফুলের রঙ হয় লাল। কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্মে এ সংকর নিজের সন্তান সৃষ্টি করলে তারা লাল ও সাদা দু'রঙেই বিশ্লিষ্ট হয় এবং অনুপাতটি দাঁড়ায় ৩ : ১। জিন-তত্ত্ব থেকে এই ঘটনার ব্যাখ্যা বংশগতিতত্ত্বের প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

লাল ও সাদা মটরশুঁটির ক্রমোজমে তাদের রঙের জন্য নির্দিষ্ট জিন রয়েছে এবং সংকর সন্তানে দু'প্রকারের জিন সংক্রমিত হবে। কিন্তু নিয়ম হলো, একই দেহলক্ষণের জন্য দুটি বিপরীতধর্মী জিনের (লাল ও সাদা) সংযোগে সাধারণত দুটিরই বাহ্য অভিব্যক্তি ঘটে না। একটির প্রক্রিয়া সুপ্ত থাকে। এক্ষেত্রে লাল রঙ সাদা রঙের জিনের বাহ্য অভিব্যক্তি প্রাবরিত রাখে। তাই সংকর সন্তানে লাল ফুল হয়। কিন্তু এ বাহ্য লক্ষণটি পূর্ণ নয়। সে তার সত্তায় সাদা রঙের লক্ষণকেও অলক্ষে বহন করে চলে। তাই দ্বিতীয় প্রজন্মে সাদা রঙের অভিব্যক্তি ঘটে। সমস্যাটি সরল মনে হলেও গবেষণার মাধ্যমে জটিলতর রহস্য উদঘাটিত হয়েছে। জীবের বংশানুক্রমিক দেহলক্ষণ গাণিতিক নিয়মে অভিব্যক্ত হয় বটে, কিন্তু সর্বত্র ৩ :১ সরল নিয়মে নয়। এসব জটিলতর আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে বলা প্রয়োজন,

www.pathagar.com

বংশানুক্রমিক লক্ষণসমূহ অনেক সময় ম্যান্ডেল কথিত নিয়মে অভিব্যক্ত না হলেও জিনতত্ত্বের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা সম্ভব। ম্যান্ডেল বংশগতিতত্ত্বের পিতৃপুরুষ। তাঁর চিন্তার বহু সংশোধন ও সংযোজন পরবর্তীকালে সাধিত হয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ম্যান্ডেলবাদের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ পরিচালনা করেন, বলা প্রয়োজন, তা অনেকাংশে পুরনো পরিত্যক্ত ম্যান্ডেলীয় ধারণাভিত্তিক। ক্রমোজমকে বংশগতির বাহন বলে স্বীকৃতিদানে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা অস্বীকৃত। অথচ সংকরায়ণের সাহায্যে জীবদেহে ক্রমোজমের সংখ্যা, তাদের ভাঙন, পুনঃসংযোজন ও চারিত্রের আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেয়া যায়। ক্রমোজমের আণুবীক্ষণিক পরীক্ষার সঙ্গে এ পূর্বাভাসের সাযুজ্য ক্রমোজমতত্ত্বের পক্ষে অকাট্য যুক্তি।

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার মধ্যে গণিতের অধিক অনুপ্রবেশ ইদানিংকালের ঘটনা। বংশগতিতত্ত্বে গণিতের সফল প্রয়োগ বহু জটিল সমস্যার সরলীকরণই নয়, তার মানও যথেষ্ট উন্নীত করেছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বংশগতিতত্ত্বের গাণিতিক ব্যাখ্যায় অসন্তুষ্ট। তাঁদের ধারণা, গণিত-প্রয়োগে তার ফলিত সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং তাতে এই বিজ্ঞান দৈবঘটনায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে ভিন্নমত। তারাও বংশানুক্রমিক লক্ষণ-সংক্রমণের পূর্বসম্ভাবনার আক্ষরিক শুদ্ধতা বাস্তবে আশা করেন না, তবু একে দৈবঘটনা ভাবেন না। এখানে শুদ্ধতার অনুপাত আশাপ্রদ। অনুরূপ সম্ভাবনার প্রয়োগ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও প্রচলিত। এ সম্পর্কে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ক্ষোভ আসলে ভিত্তিহীন।

বংশগতির গবেষণা জীবনরহস্যের দ্বৈতসত্তার স্বরূপ উদঘাটন করেছে। জীবের পরিচয় শুধু তার দৃশ্যমান বাহ্যরূপেই সীমিত নয়, অদৃশ্য জিনসমূহের জটিল সংস্থানেও বাঁধা। এ শেষোক্ত বিষয়টি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক গল্পে কয়েকটি ছত্রে চমৎকার ফুটে উঠেছে : 'যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে, তাহা প্রাগৈতিহাসিক।' জীবের এ পরিচিতি মূলত তার জিনসংগঠনেই নিহিত। জিন পরিবর্তিত হয়, বংশবৃদ্ধি করে, লুপ্ত ও স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু নতুন সৃষ্টি হয় না।

কিন্তু জীবের বাহ্যরূপ জিনসমষ্টির প্রতিফলন মাত্র নয়, জিন ও পরিপার্শ্বের মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই জীবের বাহ্যরূপের প্রকাশ ঘটে। প্রতিটি জিন-ক্ষরিত রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে তার পরিপার্শ্বের প্রতিক্রিয়াই দেহলক্ষণের উৎস। বংশগতি তত্ত্বের ক্লাসিক চিন্তার বিরুদ্ধে রুশ-বিজ্ঞানীদের অভিযোগ, তাতে নাকি বংশগতিতে পরিবেশের প্রভাব স্বীকৃত নয়। বলা বাহুল্য, এ অভিযোগও ভিত্তিহীন। পরিবেশ নিরপেক্ষ জিনপ্রক্রিয়া অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তের অবতারণা প্রয়োজন। লিমনোফাইলা উভচর উদ্ভিদ। কিন্তু এদের স্থলজ ও জলজ প্রকারভেদগুলোর

www.pathagar.com

পার্থক্য এতো বেশি যে, বাহ্যত তাদেরকে দুই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত বলেই মনে হয়। কিন্তু তারা আসলে একই প্রজাতি। তাদের ক্রমোজম সংখ্যা ও সংগঠন এক ও অভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের (জল ও স্থল) সঙ্গে একই জিনসমষ্টির মিথোক্রিয়ার জন্যই লিমনোফাইলার এ রূপভেদ। জিন ও পরিপার্শ্বের সংযোগের এমন দৃষ্টান্ত অজস্র। ম্যান্ডেলপন্থীরা বংশগতিতে পরিপার্শ্বের প্রভাবের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন, যদিও জিনসংস্থার ভূমিকা সর্বত্রই মুখ্য।

জীবের দেহলক্ষণ জিন ও পরিপার্শ্বের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল। সুতরাং জিন কিংবা পরিপার্শ্বের যেকোনো একটির পরিবর্তনেই তত্ত্বীয়ভাবে জীবের দেহলক্ষণের পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে, পরিপার্শ্বের পরিবর্তনে জীবদেহে যে পরিবৃত্তির উদ্ভব ঘটে, বংশগতিতে তা সংক্রমিত হয় না। কারণ, দৈহিক প্রভাব জিনসংগঠনের ওপর কার্যকর নয়। ব্যায়ামপুষ্ট পিতার সন্তান জন্ম থেকেই পেশীবহুল দেহের অধিকারী হয় না। অনশনক্লিষ্ট দুর্বলদেহ জননীর সন্তান খাদ্য ও যত্নে পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ করে। নিম্নতাপাঙ্কে রেখে বাসন্তী গমে শীতসহিষ্ণুতার যে-পরিবৃত্তি সংযোজিত হয় তা শুধু এক মৌসুম স্থায়ী হয়, বংশগতিতে সংক্রমিত হয় না। এসব দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, পরিবেশের প্রভাব দেহেই সীমিত থাকে, জিনসংগঠনকে প্রভাবিত করতে পারে না। কিন্তু সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের এখানে প্রবল আপত্তি। তারা মনে করেন, পরিবেশজনিত দৈহিক পরিবর্তনও বংশগতিতে সংক্রমিত হয়।

জীবদেহের পরিবর্তন ও বংশগতিতে তা সংক্রমণ জীবজ্ঞানের অন্যতম মৌলিক আলোচ্য বিষয়। বিবর্তনবাদ ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা এর ওপরই নির্ভরশীল। পরিবেশের প্রভাবে জীবদেহের পরিবর্তন ও বংশগিতে তার সংক্রমণই বিবর্তনবাদের ডারউইনী ব্যাখ্যার ভিত্তি। কিন্তু বংশগতিতত্ত্বের অধুনাতম জ্ঞান ডাইউইনের এ ধারণাকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করেছে। অবশ্য এতে ডারউইনবাদ বাতিল ঘোষিত হয় নি, সংশোধিত হয়েছে।

জীবদেহে পরিবর্তন সৃষ্টি ও বংশগতিতে তার সংক্রমণ ব্যতীত বিবর্তন কল্পনাতীত। কিন্তু এ পরিবর্তন পরিবেশের প্রভাবপুষ্ট উদ্দেশ্যমূলক পরিবর্তন নয়। এ আকস্মিক, উদ্দেশ্যহীন। এটাই পরিব্যক্তি বা জিনের মৌলিক পরিবর্তন। এক্স-রে, গামা-রে, কসমিক-রে ইত্যাদি দ্রুতগামী আলোকণা জিনে প্রতিহত হলে জিনের পরমাণু-সংগঠনে পরিবর্তন ঘটে। তাছাড়া বীজকোষ সৃষ্টিকালীন ক্রমোজমভঙ্গ, পুনঃসংযোজন, জিনের স্থানান্তরণ কিংবা ক্রমোজম সংখ্যায় দ্বিগুণন-বহুগুণনে জীবদেহে স্থায়ী পরিবৃতির উদ্ভব ঘটে এবং বংশগতিতে সংক্রমিত হয়।

জিন ও পরিবেশের পারস্পর্যে জিনের পূর্ণস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন অস্তিত্ব ক্লাসিক চিন্তাসম্মত। জিন হল পরিপার্শ্ব প্রভাবের ঊর্ধ্বে, কিন্তু জিন প্রক্রিয়া পরিপার্শ্বের ওপর

www.pathagar.com

নির্ভরশীল। জিনের এই স্বয়ম্ভু প্রকৃতি, পূর্ণস্বাধীন অস্তিত্ব রুশ বিজ্ঞানীদের মতে ভাববাদদুষ্ট।

অধ্যাপক জে. বি. হ্যাল্ডেন বংশগতি তত্ত্বের খ্যাতিমান গবেষক। তিনি সোভিয়েত বান্ধব ও মার্ক্সবাদী। তবু জিনের অস্তিত্ব স্বীকারে তাঁর কুণ্ঠা নেই। ম্যান্ডেল ও মর্গানের গবেষণার ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও তিনি তাঁদের তত্ত্বকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বাতিল করেন নি। এ প্রসঙ্গে মডার্ন কোয়ার্টার্লিতে (১৯৪৯) প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক : 'আমরা পরমাণু অবিশ্বাস করি না, কারণ তা ভাঙা যায়। আমরা জিন অস্বীকার করি না, কারণ তাও বদলান যায়। এগুলোর পরিবর্তন ঘটান অসম্ভব হলে একজন মার্ক্সবাদী হিসেবে তখন আমি অবশ্যই এগুলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করতাম। কোন মার্ক্সবাদীর পক্ষেই আজ আর বংশগতির নির্দিষ্ট বস্তুভিত্তি অস্বীকারের উপায় নেই।' আমাদের দেশের প্রগতিশীলদের মধ্যে যারা বংশগতিতত্ত্বের এ বিতর্ক সম্পর্কে আগ্রহী হ্যাল্ডেনের এ উক্তি নিঃসন্দেহে তাদের অধিকতর যুক্তিনিষ্ঠ হওয়ার প্রেরণা যোগাবে।

এটা সর্বসম্মত সত্য যে, পিতৃপুরুষের দেহলক্ষণ বীজকোষের মাধ্যমেই সন্তানে সংক্রমিত হয়। কিন্তু বীজকোষের দুটি প্রধান অংশ কোষপঙ্ক ও কোষকেন্দ্রের কোন্‌টি বংশগতির বাহন এ নিয়ে দীর্ঘদিন মতান্তর ছিল। ক্লাসিক চিন্তায় আজ ক্রমোজমই বংশগতির বাহন। কিন্তু কোষপঙ্কেরও বংশানুক্রমিক লক্ষণ বহনের কিছুটা ক্ষমতা আছে। কিন্তু শেষোক্ত দৃষ্টান্তের স্বল্পতার জন্য ক্লাসিকপন্থীরা একে ব্যতিক্রম বলেই মনে করেন। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এই আপাত অসামঞ্জস্যের সমাধানে বীজকোষের সমস্ত জীবন্ত পদার্থকেই বংশগতির বাহন বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অবশ্য এতে সমস্যার সমাধান হয়নি, জটিলতাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

সোভিয়েত বংশগতিতত্ত্বের ভিত্তি মিচুরিনের শিক্ষা। উদ্ভিদপ্রজননে মিচুরিনের নৈপুণ্য অসাধারণ। তাঁর তত্ত্বীয় জ্ঞান কী ছিল, জানা কঠিন। কিন্তু ফলিত ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সম্মান পেয়েছেন। ইন্টেলেকচুয়াল না হলেও মিচুরিন বিজ্ঞানী বটে। শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্রে কৃষকের পক্ষেও কৃষিবিজ্ঞানী হওয়া সম্ভব। মিচুরিন থেকেই মিচুরিনবাদ। এ মতবাদের প্রবক্তা লিসেঙ্কো। পূর্বসূরির গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে তিনিই তত্ত্বীয় পর্যায়ে উন্নীত করেন। ফলিত ক্ষেত্রে তার সাফল্যের জন্য তিনি 'লেনিন কৃষি-আকাদেমি'র সভাপতি নির্বাচিত হন। মিচুরিনবাদের অন্য নাম 'সোভিয়েত সৃজনশীল ডারউইনবাদ'। এ নামকরণে লিসেঙ্কোর প্রতিভার পরিচয় আছে। তাদের নবমতবাদ শুধু ডারউইনের বিবর্তনবাদানুগই নয়, এতে সোভিয়েত জনগণের সৃষ্টিশীল আকাঙ্ক্ষাও প্রতিফলিত।

www.pathagar.com

১৯৩৬ সাল থেকেই লিসেঙ্কো বংশগতির ক্লাসিক চিন্তার সমালোচনা শুরু করেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে বংশগতিতে ক্রমোজমের বিশেষ অবদান ও জিনের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাঁর মতবাদ সোভিয়েত দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু তিনি ক্লাসিকপন্থীদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। রুশদেশে ক্লাসিকপন্থীরা তখন বংশগতিতত্ত্বের কর্ণধার। তাদের প্রতিষ্ঠা বিশ্বব্যাপ্ত। 'লেলিন কৃষি-আকাদেমি'র সভাপতি ভাবিলভ তখন 'আন্তর্জাতিক উদ্ভিদবিদ্যা কংগ্রেস' সংস্থার সভাপতি। তবু লিসেঙ্কোর প্রতিষ্ঠা অবরুদ্ধ হয়নি, ভাবিলভই পদচ্যুত হন। শোনা যায়, তিনি সইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন কিংবা জেলে অসুস্থ অবস্থায় মারা যান। লিসেঙ্কোর প্রতিষ্ঠার পর ক্লাসিকপন্থীদের অনেকের ভাগ্যেই পদচ্যুতি ও বিতাড়ন ঘটে। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ সালে লিসেঙ্কো ক্লাসিকপন্থীদের প্রকাশ্য বিতর্কে আহ্বান করেন। সেখানে অতিনাটকীয়ভাবে ভাবিলভদের পরাজয় ও অপসারণ ঘোষিত হয়।

সোভিয়েতে লিসেঙ্কোর প্রতিষ্ঠার সমাজিক পটভূমি বিচার্য বিষয়। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সমস্ত প্রচলিত বিধি-বিধানের আমূল পরিবর্তনের প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠেছিল। তত্ত্বীয় বিচারে মিচুরিনবাদ ক্লাসিক চিন্তার চেয়ে অধিকতর বস্তুতান্ত্রিক, বিপ্লাবাত্মক ও মার্ক্সবাদসম্মত। সুতরাং লিসেঙ্কোর প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সেখানে অনেকটা নিশ্চিত ছিল। সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত তখন পূনর্গঠনে ব্যাপৃত। কৃষিবিজ্ঞানীর কাছে তার দাবি ছিল স্বল্পতম সময়ে সর্বাধিক ফল লাভ। কিন্তু জীববিজ্ঞানে জিনের সার্বভৌম স্বাধীনতা এ পথে প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং লিসেঙ্কো যে জিনতত্ত্ব পরিত্যাগ করবেন সেটাই স্বাভাবিক ছিল।

অধ্যাপক জুলিয়ান হাক্সলি রাশিয়ায় মিচুরিনবাদ প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ উল্লেখ করেছেন। জিনতত্ত্ব মানুষের মৌলিক গুণগত পার্থক্যের স্বীকৃতি বহন করে। কিন্তু সাম্যবাদীর পক্ষে এ তত্ত্বে বিশ্বাস নীতিভ্রষ্টতার শামিল। অধ্যাপক হাক্সলির এ ব্যাখ্যা সাম্যবাদ সম্পর্কে কিছুটা যান্ত্রিক ধারণার প্রতিফলন। বস্তুত তা সত্য নয়। সাম্যবাদীরা মানুষের দেহলক্ষণগত কিংবা গুণগত সাম্যে বিশ্বাসী নয়। মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগলাভের সাম্যেই তারা বিশ্বাসী। মানুষের বুদ্ধি, মেধা, মনন ও প্রজ্ঞার ওপর জিনপ্রভাবের সত্যরূপ আজও নির্ণীত হয় নি। সুতরাং মানুষের গুণগত বিকাশকে বংশগতির নিয়মে বাঁধা কঠিন। মানুষ বংশানুক্রমিক প্রয়াসে তার পরিবেশে যে-পরিবর্তন সৃষ্টি করে চলেছে আজও এটাই তার গুণপরিমাপের নির্ণায়ক। সভ্যতাই সমষ্টি-মানুষের গুণগত মূল্যায়নের মাপকাঠি। জিনসংস্থানের উৎকর্ষ থেকে গুণমান বিচার ভ্রান্তিমূলক এবং তার অনিবার্য পরিণতি জাতিপ্রাধান্যের বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি। ক্লাসিকপন্থীরাও এক্ষেত্রে একমত নন। সোভিয়েত দেশে জিন-তত্ত্ব পরিত্যাগের কারণ সমগুণসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টির প্রয়াস নয়, কৃষিব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা মাত্র।

www.pathagar.com

কিন্তু আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ বিজ্ঞান সৃষ্টি তো সহজ নয়। মানুষ প্রকৃতির রূপান্তর সাধনে ক্রমাগত সাফল্য অর্জন করছে। এ কর্মকাণ্ডে বিজ্ঞান তার হাতিয়ার এবং লক্ষ মানবজাতির কল্যাণ। তাই মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক আছে, যদিও তা পরোক্ষ। প্রাকৃতিক নিয়মের যথার্থ উপলব্ধির মধ্যেই তার রূপান্তর সাধনের সম্ভাবনা নিহিত। বংশগতিতত্ত্ব নতুন বিজ্ঞান, তার অসম্পূর্ণতা সর্বসম্মত। তাই এ দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েতের নতুন পরিবেশে কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে জে. ডি. বার্নাল কথিত 'নতুন বিজ্ঞান' সৃষ্টির প্রায়স মোটেও অদ্ভুত নয়। কিন্তু প্রয়াস তো সাফল্যের নিশ্চায়ক নয়। প্রকৃতিরহস্যের সত্যরূপ উদ্ঘাটনের শর্তপালনের সাফল্যের ওপরই মিচুরিনবাদের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

মিচুরিনপন্থীরা জিনের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। জিনের অস্তিত্ব মিথ্যা প্রমাণের জন্য তাদের গবেষণা থেকে দুটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়:

১. লিসেঙ্কো দাবি করেন, দুটি ভিন্ন গুণসম্পন্ন উদ্ভিদকে স্থায়ীভাবে জোড়া দিলে (দেহ-সংকর) তাদের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগে দেহলক্ষণের পরিবিনিময় ঘটে এবং সন্তানেও তা সংক্রমিত হয়। দেহসংযোজনে দেহ-সংকরে অভ্যন্তরীণ পদার্থের পরিবিনিময় সম্ভব হলেও জিনপরিবিনিময় ঘটে না। কিন্তু জীব বংশগতির বাহন হলে যেখানে জিনসমূহের কোন কার্যকর ভূমিকা নেই সেখানে বংশগতির পরিবর্তন ঘটে কী করে? লিসেঙ্কোর এ পরীক্ষা সাফল্য অর্জন করলে বংশগতির ক্লাসিক চিন্তা অবশ্যই ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা দেহ-সংকরের মাধ্যমে বংশানুক্রমিক গুণসংক্রমণের তথ্য অবিশ্বাস্য মনে করেন।

২. লিসেঙ্কোর অন্যতম প্রধান দাবি, বাসন্তী গমকে শীতকালীন গমে স্থায়ী রূপান্তরে তাঁর সাফল্য। এই পদ্ধতিতে বাসন্তী গমকে কয়েক পুরুষ ধরে শরৎ-হেমন্তে বপন করা হলে এ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তিতে বাসন্তী গমের শীতসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমেই তার ফলনের গুণগত উন্নতি ঘটে আর শেষাবধি বাসন্তী গম পুরোপুরি শীতকালীন গমে রূপান্তরিত হয় এবং সাফল্যের সঙ্গে এ অর্জিত গুণ বংশগতিতে সংক্রমিত হতে থাকে। লিসেঙ্কোর এ দাবিও ক্লাসিকপন্থীদের কাছে অবিশ্বাস্য।

মিচুরিনবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এ মতবাদে জিন অলীক কল্পনা, তবে ক্রমোজম থাকলেও তা বংশগতির অন্যতম বাহন, মোটেই একমাত্র বাহন নয়। প্রতিটি জীবন্ত দেহকণাই বংশগতি বহনের ক্ষমতাধর। জীবদেহ পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্তিত হয় এবং বংশগতিতেও তার সংক্রমণ ঘটে।

www.pathagar.com

মিচুরিনবাদের শেষোক্ত ধারণা লামার্কের 'অর্জিত পরিবৃত্তির বংশগতিতে সংক্রমণের' অনুরূপ মনে হতে পারে। কিন্তু মিচুরিনবাদ লামার্কীয় চিন্তার অনুকৃতি নয়। বংশগতি সম্পর্কে লামার্কের ধারণা এতে অংশত গৃহীত হয়েছে, পূর্ণত নয়। প্রয়াস কিংবা পরিবেশের প্রভাবে জীবদেহে যে পরিবৃত্তির উদ্ভব ঘটে এবং বংশগতিতে তা সংক্রমিত হয় বলে লামার্ক ভাবতেন। কিন্তু মিচুরিনপন্থীরা সমস্ত অর্জিত পরিবৃত্তির বংশগতিতে সংক্রমণে বিশ্বাসী নন।

জীবনরহস্য জটিল। বিজ্ঞান এই জটিলতার সবকিছু আজও সুরাহা করতে পারে নি। কোষপঙ্কের অভ্যন্তরীণ সংঘঠন ও তার জটিল ক্রিয়াকর্মের ওপর যথেষ্ট আলোকপাত এখনো সম্ভব হয়নি। খাদ্য, শ্বাসগ্রহণ ও অন্যান্য উপায়ে দেহাভ্যন্তরে নীত পদার্থসমূহের কোষপঙ্কের অন্তর্ভুক্তি ও প্রাণপ্রাপ্তির রহস্য আজও অজ্ঞাত। জীবদেহে ও তার পরিপার্শ্বের নিরন্তর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্যেই জীবনের অভিব্যক্তি। পরিপার্শ্ব-নিরপেক্ষ জীবন অসম্ভব কল্পনা। খাদ্য, বায়ু, তাপ, জল, আলো এমনি আরও বহুতর উপাদন প্রবাহে জীবদেহ স্বতঃনিমজ্জমান। জীবদেহ ও পরিপার্শ্বের ওপরই দেহাভ্যন্তরীণ জৈবক্রিয়া নির্ভরশীল। জীবদেহের মোট রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাধারণ নাম বিপাকক্রিয়া।

মিচুরিনপন্থীদের মতে এ বিপাকক্রিয়াই দেহলক্ষণ ও বংশগতির নিয়ন্তা এবং জীবজগতে বিভিন্ন গোষ্ঠী-গোত্রের পার্থক্যও মূলত তাদের বিপাকক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্যেই নিহিত। কোন প্রজাতির মধ্যে অন্য প্রজাতির বিপাকক্রিয়ার পরিপূর্ণ সংক্রমণ সম্ভব হলে এক প্রজাতিকে রূপান্তরিত করা যেত। অবশ্য তা তত্ত্বীয় কল্পনা মাত্র, এর বাস্তব অসম্ভাব্যতা সহজবোধ্য।

বিপাকক্রিয়ার অন্যতম নিয়ন্তা জীবের পরিপার্শ্ব। তাই পরিপার্শ্বের পরিবর্তনে বিপাকক্রিয়ার কিছুটা পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। কিন্তু জীবদেহের সংরক্ষণশীল প্রবণতা আছে। অভ্যস্ত বিপাকক্রিয়ার পরিবর্তন তার পছন্দসই নয়। তাই পরিপার্শ্বের প্রভাবে জীবদেহে যেসব পরিবর্তন আসে, সেগুলোর স্বল্পস্থায়িত্বের সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, এমতাবস্থায় জীবদেহ অর্জিত পরিবৃত্তির বিলুপ্তি ঘটানোর এ অভ্যস্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের ক্রমাগত প্রয়াস পায়। কিন্তু কোনো প্রভাবে বিপাকক্রিয়ার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটালে তবেই সেই প্রভাবজনিত অর্জিত পরিবৃত্তির স্থায়িত্ব ও বংশগতিতে তা সংক্রমণের সম্ভাবনা সৃষ্টি নয়। জীবেদেহ প্রাথমিক বৃদ্ধির পর্যায়ে নমনীয় থাকে। তখনই পরিপার্শ্বের পরিবর্তন মাধ্যমে জীবদেহে ঈপ্সিত পরিবৃত্তি সৃষ্টি এবং বংশগতিতে তার সংক্রমণ ঘটানোর সম্ভাবনা থাকে। রুশ জীববিদদের এ ধারণা জীবজগতকে মানুষের প্রয়োজনে সদ্ব্যবহারের অধিকতর অনুকূল।

www.pathagar.com

বংশগতি নিয়ে বিতর্ক

১৯৪৯ সালে 'ডেইলি ওয়ার্কার' পত্রিকায় বংশগতিতত্ত্বের বিতর্ক সম্পর্কেও অভিমতগুলো সমস্যার মূল স্বরূপ সম্পর্কে সাধারণের অজ্ঞতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন হয়ে থাকবে। উক্ত ভাষ্যকর মনে করেন, ক্লাসিক চিন্তা ও সোভিয়েত জীববিজ্ঞানের মধ্যে মতানৈক্যের মূলসূত্র :

১. জীবদেহের বংশানুক্রমিক লক্ষণ বদলানা যায় কিনা

২. মানুষের পক্ষে বর্তমানে প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির পরিবর্তন ঘটান সম্ভব কিনা

৩. মানুষের পক্ষে প্রয়োজনানুগ প্রাণী ও উদ্ভিদের সৃষ্টি সম্ভব কিনা।

বলা বাহুল্য, এগুলো বংশগতিতত্ত্বের বিতর্কমূলক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। ক্লাসিকপন্থীরাও জীবদেহের বংশানুক্রমিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী এবং মানবকল্যাণে তার সদ্ব্যবহারে সক্ষম। বিতর্কের মূলসূত্র হল ক্লাসিকপন্থীরা জিনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী আর সোভিয়েতপন্থীরা জিনের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। ক্রমোজম ও জিনের অস্তিত্বের প্রমাণ অনেক। কিন্তু মিচুরিনপন্থীরা এ-সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন করেছেন, সেগুলোর গুরুত্বও লক্ষণীয়। ক্লাসিকপন্থীদের মতে, জিন থেকেই জীবনের শুরু। কিন্তু জীবউপাদানের মধ্যে জিনের সংগঠন সর্বাধিক জটিল। সরল পদার্থ থেকে জটিল পদার্থের উদ্ভবই জীব-বিবর্তনের নিয়ম। এ সূত্র অনুসারে কোষপঙ্কের আগে জিন সৃষ্টি সম্ভব নয়, কারণ জিনের সংগঠন কোষপঙ্কের চেয়ে জটিলতর। এ প্রেক্ষিতে কোষপঙ্কের পূর্বাহ্ন অস্তিত্ব স্বীকার করলে তাকে বংশগতির বাহন বলেও স্বীকৃতি দিতে হয়। কিন্তু বাস্তবে কোষপঙ্কের দেহ-লক্ষণ বহনের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাকে বংশগতির বাহন বলে স্বীকার করা কঠিন। জিন অস্বীকারেও বংশগতিতত্ত্বের জটিলতা বহগুণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দুই বিবদমান মতবাদের কারো পক্ষেই কোনো সর্বসম্মত ব্যাখ্যাদান সম্ভব হয় নি। ক্লাসিকপন্থীরা জিনকে বিপাকক্রিয়ার প্রভাব বহির্ভূত বলে মনে করেন। কিন্তু জিন জীবন্ত এবং বিপাকক্রিয়া জীবনের অন্যতম প্রধান শর্ত। সুতরাং জীবন্ত জিনকে বিপাকক্রিয়া বহির্ভূত মনে করার মধ্যে বাস্তব অসঙ্গতি রয়েছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা জিনতত্ত্বের এ দুর্বলতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন।

জীববিজ্ঞানে সোভিয়েত সাফল্য সম্পর্কে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা যথেষ্ট আশাবাদী। কিন্তু এসব সাফল্যের রুশ ব্যাখ্যা তাদের মনঃপূত নয়। মিচুরিনপন্থীদের উদ্ভিদপ্রজনন ও অন্যান্য সৃষ্টিশীল অবদানের ব্যাখ্যা ক্লাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সম্ভব। বহু ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যা মিচুরিনবাদের চেয়ে অধিকতর বৈজ্ঞানিক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মিচুরিনপন্থীরা তাদের গবেষণায় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন না। তাছাড়া তাদের গবেষণা পৃথিবীর অন্য দেশে বহুবার পুনঃপরীক্ষিত হয়েছে, কিন্তু আশানুরূপ ফল মেলে নি। লিসেঙ্কোর দেহ-সংকরের

www.pathagar.com

বংশানুক্রম এবং বাসন্তী গমের শীতকালীন গমে রূপান্তর অন্যত্র বহু চেষ্টায়ও সম্ভব হয় নি। তাই লিসেঙ্কোর এ দাবিকে ক্লাসিকপন্থীরা স্বীকৃতি দেন নি। কিন্তু অধ্যাপক জে. বি. এস. হ্যাল্ডেন বাসন্তী গমের রূপান্তরে লিসেঙ্কোর সাফল্য স্বীকার করেন।

মিচুরিনপন্থীরা পাশ্চাত্যের বংশগতিবিদ্যাকে বন্ধ্যা বলে নিন্দা করেন। একথা অবশ্য সত্য যে, কৃত্রিম উপায়ে পরিব্যক্তি সৃষ্টিতে জীবের গুণগত অবনতি ঘটে। তবে তারাও সাফল্য লাভ করেছেন। অধ্যাপক হাক্সলির হিসেবে তাদের বিজ্ঞানের সৃষ্টিশীল অবদানের মূল্য এক আমেরিকায়ই কোটি ডলারেরও বেশি। তারা নিজস্ব পদ্ধতিতে ভুট্টার যথেষ্ট উন্নতি করেছেন এবং গোলপাতা তামাকের নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করেছেন।

লিসেঙ্কো কর্তৃক উল্লিখিত বংশগতিতত্ত্বের ক্লাসিক চিন্তার ত্রুটিগুলো পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা বহু পূর্বেই সংশোধন করেছেন। ম্যান্ডেল ভাইসম্যান মর্গান-এর ধারণা পরবর্তী বৈজ্ঞানিকদের গবেষণায় বহুলাংশে পরিমার্জিত হয়েছে। মিচুরিনপন্থীরা ক্লাসিক চিন্তাকে ভাইসম্যানের জার্মপ্লাজম-তত্ত্বের অনুকৃতি বলে নিন্দা করেন। বস্তুত এ নিন্দা অর্থহীন। ভাইসম্যানের জার্মপ্লাজম অপরিবর্তনশীল, কিন্তু জিন পরিবর্তিত হয়, তার পরিব্যক্তি ঘটে। অধ্যাপক হাক্সলি অভিযোগ করেন, লিসেঙ্কো পাশ্চাত্য জীববিদ্যা সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত নন। অভিযোগটি সত্য।

মিচুরিনপন্থীদের ধারণা, তাদের বিজ্ঞান জীবদেহে মানুষের প্রয়োজনানুগ পরিবর্তন সৃষ্টিতে সক্ষম এবং এ পদ্ধতির সাফল্যে মানবজাতির ব্যাপক কল্যাণের আশ্বাস নিহিত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের কাছে মিচুরিনপন্থীদের এ দাবি অসম্ভব কল্পনা। জীবদেহের ওপর বিভিন্ন রশ্মি ও রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে যেসব পরিব্যক্তি ঘটে তা আকস্মিক, উদ্দেশ্যহীন ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর। হাজার হাজার অনুরূপ পরীক্ষা পুনরাবৃত্তির মধ্যে দৈবাৎ জীবদেহে মানুষের প্রয়োজনানুগ পরিবৃত্তির উদ্ভব ঘটে। এ সম্ভাবনা অনেকাংশে বানরের হাতে টাইপরাইটার দিয়ে শেক্সপিয়ারের একগুচ্ছ সনেট প্রাপ্তির মতোই আকস্মিক। কিন্তু বাস্তবে তাই ঘটে। এসব পরীক্ষার মধ্যেও প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়।

বংশগতিতত্ত্বের গবেষণা আজও অসম্পূর্ণ। সুতরাং এখনই এ বিতর্কমূলক বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছন অসম্ভব। তবুও নিশ্চিতই বলা যায়, মিচুরিনবাদ কখনোই ক্লাসিক বংশগতিতত্ত্ব অপসারণে সক্ষম হবে না। এখন 'শত ফুল ফোটা'র যুগ। মিচুরিনপন্থীদের অনুদার অসহিষ্ণুতা আজ সমাজতন্ত্রী দুনিয়ায় সমর্থন হারাচ্ছে। বিভিন্ন মতের সুস্থ প্রতিযোগিতার স্বীকৃতি আজ সর্বত্র। সোভিয়েত দেশে আবার বংশগতিতত্ত্বের ক্লাসিক চিন্তার অনুশীলন শুরু হয়েছে। নিঃসন্দেহে শুভ সূচনা। ক্লাসিক চিন্তা ও মিচুরিনবাদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা জীবিজ্ঞানের সুফল ফলাতে পারে। আমরা সেই প্রতীক্ষায় রইলাম।

১৯৫৮

www.pathagar.com

বহু বছর আগে (১৯৫৮-৫৯) রচনা টি লিখেছিলাম। ইতিমধ্যে বংশগতিতত্ত্বের গবেষণায় বহু অগ্রগতি ও পর্যাপ্ত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। মিচুরিনপন্থীদের ক্রমোজম বহিস্থ বংশানুসৃতির দাবিও এখন প্রমাণিত। ক্রমোজমের বাইরে, বিশেষত মাইটোকন্ড্রিয়ায় জিনের অস্তিত্ব রয়েছে। পরিবেশ ও জিনসংস্থার পারস্পরিক সম্পর্কের সবকিছু আজও উদঘাটিত হয় নি। মানুষ এখনও ইচ্ছামতো নানা জাতের উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টিতে সক্ষম নয়।— লেখক

তথ্যসূত্র :

১. *Soviet Genetics and the World Science,* J. Huxley.

২. *Pakistan Journal of Science,* Vol 6, No. 2, 1954.

৩. *Selected Works of Mitchurin,* Foreign Language Publishing House, Mooscow; 1949

৪. *A Situation in Biological Science,* T. D. Lysanko, Foreign Language Publishing House, Moscow. 1948

৫. *জীববিজ্ঞানে বিপ্লব,* দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ক্যালকাটা বুক ক্লাব, ১৯৫১।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান ও সামাজিক বাস্তবতা

যোসেফ নিড্‌হ্যাম ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবরসায়নের অধ্যাপক, রয়েল সোসাইটির সদস্য এবং এইসঙ্গে বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্বের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ তার 'চৈনিক সভ্যতা ও বিজ্ঞানের ইতিহাস' বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্বে এক অমূল্য অবদান এবং অনুন্নত দেশে বিজ্ঞান পরিকল্পনার নির্ভরযোগ্য দিগদর্শন। আমাদের দেশে এ ধরনের আলোচনায় উৎসাহী বিজ্ঞানীদের সংখ্যা খুবই কম এবং শুধু সমাজতত্ত্ব নয়, মানববিদ্যার অন্যান্য শাখাসমূহ সম্পর্কেও তারা যথেষ্ট নিরুৎসাহী, কিংবা বিমুখ। সি. পি. স্নো'র 'টু-কাল্‌চার' ফারাকের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ আমাদের বিজ্ঞান। অথচ আমাদের মতো অনুন্নত দেশে বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি যেখানে নড়বড়ে, সংস্কৃতির দ্বিধাবিভাজন সেখানে অধিকতর ক্ষতিকর।

'দ্বিধাবিভাজন' শব্দটির প্রয়োগ এক্ষেত্রে হয়ত যথার্থ হয় নি। সত্যিই কি আমাদের সংস্কৃতিই দ্বিধাবিভক্ত? বিজ্ঞান কি আমাদের সংস্কৃতিতে সমন্বিত অন্যান্য ধারার সমান বলিষ্ট? বাস্তব সাক্ষ্য অবশ্যই এ প্রত্যয়ের বিরোধী। আসলে বিজ্ঞান আমাদের সংস্কৃতিতে একটি 'গ্রাফ্‌ট্' বিশেষ। কৌশলে সংযোজিত এ শাখা সংস্কৃতির মূলপ্রবাহ থেকে কিছুটা প্রাণরস আহরণ করলেও তার অস্তিত্ব কৃত্রিম, বাস্তব অর্থে সে দেশের মাটিতে মূলীভূত নয়।

আমাদের দেশে এমন ব্যক্তি দুষ্প্রাপ্য নন যারা এ সংযোজিত শাখাটির স্বাস্থ্যরক্ষায় অন্য শাখাপ্রশাখার নির্বিশেষ কর্তনের পক্ষপাতী। বিজ্ঞান তাদের কাছে আলাদিনের যাদুর চেরাগ, পরশপাথর, যেন তার স্পর্শেই মিলবে অভীষ্টের সন্ধান, উবে যাবে সকল দারিদ্র্য ও হতাশা। বলা বাহুল্য, অনুন্নত দেশের ক্ষুধাক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন বিভ্রান্তির উৎপত্তিও বিস্তার সম্ভব।

এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতাসমূহ থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের বিচ্ছেদ এবং অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ ইউরোপে তার আকস্মিক উন্মেষ সম্পর্কে নিড্‌হ্যাম বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর ব্যাখ্যা মূলত চীন সম্পর্কে হলেও এশিয়ার অন্যান্য দেশেও বহুলাংশে প্রযোজ্য। আবহাওয়া, জাত্যভিমান প্রভৃতি প্রশ্নকে নিড্‌হ্যাম শুরুতেই অপ্রাসঙ্গিক হিসেবে নাকচ করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবনদৃষ্টির গুণগত স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণে তিনি উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের বাস্তবতার প্রশ্নকে প্রাধান্য

www.pathagar.com

দিয়েছেন এবং মার্কস বর্ণিত 'এশিয়াটিক মোড অব প্রডাক্‌শন' সূত্র থেকে এশিয়া ও ইউরোপের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের তুলনামূলক বিচার করেছেন। এইসব নিরীক্ষার তাৎপর্য শুধু তাত্ত্বিক দিক থেকেই নয়, ফলিত প্রকল্পের ক্ষেত্রেও আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাশ্চাত্যের 'সিটি-স্টেট', দাসশ্রমের ব্যাপক ব্যবহার, সমুদ্রবিহার ও সামরিক সামন্ততন্ত্রের মধ্যে প্রকৃতি দোহনে জনশক্তি ব্যবহারের তীব্রতা নিড্‌হ্যামের ধারণায় এশিয়ায় বহুলাংশে অনুপস্থিত ছিল। এশিয়ার সামন্ততন্ত্র মুখ্যত আমলাতান্ত্রিক (অন্তত চীনে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত সিভিল সার্ভিসের ঐতিহ্য কয়েক হাজার বছরের, বণিক-পরিবারের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা পৈত্রিক পেশা-অনীহ ও চাকরিপ্রার্থী, সামরিক বাহিনীর কর্তাব্যক্তিরা সিভিল সার্ভিস অনুত্তীর্ণ এবং এজন্য হীনম্মন্যতাগ্রস্ত) এবং সেজন্য তার আগ্রাসী প্রবণতা সীমিত, প্রকৃতি ও জনগণকে দোহনে তারা অপেক্ষাকৃত সংযত ছিল। এশিয়ার সিটি মোটেই কোনো স্টেট নয়, প্রয়োজনের তাগিদে তৈরি নগর মাত্র। এখানে দাসপ্রথা কোনোদিনই উৎপাদনের প্রধান শক্তি হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া এশিয়ার গ্রামসমাজ কৃষিভিত্তিক, স্বনির্ভর এবং এজন্য অচলায়তন। এখানে শ্রেণিশোষণ তীব্র নয়। তাছাড়া শ্রেণিবিরোধের উগ্রতা প্রশমনে ধর্মজাত জীবন-দর্শনের ভূমিকাও ছিল। তাই এশীয় 'ফিউডাল ব্যুরোক্র্যাসি' ইউরোপের ফিউডাল সমরতন্ত্রের তুলনায় বহুগুণ মানবিক ও দীর্ঘায়ু। বৈষম্যের মধ্যে একটি সার্বিক ভারসাম্য এভাবে দীর্ঘদিন এশীয় সমাজে অবিঘ্নিত ছিল। ফলে জ্ঞানের সঙ্গে শ্রমের বিচ্ছেদ, তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের বৈষম্য এবং শ্রম-অনীহ শ্রেণীবিশেষের কৌলিন্য সম্পর্কিত চেতনা এখানে অনেককাল থেকেই আদর্শের লেবাসে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেছে। নিড্‌হ্যামের মতে, এসব বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক কারণেই এশিয়ায় আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে নি। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমাদের দেশে আজও বিজ্ঞান মানেই 'পিওর সায়েন্স' এবং ফলিতবিজ্ঞান এখনো অচ্ছুৎপ্রায়। কৃষিভিত্তিক একটি দেশে কৃষিবিদ্যা, পশুপালন, পশুচিকিৎসা, মৎসবিদ্যা, কারিগরি সম্পর্কে আমাদের শিক্ষিতজনের নেতিবাচক মনোভঙ্গি সুবিদিত। চাকরির অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আমাদের সেরা ছাত্ররা পদার্থবিজ্ঞানের প্রতিই সর্বাধিক আকৃষ্ট। রাষ্ট্রীয় আর্থিক অনটন সত্ত্বেও অণুবিজ্ঞানে আমাদের উৎসাহ যতোটা উচ্ছ্বিত, ফলিতবিজ্ঞানে (যতো প্রয়োজনীয়ই হোক, যদি-না যথেষ্ট অভিজাত হয়) ততোটাই মন্দা। আধুনিক যুগে আমাদের মতো অনুন্নত দেশে বিজ্ঞানে এ কৌলিন্যপ্রথার কারণ নিড্‌হ্যামের 'চৈনিক সভ্যতা' বিশ্লেষণের পর সহজবোধ্য হয়ে ওঠে।

নিড্‌হ্যামের মতে, ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের জন্য অপরিহার্য প্রযুক্তিবিদ্যার তত্ত্বীয় আধেয়সমূহ প্রাচসভ্যতা থেকে আহৃত। প্রেক্ষিতহীনতার জন্য যেসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এশিয়ায় স্বভূমিতে বন্ধ্যা ছিল, রেনেসাঁ-পরবর্তী ইউরোপে তাই বিকশিত হয়েছে,

www.pathagar.com

ত্বরান্বিত করেছে শিল্পবিপ্লব। জীবনসংগ্রামের তীব্রতাতাড়িত অনুকূল সমাজপ্রেক্ষিতে ইউরোপের প্রযুক্তিবিদ্যা প্রসারের যে-ক্ষেত্র বহু দিনে নির্মিত হয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় উল্লেখ্য অবদান সত্ত্বেও চীন, ভারত কিংবা আরবে সে প্রেক্ষিত কেনোদিনই গড়ে উঠে নি। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জীবনাদর্শের সম্পূর্ণ ভিন্ন বাস্তবতার জন্যই এশিয়া শিল্পবিপ্লব তথা বিজ্ঞানের প্রস্ফুটন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অতঃপর বাকি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত : ইউরোপে যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ, উৎপাদিকা শক্তির বিস্ফোরণ, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, স্বজাতি-শোষণের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রটির স্বদেশ থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় স্থানান্তর এবং আমাদের পরাধীনতা। দু-শ' বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে কেন আমাদের দেশে উৎপাদিকা শক্তির ইপ্সিত বিকাশ ঘটে নি, সে কারণ সর্বজনবিদিত। ব্রিটিশ শাসক আমাদের জন্য যেটুকু বিজ্ঞান বরাদ্দ করেছিল তা কেবল সৌকর্যের খাতিরে, যেটুকু প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিক্ষা আমদানি করেছিল তা শোষণ ও শাসনের স্বার্থে। তাছাড়া আমাদের প্রাচীন সভ্যতালগ্ন উৎপাদিকাশক্তি বিকাশের স্বাভাবিক প্রতিবন্ধগুলোকে তারা লালন করেছিল সহজবোধ্য কারণেই। ফিউডাল ব্যবস্থার দৃঢ়ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ছাড়াও শ্রেণীস্বাতন্ত্র্যসহ সর্বপ্রকার ফিউডাল মূল্যবোধ এদেশে সযত্নে লালন করছে বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্রিটিশ শাসকরা। তাই জ্ঞান ও শ্রমের মধ্যে এদেশে কোনোদিনই সংযোগ স্থাপিত হয়নি। এ বিচ্ছেদ কতটা দৃঢ়বদ্ধ, আমরা প্রতিনিয়তই তা উপলব্ধি করছি। ইংরেজ শাসনের যেসব উপকরণ আমাদের মনোজগতে সুদূরপ্রসারী ও সর্বাধিক বিনাশী পরিবর্তন ঘটিয়েছে তারই একটি তাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা। এতে শুধু তাদের শোষণেচ্ছাই ছিল না, আমাদের ফিউডাল মূল্যবোধ ও শ্রেণী-আধিপত্যের স্পৃহাও নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছিল। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সত্তাকে গ্রাসই করে নি, তার বহুদূর রূপান্তরও ঘটিয়েছিল। তাই আজ ঔপনিবেশিকতার জেরের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েও কার্যত তাদের শিক্ষাব্যবস্থার নিরিখেই আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান খোঁজি এবং অবধারিত ব্যর্থতার কূটচক্রে আবর্তিত হই। অক্লান্ত প্রয়াসেও যথার্থ বাস্তবতা আমাদের কাছে কখনোই ধরা দেয় না। আমাদের চেতনাজাত প্রতিবন্ধ আমাদের সকল সদিচ্ছার টুঁটি চেপে ধরে এবং আমরা পুরাতন সুরার জন্য নতুন বোতলের সন্ধানে বৃথাই আত্মপ্রবঞ্চনা করি।

আমাদের পরিভাষায় এ হলো ঔপনিবেশিক মানসিকতা, কিন্তু আসলে এই ইতিহাস প্রাচীনতর। ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত ও ব্রিটিশ শিক্ষায় সযত্নে লালিত এ মানসিকতার উৎস হল এশীয় ফিউডাল ব্যুরোক্র্যাসি, যা মোহ ও সংরাগে আমাদের চেতনায় আজও সজীব। আমাদের সত্তার অন্তর্গত এ প্রবৃত্তি থেকে আশু-মুক্তি সহজসাধ্য নয়।

উৎপাদনের উচ্ছ্বয় থেকে সংযোগবিহীন বিজ্ঞান এবং সামাজিক বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি বন্ধ্যাত্ব। কিন্তু বন্ধ্যাত্ব এক ধরনের মৃতাবস্থা

www.pathagar.com

এবং এক অর্থে যথার্থ মৃত অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিকর, কারণ এতে জীবনের ইলিউশন বিধৃত থাকে। আমাদের শিক্ষা ও বিজ্ঞানের কোন ঐতিহ্য না থাকলে হয়ত আমরা আনুষঙ্গিক নতুন ও যথাযথ ভাবনার সুযোগ পেতাম। কিন্তু এখন তা দুরূহ বটে। 'ঔপনিবেশিক স্বার্থে আমদাকৃত', 'কৃত্রিমভাবে সংযোজিত' ইত্যাকার যত শব্দই উচ্চারিত হোক, এ বন্ধ্যা বিজ্ঞান ও শিক্ষার সমূল উৎপাটন আমাদের সাধ্যাতীত, কেননা এতে আমাদের বহু প্রত্যাশা, পর্যাপ্ত মোহ লগ্নিকৃত। মধ্যবিত্তের বিপ্লবচিন্তার মতো এখানেও সেই একই তত্ত্বীয় আলোচনার পুনরাবৃত্তি, মজ্জাগত কর্মবিমুখতা এবং শেষাবধি বিবিধ কমিশন ও রিপোর্টের গড্ডালিকা প্রবাহে পুরনো বৃত্তে আবর্তন। ঔপনিবেশিক আমলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দায় যে কী দুর্ভর, এর মূল যে কতো গভীর, আমরা তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।

যোসেফ নিড্‌হ্যাম এই সমস্যার কোন সমাধান দেন নি। চীনের সমাজতান্ত্রিক সাফল্যকে তিনি প্রাচ্যদেশীয় আমলাতান্ত্রিক সামন্তবাদের মানবিকতার আদর্শের সার্থক পরিণতি হিসেবে দেখেছেন। এমন একটি উদ্বর্তন তার কাছে স্বাভাবিক ও কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু চীনের জনগণের মতো আমরাও আজ জানি, এ আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত বিপ্লবের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তরণ, যে-পরীক্ষার কঠোরতা কেবল বিপ্লববেষ্টিত জনগণের পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব। গুণগত পরিবর্তন ও পুনর্জন্ম সমার্থক। এজন্য যে বিপুল শক্তির ব্যবহার অপরিহার্য তার ক্ষরণ একমাত্র বিপ্লবের মধ্যেই সম্ভব, সে-বিপ্লব যেভাবেই (পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনায় অথবা প্রচলিত আকস্মিকতায়) সংঘটিত হোক।

বিজ্ঞান শিক্ষা সমাজতন্ত্র এ শব্দত্রয় শুধু আমাদের দেশেই নয়, সকল উন্নতিকামী দেশেরই আপ্তবাক্য এবং এগুলো পরস্পরবদ্ধ। এদের কাঠামো আপ্তদৈশিক হলেও বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ দেশীয়। দেশীয়করণের মধ্যেই এদের সার্থকতা, অন্যথায় এগুলো তত্ত্বীয় প্রত্যয় মাত্র। কিন্তু এই দেশীয়করণেই যতো সমস্যা। এজন্য মৌলিক প্রতিভার সঙ্গে প্রয়োজন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল, জনগণ ও বুদ্ধিজীবীদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস এবং সমস্ত মানসিক ও বাস্তব বাধা উত্তরণের অদম্য সদিচ্ছা। সমাজ-সংস্থার গ্রন্থিবন্ধনে যে বিপুল শক্তিপ্রবাহ নিহিত তার মোক্ষম ব্যবহার এজন্য অপরিহার্য। কিন্তু সেই চাবিকাঠি সন্ধানী দুঃসাহসী রাজপুত্র আজ কোথায়? স্বাধীনতা-পরবর্তী বাঙালি মধ্যবিত্তের যে-চেহারা আমাদের সামনে উন্মোচিত তাতে মনে হয় তাদের সম্মিলিত সদিচ্ছায় এমন কোন রাজপুত্রের জন্ম অসম্ভব। অতত্রব প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশা। মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ, বিপ্লব-চেতনায় অস্থির, অথচ শ্রেণীচ্যুতির ভয়ে সদাসন্ত্রস্ত বাঙালি মধ্যবিত্তের সমাজতন্ত্র সাধনা যে-টানাপোড়নে ক্ষয়িত ও খর্বিত, সেই একই বাস্তবতা তাদের শিক্ষা ও বিজ্ঞানের মধ্যেও সংক্রমিত। এ বাস্তবতাটুকু স্বীকারে আমরা যেন পরাঙ্মুখ না হই।

১৯৭৪

www.pathagar.com

মানুষের জীবতাত্ত্বিক সম্ভাবনা

ডারউইনবাদ ও ম্যাল্‌থুসীয় ধারণার মধ্যকার সংযোগটি সহজলক্ষ্য। কৃপণা ধরিত্রীর সীমিত খাদ্যভাণ্ডারই জীবগোষ্ঠীর পারস্পরিক দ্বন্দ্বসংঘাতের উৎস ও তাদের নিরঙ্কুশ বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায়। জীবের মাত্রাতিরিক্ত বংশবৃদ্ধির প্রবল প্রবণতা জীবজগতে ব্যাপক মৃত্যুর হেতু এবং তার সঙ্গে বিবর্তনের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ম্যাল্‌থাসের জনসংখ্যা সংক্রান্ত তত্ত্বে কঠোর শ্রম, চরম দারিদ্র্য, শিশুদের অযত্ন, সর্বপ্রকার সাধারণ ব্যাধি, মহামারী, যুদ্ধ, প্লেগ ও দুর্ভিক্ষের মতো জনসংখ্যা হ্রাসকারী কারণসমূহ মানবজাতির অস্তিত্বের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। ম্যাল্‌থাসের কাছে যা মানবসমাজের ক্ষেত্রে সত্য, ডারউইনের কাছে তাই জীবজগতের সাধারণ নিয়ম। ডারউইনবাদের অন্যতম সূত্র 'জীবনের জন্য সংগ্রাম' হল মানবসমাজের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও ম্যাল্‌থাসের জনসংখ্যা সংক্রান্ত তত্ত্ব জীবজগতের বাস্তবাবস্থায় স্থানান্তর মাত্র। এ ধরনের ধারণাকে ভ্রান্ত বলা যায় না। ডারইউনাবাদ এককভাবে জীবনের জন্য সংগ্রাম না হলেও ডারউইন বস্তুত ম্যাল্‌থাসের চিন্তাধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন 'জীবজগতের সর্বত্র বিদ্যমান জীবনের জন্য সংগ্রাম নিশ্চিতই তাদের জ্যামিতিক হারে বংশবৃদ্ধি থেকেই ঘটে। ম্যাল্‌থাসের এ তত্ত্ব এখানে গোটা প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে।' তাছাড়া, নিজের ডায়েরিতে আছে, '১৮৩৮ সালের অক্টোবর। পনেরো মাস আগে আমি আমার প্রণালীবদ্ধ তথ্যানুসন্ধান শুরু করেছি। হঠাৎ একদিন ম্যাল্‌থাসের 'অন পপুলেশন' পড়লাম। জীবনের জন্য সর্বব্যাপ্ত সংগ্রাম, যা গভীর পর্যবেক্ষণে মানুষেত প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়, তার তাৎপর্য নির্ণয় করতে গিয়ে আমার মনে হল এসব বিশেষ অবস্থার মধ্যেই জীবদেহে উপযোগী পরির্তনগুলো স্থায়ী হয় এবং অনুপযোগীদের বিনাশ ঘটে। এখানেই আমি গবেষণাযোগ্য একটি তত্ত্বের সন্ধান পাই।' জীববৈচিত্র্য ব্যাখ্যা সমস্যার কুটিল আবর্তে দিকভ্রান্ত ডারউইনের পক্ষে ম্যাল্‌থাসবাদ অন্যতম আলম্ব হয়ে উঠেছিল।

যারা অক্ষম তারা বাঁচার অযোগ্য। অক্ষমের বিলুপ্তির মধ্যেই যোগ্যতমের অব্যাহত উদ্বর্তন ও বিবর্তন। অযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মৃত্যুর নিষ্ঠুর নেই যোগ্যতর সংখ্যালঘুর অস্তিত্ব লালিত। সর্বনিম্ন প্রজননক্ষম প্রাণীরও সমস্ত সন্তানের নির্বিশেষ

www.pathagar.com

বৃদ্ধি ঘটলে পৃথিবী থেকে অন্য সমস্ত প্রজাতির অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হত। মৃত্যুই এ সংকটের সমাধান। বিপুল-ব্যাপক মৃত্যুই অফুরন্ত জীবনের আশ্বাস। ম্যাল্‌থুসীয় তত্ত্বেও মানবসমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশের পক্ষে ব্যাপক মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। যুদ্ধ, রোগ, দুর্ভিক্ষ আপাতদৃষ্টিতে মর্মান্তিক হলেও জনসংখ্যার সীমায়নে এগুলোর ভূমিকা মানবজাতির অস্তিত্বের পক্ষে কল্যাণপ্রসূ।

'প্রাকৃতিক নির্বাচন' -এর যে কঠোর পরীক্ষা সমস্ত জীবজগতে ক্রিয়াশীল, মানব-সমাজের জনসংখ্যা হ্রাসের কারণসমূহেও তা বিদ্যমান। ম্যাল্‌থাস সমাজবিজ্ঞানী। ডারউইনবাদে সংযোজিত তাঁর চিন্তা জীববিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের এক সেতুবন্ধ রচনা করেছে। সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে ডারউইনবাদের এ সংশ্লেষ থেকেই 'ডারউইনী সমাজবাদ' বা 'সোশ্যাল ডারউইনিজম' উদ্ভূত।

ম্যাল্‌থাসবাদ সাময়িক চাঞ্চল্য সৃষ্টিতে সক্ষম হলেও পরবর্তীকালে তার প্রবক্তাস্বয়ং মানবতাবিরোধী ও অংশত ভ্রান্ততত্ত্ব প্রচারের জন্য নিন্দিত হয়েছেন। ডারউইনী সমাজবিদদের যান্ত্রিক বিবর্তনব্যাখ্যাও স্বল্পকাল আলোড়নেই বিস্মৃতিতে তলিয়ে যায়। বিজ্ঞানসিদ্ধতার চেয়ে সমকালীন সামাজিক প্রয়োজনের প্রতিই ছিল এই তত্ত্বের অধিকতর আনুগত্য। উনবিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সার প্রকোপেই ডারউইনী সমাজবাদের উদ্ভব। বার্নার্ড শ'র ভাষায় 'খাদ্য ও অর্থের অবাধ প্রতিযোগিতা ও আদিম স্বাধীনতার সপক্ষে এমন দৃঢ়ভিত্তিক, সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক প্রচার আর ইতঃপূর্বে ইতিহাসে দেখা যায় নি। বিনা শাস্তিতে সবল কর্তৃক দুর্বলের নিষ্পেষণ, একমাত্র সরকার কর্তৃক সমস্ত বিধিনিষেধ নিয়ন্ত্রণ ও গুণ্ডাশ্রেণীর লোকদের আক্রমণ থেকে আইনানুগ দস্যুতার নিরাপত্তা বিধানের জন্য কেবল পুলিশ-বাহিনীর ওপর সার্বিক নির্ভরতার মধ্যেই যে ব্যক্তি ও সমাজের সমস্ত প্রাচুর্য উন্নতি ও মঙ্গল নিহিত, ইতিপূর্বে আর তা কখনো মানুষকে এভাবে বোঝান হয় নি।'

প্রচারের সর্বাধিক কূটকৌশল প্রয়োগেও অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিজ্ঞান হয়ে ওঠে না। ডারউইনী সমাজবাদ ইদানিং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের চূড়ান্ত বিকৃতি বলে সর্বত্র নিন্দিত। যে সমাজপ্রেক্ষিতে তার জন্ম সেটা টিকে থাকার দরুন এ তত্ত্বের সপক্ষে যুক্তিপ্রদর্শনে কোন কোন মহল এখনও সচেষ্ট। মানবসভ্যতা এখনো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, জাতিদ্বেষ ও বর্ণবৈষম্যের কলঙ্ক থেকে মুক্ত নয়। বিশ্বমানবের ঐক্যবদ্ধ নিন্দাকে অবহেলা করে সভ্যতার এ কলঙ্ক দুরারোগ্য ক্ষতের মতো আজও বর্তমান। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যে যার জন্ম ও সমাজের গভীর মর্মে যা অনুপ্রবিষ্ট, মৌখিক প্রচারে তা দূরীকরণ সম্ভব নয়।

ডারউইনী সমাজবাদের মর্যাদাচ্যুতির কারণ মূল ডারউইনবাদের অসংখ্য ত্রুটি আবিষ্কার এবং সেগুলো সংশোধন। ডারউইনী দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক শোষণ ও লুণ্ঠনকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে দেখানোর যুক্তি খোদ ডারউইনবাদের সংশোধনে

www.pathagar.com

এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। জীববিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষের ক্রমবর্ধমান জ্ঞান ডারউইনী সমাজবিদদের মানবতাবিরোধী যুক্তিবিন্যাসকে অশুদ্ধ প্রমাণ করেছে।

ডারউইনবাদের নিয়মে জীবজগতে নিরন্তর ক্রিয়াশীল সংগ্রামের মধ্যেই অযোগ্যের অপসারণ ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটে। এ প্রক্রিয়ার জন্যই ক্রমাগত যোগ্যতরের সংখ্যাবৃদ্ধি ও অযোগ্যের ক্রমবিলুপ্তি। পূর্ণতার লক্ষ্যে জীবগোষ্ঠীর আপেক্ষিক সংখ্যার এ অব্যাহত গতিই বিবর্তন। প্রাকৃতিক নির্বাচন-নির্দিষ্ট বিপুল মৃত্যুই এ অন্তহীন বিকাশের শর্ত। তাই সর্বাত্মক সংগ্রাম, ধ্বংস ও মৃত্যু জীবজগতেরনিয়ম। পারিপার্শ্বিক, আন্তঃপ্রজাতিক ও অন্তঃপ্রজাতিক দ্বন্দ্বের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জীবের মধ্যে যে গুণগত উৎকর্ষের সংযোজন ঘটে তা বংশগতিতে সংক্রমিত হয় এবং প্রতি প্রজন্মে প্রকৃতির সুনিপুণ নির্বাচনে বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

বিবর্তনের সপক্ষে সংগ্রামের অনিবার্যতা, জীবের জন্মগত বৈষম্য, অর্জিত পরিবৃত্তির বংশানুক্রমিক সংক্রমণ প্রভৃতি অর্ধশুদ্ধ ও অশুদ্ধ প্রত্যয় ডারউইনী সমাজবাদের প্রধান অবলম্বন। তাই এ তত্ত্ব অনুসারে যুদ্ধ হল মানব-বিবর্তনের অন্যতম শর্ত। কেননা, এরই মধ্যে পশ্চাৎপদ, নিকৃষ্ট মানুষের ক্রমাগত বিলুপ্তি এবং আপেক্ষিক সংখ্যক উন্নততর সম্ভাবনাশীল মানুষের উদ্বর্তন সম্ভব। শ্বেতাঙ্গদের জন্মগত কৌলিন্য আর পীতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের জন্মগত অপকর্ষতার নিরিখে শেষোক্ত তথাকথিত নিকৃষ্টদের অবলুপ্তি ঘটানোর পক্ষে শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক তাদের ওপর আক্রমণ, লুণ্ঠন ও হত্যা তাই অমানবিক নয়। ফ্যাসিবাদী তত্ত্বের সঙ্গে ডারউইনী সমাজদর্শনের আশ্চর্য মিল রয়েছে। 'নিরন্তর যুদ্ধের মধ্যেই মানবজাতির বৃদ্ধি ও বিকাশ, আর চিরন্তন শান্তির মধ্যেই তার ক্ষয় ও অবলুপ্তি'—হিটলারের এ উক্তির সঙ্গে ডারউইনী সমাজবিদদের চিন্তার ঘনিষ্ঠতা সহজলক্ষ।

ডারউইনী সমাজবিদদের এ সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনার আগে আধুনিক বংশগতিতত্ত্বের আলোকে মূল ডারউইনবাদের পূনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। বিবর্তন ব্যাখ্যায় ডারউইনের সাফল্য কালের তুলনায় বিস্ময়কর হলেও তা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নয়। পরবর্তীকালে ডারউইনবাদের বহু ত্রুটি আবিষ্কৃত হয়েছে। আজ সংশোধিত নবডারউইনবাদের সঙ্গে মূল ডারউইনী বিবর্তনের পার্থক্য যথেষ্ট মৌলিক।

ব্যাপক অর্থে জীবজগতে 'জীবন সংগ্রামে' আপেক্ষিক সংখ্যার উদ্বর্তন বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু বিবর্তনের সপক্ষে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সহযোগিতা সর্বত্র সত্য নয়। জীবনের অস্তিত্ব ও বিকাশের পক্ষে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা আসলে সংগ্রামের চেয়ে কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। প্রাকৃতিক নির্বাচন শুধু সংগ্রাম ও মৃত্যুর যোগ্যতমের উদ্বর্তন বাস্তবায়িত করে না, সহাবস্থানের মধ্যেও জীবজগতের বিকাশ ঘটায়। বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে সংগ্রাম-সংঘাত সত্ত্বেও তাদের অস্তিত্বের জন্যই

www.pathagar.com

আবার তারা পরস্পরনির্ভর। মৌমাছি ও পিপীলিকার সংঘবদ্ধ জীবন, মটরশুঁটি ও ব্যাক্টেরিয়ার মিথোজীবিতা প্রসঙ্গত স্মর্তব্য।

সংগ্রাম ও সংঘাত সব সময় বিবর্তনমুখী নয়। পতিনির্বাচনে বৃহত্তম পেখমই ময়ূরীদের পছন্দ। তাই স্বয়ম্বরসভায় সৌন্দর্য পরীক্ষার সংগ্রামে ছোট পেখমের ময়ূরেরা অনাহূত এবং এজন্য বংশবৃদ্ধির সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এ নির্বাচনে পুরুষানুক্রমে ময়ূরের পেখমের বৈচিত্র্য ও আয়তন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পেখমসজ্জা ময়ূরীর আকর্ষণের বস্তু হলেও এটি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ওড়ার পক্ষে অসুবিধাজনক এবং বেঁচে থাকার প্রতিকূল। ময়ূরগোষ্ঠীর মধ্যে স্ত্রীনির্বাচনের জন্য এই দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা না থাকলে ক্ষুদ্র পেখমের পাখিরাও বংশবৃদ্ধির সুযোগ পেতো আর ময়ূর-প্রজাতির বিপদ বাড়ত না। তাই সংগ্রামকে সর্বদা বিবর্তনের অনুকূল মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

বংশগতি সম্পর্কে ডারউইনের ধারণা ছিল অশুদ্ধ। প্রাকৃতিক নির্বাচন বৈজ্ঞানিক সত্য, কিন্তু নির্বাচনে উত্তীর্ণ হবার কারণ সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। জীবদেহের মৌলিক পরিবর্তনই বিবর্তনের উপাদান আর এ পরিবর্তনের মূলে রয়েছে পরিপার্শ্বজ প্রভাব নয়, জিনের গঠন ও বিন্যাস পরিবর্তন। প্রকৃতিতে সর্বদাই এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। যেসব পরিবর্তন প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজনার জন্য লাগসই, প্রকৃতির বিধানে সেগুলোই যোগ্যতম ও টিকে থাকার উপযুক্ত। আর যে-জিনসংস্থা পরিপার্শ্বের সঙ্গে অভিযোজনায় অক্ষম তার নিঃশেষ বিলুপ্তিই প্রকৃতির বিধান।

জিনের গুণগত পরিবর্তনই 'মিউটেশন' এবং বিবর্তনের এটাই মূলভিত্তি। কিন্তু বিবর্তন ক্রমোন্নতিমূলক জীবনপ্রক্রিয়া আর মিউটেশন ব্যাপক অর্থে ক্ষতিকর। নিউটেশন জীবের বিলুপ্তি ত্বরান্বিত করে। তাই মিউটেশনের সূত্রে বিবর্তন ব্যাখ্যায় স্ববিরোধিতা স্পষ্ট। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, সদাপরিবর্তমান পরিপার্শ্বের সঙ্গে অভিযোজনার প্রশ্নে জীবমাত্রেরই কোন অবলম্বন থাকা চাই, আর মিউটেশনই সেই অবলম্বন। গতিশীল পরিপার্শ্বের সঙ্গে বংশগতির সাযুজ্য রক্ষার প্রশ্নে মিউটেশনই প্রজাতি-অস্তিত্বের প্রধান সহায়। মিউটেশন ব্যাপকভাবে মৃত্যু ঘটালেও এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে হঠাৎ এমন জিনসংগঠনের আবির্ভাব সম্ভব যা বিশেষ পরিপার্শ্বের পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী। অবশ্য এ ধরনের ইতিবাচক মিউটেশন দুর্লভ ও অনেকটা দুর্ঘটনার মতো হলেও দুর্ঘটনা অনেক প্রয়োজনই পূরণ করে থাকে আর এসব তথাকথিত দুর্ঘটনার পেছনে লুকানো থাকে প্রয়োজনের তাগিদ।

তাই ডারউইনবাদ সম্পর্কে সর্বসম্মত বিদ্ধান্ত হল, অর্জিত পরিবৃত্তি বংশানুক্রমিক নয়, সংগ্রাম ও ব্যাপক মৃত্যু বিবর্তনের অন্যতম পন্থা হলেও একমাত্র পন্থা নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে এতে সমগ্র প্রজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয় বলে বিবর্তনের পক্ষে আদর্শও নয়। দৈহিক পরিবৃত্তি নয়, মিউটেশনই বিবর্তনের ভিত্তি। তাই জীবজগতে চিরকৌলিন্য নেই, পদচ্যুতির সম্ভাবনা সেখানে সর্বক্ষণই বিদ্যমান। এ দৃষ্টিকোণ

www.pathagar.com

থেকেই মানবসমাজের বিবর্তনক্রিয়া বিচার্য। পুরনো পরিত্যক্ত ডারউইনবাদ মানব-বিবর্তনের সঠিক মূল্যায়নে সমর্থ নয়।

২

বিবর্তনের চূড়ায় দাঁড়িয়েও মানুষ তার পশুপরিচয়ের বিলুপ্তি ঘটাতে পারে নি। অন্তত ডারউইনের দৃষ্টিতে মানুষের এ পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট। নিত্যকালের (বিবর্তনের) বিচারে মানুষ ব্যাক্টেরিয়া কিংবা কৃমির অধিক গুরুত্ব দাবি করতে পারে না। কারণ, শুধু পদচ্যুতিই নয়, আজকের অতি তুচ্ছ কোন প্রাণীর কাছে তার চিরলুপ্তির সম্ভাবনাও সর্বক্ষণই রয়েছে। মানুষ জৈবিক উত্তরাধিকারে স্তন্যপায়ী পশুর অন্তর্গত। কিন্তু পশু বলে আখ্যায়িত করলে মানুষের পরিচয় পূর্ণ হয় না। বিবর্তনের পরিমার্জনায় তার পশুত্ব পরিশুদ্ধির যে-স্তরে উত্তীর্ণ তার সঙ্গে মানুষেতর প্রাণীর অনেকটাই দূরত্ব। মানুষ অনন্য পশু। মস্তিষ্ককোষের সংখ্যাধিক্যে, জটিল স্নায়ু-সংযোজনায়, অতীত পুনঃস্মরণে এবং বুদ্ধি মেধা প্রজ্ঞায় সে তুলনাহীন। মানুষ 'যুক্তিনিষ্ঠ পশু' আর এ গুণেই সে বিশিষ্ট। তাই যে-নিয়ম জীবজগতের ক্ষেত্রে সত্য, মানুষের ক্ষেত্রে অনেক সময় তা হুবহু প্রযোজ্য নয়। প্রাণীদেহ যেমন যন্ত্র হয়েও যন্ত্র নয়, মানুষও তেমনি পশু হয়েও পশু নয়। এ অনন্যতাকে বাদ দিয়ে মানুষের বিচার শুদ্ধ হতে পারে না। মানুষকে তার বৈশিষ্ট্য ও সভ্যতার অনুষঙ্গ থেকে আলাদা করে সাধারণ জৈবনিয়মের কাঠগড়ায় দাঁড় করালে বিচার-বিভ্রাট অনিবার্য। বিবর্তন ও বংশগতির তত্ত্ব যে হিসেবে জীবজগতে প্রযোজ্য, মানুষের ক্ষেত্রে তার আক্ষরিক প্রয়োগ সর্বত্র শুদ্ধ হতে পারে না। মানুষ প্রাণিজগতের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সূত্রে বদ্ধ এবং জীবজগতের নিয়মগুলো সাধারণভাবে তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু এখানে ব্যতিক্রম অনস্বীকার্য এবং তা স্বীকার না করলে ব্যাখ্যা হবে যান্ত্রিক ও অশুদ্ধ।

সমস্ত জীবগোষ্ঠীর সঙ্গে মানুষও প্রকৃতির অংশ। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি তার আনুগত্য নির্বিশেষ নয়। প্রকৃতির রহস্য অনুধাবন এবং তাকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহারের কলাকৌশল তার আয়ত্তে। তাই নিজের বিকাশে তার অবদানও ন্যূন নয়। প্রকৃতির ওপর নির্ভরতা সত্ত্বেও সে অনেকাংশে স্বাধীন। মানবসত্তার এ স্বরাজসাধনা তার জীবসত্তার ক্রমবিকাশের ফল। অথচ এটি মানুষেতর প্রাণীতে অনুপস্থিত। পশুর মধ্যে সুযোগের সাম্য অবান্তর। ইচ্ছানুরূপ পেশা-নির্বাচন তাদের আয়ত্তাতীত। জন্মলব্ধ কোষসমষ্টির বিন্যাসে কিংবা বংশানুক্রমিক জৈব-এষণায় তাদের প্রকৃতি আবদ্ধ। কিন্তু সুযোগের সাম্যে মানুষ পছন্দসই পেশা নির্বাচনে সক্ষম। এখানে গোষ্ঠী-চরিত্র কিংবা বংশানুক্রমিক গুণের ওপর ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও রুচির প্রাধান্য। ভাষা ও প্রতীকের জ্ঞানসম্পন্ন উৎকৃষ্ট স্নায়ুমণ্ডলীর অধিকারী মানুষের পক্ষেই শুধু তা সম্ভব। মানুষ ও পশুর বৈষম্য এতোই মৌলিক যে অভিন্ন মানদণ্ডে তারা বিচার্য নয়।

www.pathagar.com

জীববিবর্তন অংশত প্রাকৃতিক নির্বাচনের অধীন। অবশ্য জিনসংস্থার গুণগত উৎকর্ষই প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিরিখ। যে-জিনসংস্থা পরিপার্শ্ব অভিযোজনায় যত বেশি উপযোগী, প্রাকৃতিক নির্বাচনে তারই তত প্রাধান্য। তাই জিনসংস্থার গুণগত উৎকর্ষের মধ্যেই জীবের ভবিষ্যৎ নিহিত। অথচ এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মানুষসহ কোন প্রাণীরই দখলে নেই। বীজকোষ বিভাগকালীন ক্রমোজম বিভাজনে, অর্থাৎ জীবের জন্মের পূর্বেই তার জিনসংস্থার সংগঠন সম্পূর্ণ হয়। জন্মের পর শুরু হয় জিনসংস্থার মূল্যায়নের পরীক্ষা। এ পরীক্ষা পরিপার্শ্বের সঙ্গে অভিযোজনায় তার ক্ষমতার বিচার। এটাই প্রাকৃতিক নির্বাচন। মানুষেতর প্রাণী এ নির্বাচনে অসহায়, সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। তাই ব্যাপক মৃত্যু ও ধ্বংসের মধ্যেই প্রকৃতি যোগ্যতরদের বাঁচার ও বৃদ্ধির অধিকার দেয়, অযোগ্যদের বিলুপ্তি ঘটায়।

কিন্তু সভ্য মানুষের ক্ষেত্রে এ বিধানের ব্যতিক্রম ঘটে। জন্মপূর্ব ক্রমোজম বিভাজন ও জিনসংস্থার সংগঠনে তার কোন হাত না থাকলেও নির্বাচনের ক্ষেত্রে সে ততটা অসহায় নয়। মানুষের আশ্চর্য মস্তিষ্ক, বলিষ্ঠ বাহু, ঋজু মেরুদণ্ড প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল হলেও এ নির্বাচন ঘটেছিল সেই সুদূর অতীতে যখন মানুষের অনন্য পরিচয় পূর্ণতা লাভ করে নি। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবমুক্তির নিরিখ সভ্যতার উৎকর্ষ বিচারের একটি মাপকাঠি।

জীবের জিনসংস্থার স্বরূপ ও তার পরিপার্শ্ব সম্পর্কে জ্ঞান বিবর্তনপ্রক্রিয়া বোঝার জরুরি শর্ত। জিনসংস্থা ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক অতিঘনিষ্ঠ। পরিপার্শ্বের সার্বিক উৎকর্ষ সত্ত্বেও জিনসংস্থার নিম্নমান জীবের বিলুপ্তি ঘটাতে পারে। আবার উৎকৃষ্ট জিনসংস্থাও সহযোগী পরিপার্শ্বের অভাবে আত্মপ্রকাশে ব্যর্থ ও বিকৃত হয়। মানুষেতর প্রাণীরা পরিপার্শ্ব নিয়ন্ত্রণে অক্ষম বিধায় উৎকৃষ্ট পরিপার্শ্বানুগ জিনসংস্থা লাভের মতো দৈবঘটনাই তাদের বাঁচা ও বিকাশের উপায়। কিন্তু প্রয়োজনানুগ পরিপার্শ্ব সৃষ্টির কলাকৌশল মানুষের করায়ত্ত বলেই বিশেষ ক্ষেত্রে জিনসংস্থার অপকর্ষতা সত্ত্বেও তার বিলুপ্তি ঘটে না, বিকাশ রুদ্ধ হয় না।

জিনসংস্থার বৈশিষ্ট্যানুগ জন্মগত বৈষম্য মানুষের ক্ষেত্রেও সত্য। 'সব মানুষ সমান' বলতে মানুষের মৌলিক অধিকারের যে-সাম্য বোঝায় তাতে জন্মগত বৈষম্যের অস্বীকৃতি নেই। বাস্তবে দু'জন মানুষের মধ্যে সার্বিক সমতা অসম্ভব। এমনকি সম-অণ্ডজ যমজদের জিনসংস্থার মৌলিক ঐক্য সত্ত্বেও তারা মনোগত বৈশিষ্ট্যে এক নয়। তাই মানুষের অন্তর্নিহিত বৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবেই স্বীকৃত। মানুষের এ বৈষম্য একাধারে জটিল ও নিয়ন্ত্রণাতীত। জে. বি. এস. হ্যাল্ডেনের ভাষায় 'এ অনেকটা আবহাওয়ার মতো, এ সম্পর্কে আংশিক পূর্বাভাস হয়ত সম্ভব, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ দুরূহ।' মানুষের বৈষম্যের স্বীকৃতি সত্ত্বেও তার গুণগত মূল্যায়নের সমস্যা মোটেই সহজ হয় না। মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য

www.pathagar.com

তার গুণাগুণ নির্ণয়ে খুব মৌলিক নয়। কিন্তু আমাদের আয়ত্তাতীত জিনসংস্থার গুণগত উৎকর্ষের নিরিখে মানুষের মূল্যায়ন বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। জীবনে সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা অংশতও জন্মনির্দিষ্ট হলে এবং তা সংশোধনের কোন উপায় না থাকলে মানবজাতির প্রগতির সম্ভাবনা সীমিত হয়ে পড়ে।

৩

প্রাকৃতিক নির্বাচনে প্রয়োজনীয় পরিবৃত্তির পরিশুদ্ধি ও বিকাশ বড়ই মন্থর ও অনিশ্চিত। দ্রুতগতি লাভের জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল হলে আমরা কোনোদিনই ঘোড়াকে ছাড়িয়ে যেতে পারতাম না। কিন্তু মানুষের অগ্রগতির পথ ভিন্নতর। সে সর্বাধিক স্বল্প সময়ে অন্য প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব গতিলাভ করেছে যন্ত্রের সাহায্যে, দৈহিক পরিবৃত্তি অর্জনের মাধ্যমে নয়। প্রকৃতির প্রতিটি আনুকূল্যকে মানুষ গ্রহণ করেছে, বিকশিত করেছে। প্রকৃতির জীবনধ্বংসী শক্তিসমূহকে সে কখনো প্রতিহত করেছে, কখনো কৌশলে সৃষ্টিশীল করেছে। তবু সবকিছুই আজও মানুষের আয়ত্তে নেই। প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্বে সে ক্রমাগত পরিপার্শ্বকে, নিজেকে পরিবর্তিত করে চলেছে। তাই মানুষের সমাজে প্রাকৃতিক নির্বাচনের গতি মন্থর। প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবমুক্তিই মানবপ্রজাতির পূর্ণস্বাধীনতার একটি উপাত্ত, যা আজও দূরস্থ। মানবসমাজে প্রাকৃতিক নির্বাচন শ্লথ হলেও নিষ্ক্রিয় নয়।

উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য, মানুষের মধ্যে যারা বিকৃত বংশগতির বাহক, তাদের অস্তিত্ব ও বংশবৃদ্ধি প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিরোধী এবং এদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে মানবপ্রজাতির ক্ষয় ও বিকৃতি ঘটতে পারে। তাই প্রকৃতির বিধানে এদের জন্য অকাল মৃত্যু কিংবা বন্ধ্যাত্বই নিয়তি। প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভূমিকা এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং মানবপ্রজাতির বিকাশ ও মঙ্গলের লক্ষেই ক্রিয়াশীল। অবশ্য সমস্ত বংশানুক্রমিক ব্যাধিই মানুষের সার্বিক গুণগত অবনতি ঘটায় না। বংশগত বহুমূত্র কিংবা ক্ষীণদৃষ্টির দুর্ভাগ্য থেকে সাধারণ চিকিৎসায় মুক্তিলাভ সম্ভব। এ ধরনের সমাজের যোগ্যতম নাগরিকের সম্মান অর্জনে বাধা নেই।

কিন্তু অনেক বংশানুক্রমিক ব্যাধি স্পষ্টতই দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ায় মারাত্মক বিপর্যয় ঘটায়। এগুলো বিকৃত বংশগতির বাহক। কিন্তু মনোবিকৃতির সকল নজিরকে বংশানুক্রমিক বলে সন্দেহাতীতভাবে ঘোষণা করা চলে না। অপরাধপ্রবণতা ও পানাসক্তির কথাই ধার যাক। 'ম্যাক্সজুকি' পরিবার এ সমস্যার একটি ক্লাসিক দৃষ্টান্ত। তারা পশ্চিম নিউইয়র্কের আদিবাসী। পরে অবশ্য তারা ছড়িয়ে পড়ে সারা আমেরিকায়। ১৮৭৭ সালে তাদের সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য বিজ্ঞানজগতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এ ক্ষয়িষ্ণু গোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ মারা যায় অপরিণত বয়সে। ৩ শতাধিক ছিল নিঃস্ব এবং সর্বমোট তারা অনাথ আশ্রমে কাটায়

www.pathagar.com

২৩০০ বছর। ৪৫০ জন ছিল বিকলাঙ্গ। মেয়েরা ছিল বিরাট সংখ্যায় দেহব্যবসায়ী এবং ৭জন খুনিসহ ১৩০ জন ছিল নানা অপরাধে কারাভোগী। ১৯১৫ সালে ড. ইস্টারব্রুক জুকিদের সম্পর্কে পুনরায় যে-সংবাদ সংগ্রহ করেন তা-ও ছিল পূর্বোক্ত পরিসংখ্যানের অনুরূপ। ইতিমধ্যে অবশ্য তারা আরও দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। ৭৫০ জনের মধ্যে বিকৃতদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও ততোদিনে জনকয়েক সুস্থ সামাজিক জুকিরও জন্ম হয়েছে। অবশ্য ততদিনে আমেরিকার কৃষিতে ব্যাপক যান্ত্রিক অগ্রগতি ঘটেছে। জুকিদের এ পরিবর্তনে সমাজের রূপান্তরের ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। ডেভেনপোর্টের ধারণা, শিল্পশাসিত সমাজের পরিবেশগত উন্নতির জন্য জুকিদের এ পরিবর্তন ঘটে নি, সদ্বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সংযোগ ও রক্তের মিশ্রণেই ঘটেছে। জুকিদের জন্মগত নিকৃষ্টতা নাকি সন্দেহাতীত বিষয়। সুতরাং জুকিরা সমাজের বোঝাস্বরূপ এবং এদের অস্তিত্ব না-থাকাই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন তাদের সংশোধনের জন্য যথেষ্ট নয়, কারণ স্বভাবানুগ পরিবেশ সৃষ্টিতে তারা সুদক্ষ।

প্রসঙ্গত কিলকার্ক পরিবারের দৃষ্টান্তও আলোচ্য। মার্টিন কিলকার্ক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পরিবারের বংশধর। প্রথম জীবনে এক অস্থিরমনা মহিলার সঙ্গে যোগাযোগে তার এক সন্তান জন্মে। এদের উত্তরাধিকারীর ৪৮০ জনের মধ্যে ১৪৩ জন ছিল স্পষ্টতই অস্থিরচিত্ত এবং বাকি সকলেই নিকৃষ্ট ধরনের। কিলকার্কের বৈধ বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন পূর্ণ সুস্থ। তাই এ-পক্ষের সন্তানরা সকলেই ছিল উন্নতমনা মানুষ, সুধী নাগরিক।

এসব দৃষ্টান্ত থেকে মনে হতে পারে, মানুষের গুণগত উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝি-বা জন্মনির্দিষ্ট। এ সমস্যাবলিই 'ইউজেনিক্স্'-এর আলোচ্য বিষয়। শুধু দেহবৈশিষ্ট্যই নয়, মানুষের মনস্তত্ত্ব, সমাজ, পরিপার্শ্ব সবই বংশানুসৃতির আওতাভুক্ত। ইউজেনিক্স্ সামাজিক মানুষের জৈবসত্তার বিকাশ ও ক্রমোন্নতি পর্যালোচনা করে। বংশগতি থেকে সমাজতত্ত্ব সবই এ বিদ্যার আলোচ্য। ইউজেনিক্স্ শুধু ফলিত বিজ্ঞানই নয়, এক ব্যাপক আন্দোলনও। মানবপ্রজাতির সার্বিক বিকাশ সাধন ও বিবর্তনের অবশিষ্ট সম্ভাবনাগুলো স্বল্পসময়ে বাস্তবায়নই এ বিজ্ঞানের লক্ষ। আমাদের চিরাচরিত বিশ্বাস, সংস্কার ও আদর্শের সঙ্গে কর্মপদ্ধতির মৌলিক বিরোধ ধাকায় ইউজেনিক্সের প্রসার নির্বিঘ্ন হয় নি। মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার সার্বিক বিকাশের লক্ষে যেসব প্রশ্ন অবশ্যবিচার্য সেগুলো :

১. নিকৃষ্ট বংশানুক্রমের সঠিক তথ্যসন্ধান এবং আনুষঙ্গিক সমস্যার সমাধান;

২. প্রাকৃতিক নির্বাচন ও অন্তঃপ্রজাতিক দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে মানব-বিবর্তনের সম্ভাবনা বিচার;

৩. মানবপ্রজাতির সর্বাধিক বিকাশের পক্ষে উপযুক্ত সমাজব্যবস্থার সন্ধান।

www.pathagar.com

গুণগত মূল্যায়নে মানুষের জন্মগত অপকর্ষতার সমস্যাটি বংশগতিতত্ত্বে সীমিত জ্ঞানের জন্য আজও অত্যন্ত অস্বচ্ছ। ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ মূলত তার জিনসংস্থা, পরিপার্শ্ব ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিজস্ব কর্মপ্রয়াসের ওপর নির্ভরশীল। এগুলোর যে-কোন একটির ত্রুটিই ব্যক্তির গুণগত অপকর্ষ ঘটাতে পারে। কিন্তু কোনটি এ বিশেষ অবস্থার জন্য দায়ী, তা জানা মোটেও সহজ নয়। ব্যক্তিসত্তার মূল্যায়নে জন্মগত বৈশিষ্ট্যর, অর্থাৎ জিনসংস্থার সঠিক অবদান নির্ধারণ কঠিন। কিন্তু মানুষের এমন কিছু ত্রুটি রয়েছে, যেগুলোর বংশানুক্রমিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্টিত। শৈশবমৃত্যু, বন্ধ্যাত্ব, দেহবিকৃতি ও মনোবৈকল্য, দৃষ্টিদৌর্বল্য, রক্তক্ষরণ, বধিরতা, বহুমূত্র প্রভৃতি বিশেষ ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক। এসব ত্রুটি বেঁচে-থাকা ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে মিলিয়ে চলার পক্ষে নেতিবাচক বিধায় এ জিনগুলোকে নিকৃষ্ট বলা যায়। বলা বাহুল্য, এসব জিনসংস্থা প্রাকৃতিক নির্বাচনে উতরানোর অনুকূল নয়। এসব লোকের অনেকেই যৌবনে পৌছানোর আগেই মারা যায় কিংবা বন্ধ্যাত্বের জন্য বংশবৃদ্ধি, অর্থাৎ নিজস্ব দুষ্ট জিনের প্রতিনিধি সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। স্পষ্টতই মানবসমাজের পক্ষে এগুলো কম বিপজ্জনক। কিন্তু যেসব জিনবিকৃতি বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করে না কিংবা অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে আত্মপ্রকাশ করে, সেগুলোর ক্ষতিকর সম্ভাবনা অনেক বেশি। এসব ক্ষেত্রে দুষ্ট-জিন মানবপ্রজাতির মধ্যে বিস্তার লাভের সুযোগ পায় এবং গোটা প্রজাতির অপকর্ষতা বৃদ্ধির আশঙ্কা বাড়ায়। সাম্প্রতিক গবেষণরয় জানা গেছে, ক্রমাবনতি ও অবক্ষয় সৃষ্টি জিনসংস্থার একটি মারাত্মক স্বভাবধর্ম। জিনসংস্থা মিউটেশনপ্রবণ। বংশানুক্রমিক ব্যাধির সেটাই উৎস। প্রজাতির অস্তিত্ব ও বিকাশের পক্ষে এগুলো মারাত্মক বিঘ্ন।

কিন্তু জীবজগতে বিদ্যামান জন্মগত অপকৃষ্টদের জীবন-সংগ্রামে পরাজয় ও বিলোপের বিধানটি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ঔদার্য, বদান্যতা, সেবা ও আর্তত্রাণ প্রভৃতি মানবিকবোধ জন্মগত অপকর্ষদের বিলুপ্তি থেকে বাঁচায় এবং তারা অবাধ প্রতিযোগিতার মারাত্মক পরীক্ষা থেকে রেহাই পায় ও বেঁচেবর্তে থাকে। কিন্তু এ বদান্যতা ও ঔদার্য কি বিজ্ঞানসম্মত? অনেকেই একে ভাবালুতা ভাবে। কিন্তু বংশানুক্রমিক ব্যাধি মাত্রেই তো মারাত্মক ও দুরারোগ্য নয়। বিজ্ঞানের উৎকর্ষ অনেক ক্ষেত্রে জন্মগত দূরাদৃষ্ট থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। তবু এক্ষেত্রে সাফল্য খুব উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু যতদিন সুষ্ঠু সমাধান না হচ্ছে, ততোদিন মানুষ অন্তস্থ ক্ষয়ে ভুগবে, তার মধ্যে বিস্তৃত হবে এ ধ্বংসের জীবাণু।

এ সমসার সমাধানে বিজ্ঞানীরা দুটি পন্থা নির্দেশ করেছে। প্রথমত, জনসমাজে যারা কৃতী উত্তরাধিকারে ভাগ্যবান, তাদের জন্য থাকবে রাষ্ট্রীয় অকৃপণ সহযোগিতা, আর অপকৃষ্ট জিনসংস্থার উত্তরাধিকারীরা পাবে রাষ্ট্রের অসহযোগ। এ ব্যবস্থার ফলে

www.pathagar.com

অসম প্রতিযোগিতায় নিকৃষ্ট জিনসংস্থার বিলয় ও উন্নতমানের মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটবে। শেষাবধি একদিন মানবসমাজ দুষ্ট জিনের প্রকোপমুক্ত হবে। অবশ্য এ নির্বাচন তখনো চালু থাকবে। কেননা, বিবর্তন প্রক্রিয়া অন্তহীন আর গুণগত উৎকর্ষেরও কোনো চূড়ান্ত পরিমাপ নেই। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশন থেকে মানবপ্রজাতি কীভাবে রেহাই পাবে, বলা কঠিন। দ্বিতীয় নির্দেশ কঠোরতর। এক্ষেত্রে সমর্থকরা উৎকৃষ্ট জিনবিন্যাসের নির্বিঘ্ন বৃদ্ধিতেই তুষ্ট নন, অপকৃষ্টদের বংশবৃদ্ধির অধিকার হরণের পক্ষপাতী। তারা বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাকরণ বিধি সুপারিশ করেন।

১৯৩২ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত 'ইউজেনিক্স কংগ্রেসে' জনৈক বক্তার একটি উক্তি উল্লেখ্য : 'যুক্তরাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাকরণ চালু হলে ১০০ বছরেরও কম সময়ে অপরাধপ্রবণতা, মনোবৈকল্য, অস্থিরচিত্ততা, জন্মগত যৌনবিকৃতি ৯০ শতাংশ হ্রাস পাবে, সর্বপ্রকার বংশানুক্রমিক অবক্ষয় রুদ্ধ হবে এবং আমাদের পাগলাগারদ, জেল, দাতব্য আশ্রম, রাষ্ট্রীয় হাসপাতালের অনেকটাই শূন্য হয়ে যাবে।' বংশগতিতত্ত্বে আমাদের সীমিত জ্ঞানের দুর্বল ভিতে দাঁড়িয়ে বন্ধ্যাকরণ নীতির ব্যাপক ও জবরদস্তি প্রয়োগ অনেকের কাছেই মানবিকতার মারাত্মক বরখেলাপ। জন্মগত অপকর্ষের প্রশ্নে পূর্বোল্লিখিত কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত ব্যতীত অপরাধপ্রবণতা, অস্থিরচিত্ততা, মদ্যাসক্তি প্রভৃতির বংশানুক্রমিক ভিত্তি আজও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় নি। পরিপার্শ্ব বা জিনসংস্থার মধ্যে কোন্‌টি যে ব্যক্তি চরিত্রের উৎস, অনেক ক্ষেত্রেই তা অত্যন্ত অস্পষ্ট। তাছাড়া মানুষ পরিপার্শ্ব দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত বিধায় তাতে শেষ রায় দেওয়া সহজ নয়। তাই বন্ধ্যাকরণ নীতির মতো কোন চরম ব্যবস্থা কখনোই ব্যাপক সমর্থন পেতে পারে না। বংশগতিতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বসহ অন্যান্য সহযোগী বিজ্ঞানসমূহের গভীরতর জ্ঞান ও নব নব প্রয়োগবিধির আবিষ্কারই শুধু ভবিষ্যতে যথাকর্তব্য নির্ধারণে উপযুক্ত আলোকপাত করতে পারবে।

৫

অন্তঃপ্রজাতিক দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে মানব-বিবর্তনের সম্ভাবনা বিচারও ইউজেনিক্সের আলোচ্য বিষয়। সাধারণ জীবগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান যুদ্ধপ্রবণতা তাদের সংখ্যা সীমায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অযোগ্যের অপসারণ ও যোগ্যতরের উদ্বর্তনের বিবর্তনমুখী নির্বাচনে যুদ্ধ একটি প্রধান শক্তি। কিন্তু মানবসমাজের ক্ষেত্রে এই ভূমিকা সৃজনশীল হতে পারে কি?

মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে যে-নিয়ম সত্য, মানুষের ক্ষেত্রে তা হুবহু প্রযোজ্য নয়। মানুষের স্বাধীনতার পরিমাপ জীবরীতির তুল্যমানে বিচার্য নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা মানবজাতির অগ্রগতির পথে কতোটা বাধা, তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে,

www.pathagar.com

কিন্তু কোন সুস্থ ব্যক্তিই জনধিক্য সমাধানে জীববিবর্তনসম্মত ব্যাপক সংঘাত ও মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করবেন না। যুদ্ধ ও ধ্বংস মানব বিবর্তনের সহায়ক নয়, স্পষ্টতই বিরোধী। জীবিকার মনোন্নয়ন ও জন্মনিয়ন্ত্রণ জনসংখ্যা হ্রাসে অবশ্যই ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও সভ্যতার অসম বিকাশে মানবপ্রজাতি বহুধাখণ্ডিত। সমাজ সংগঠনে শ্রেনীবিন্যাস ও শ্রেণীসম্পর্কের বিরোধ বাস্তব সত্য। জীবজগতের অজস্র প্রজাতির মতো মানুষও একটি বিশিষ্ট প্রজাতি। দেহগঠন, বর্ণ ও ভাষাগত অনৈক্য সত্ত্বেও পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই প্রজাতিভুক্ত। গোটা মানবজাতির অস্তিত্ব এবং বিবর্তনের সম্ভাবনাও তাই একই সূত্রে গাঁথা। এখানে একের মৃত্যু অন্যের মূঢ়তা। মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ম্যাল্‌থাস কিংবা ডারউইনী সমাজবিদদের তত্ত্ব মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। যুদ্ধ মানব-বিবর্তনের পক্ষে কোন অর্থেই অনুকূল নয়। যুদ্ধের নির্বাচনী প্রক্রিয়া উৎকৃষ্টতর মানুষের আপেক্ষিক সংখ্যার উদ্বর্তন ঘটায় না। বিজয়ীরা বিজিতদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মানুষ নয়। মানবিক মূল্যবোধের বিচারে শুধু অস্তিত্ব রক্ষার সাফল্য ব্যষ্টি বা সমষ্টির যোগ্যতার প্রধান মাপকাঠি হতে পারে না। প্রসঙ্গত স্পার্টার সমাজসংস্থার শোচনীয় ব্যর্থতা স্মরণীয়। ডারউইনের জন্মের বহু বৎসর পূর্বে যে-সমাজবিদরা যুদ্ধকেই অস্তিত্বের প্রধান শর্ত বলে প্রচার করেছিলেন তাদের ব্যর্থতা মানবসমাজের পক্ষে চিরকালের জন্য কল্যাণকর নজির হয়ে আছে।

যুদ্ধের ফলেই বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি ঘটছে অনেকেই এমন যুক্তি দেখান। যুদ্ধ না হলে বিজ্ঞানের উন্নতি খুব শ্লথ হত একথা সত্য নয়। প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের মতো অজ্ঞেয় রহস্যানুসন্ধানও মানবধর্ম এবং বিজ্ঞানের মৌল প্রেরণা। যুদ্ধ হল সৃষ্টি ও কল্যাণমূলক কর্মপ্রয়াসের কবরভূমি, হতাশা ও নৈরাশ্যের প্রতীক। যুদ্ধ আজ আণবিক মহাবিপদ ডেকে এনেছে। বার্ট্রান্ড রাসেলের ভাষায় : 'আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যুক্তি কিংবা মৃত্যু এ দুটোর একটি আমাদেরকে বেছে নিতে হবে। যুক্তির অর্থ এখানে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ঘোষিত নিয়মের প্রতি আমাদের পূর্ণ-আনুগত্য। আমার শঙ্কা, মানুষ হয়ত মৃত্যুকেই বেছে নেবে।' ম্যাল্‌থাস কিংবা ডারউইন যুদ্ধপদ্ধতির এ বিবর্তন সম্পর্কে অবহিত থাকলে জনসংখ্যা সীমায়নে কিংবা যোগ্যতরের উদ্বর্তনে যুদ্ধের সৃষ্টিশীল ভূমিকা স্বীকার করতেন না।

যুদ্ধস্পৃহাকে অনেকে মানুষের জীবপ্রবৃত্তির অন্তর্গত মনে করেন। এ ধারণা বিজ্ঞানসম্মত নয়। পিপীলিকাদের এষণানির্ভর যুদ্ধস্পৃহা জীবজগতের বিরল দৃষ্টান্ত। মানুষের যুদ্ধ জীববৃত্তিচালিত নয়, 'সাধারণ আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি মাত্র এবং প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ানুষ্ঠানেই তার নিবৃত্তি সম্ভব। নৃবিজ্ঞানীরা ফিলিপাইনের নরমুণ্ড শিকারী অরণ্যবাসীদের মধ্যে ফুটবল খেলাকে বিকল্প হিসেবে চালু করে বিশেষ সুফল পেয়েছেন।

www.pathagar.com

যুদ্ধ মানুষের সাধারণ অ্যাড্‌ভেঞ্চার-প্রীতিকে মারাত্মক ধ্বংসাত্মক কাজে বিপথ-চালিত করে। যে সম্প্রীতি ও সাহচর্যে মানবসভ্যতার সার্বিক উন্নতি নিহিত, যুদ্ধ সে পথে দুস্তর বাধা। এতে শুধু মানুষের সৃষ্টিস্বপ্নই বিধ্বস্ত হয় না, তার গুণগত অপকর্ষও ঘটে। যুদ্ধকালীন কিংবা যুদ্ধশেষের বিদ্বেষ, হিংসা ও প্রতিশোধস্পৃহা মানুষের প্রজাতি-ঐক্য ও বিবর্তন সম্ভাবনার পথে মারাত্মক বিঘ্ন। সর্বোপরি প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অধিকতর সাফল্য লাভে এ আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব একটি প্রধান অন্তরায়। যুদ্ধের সপক্ষে আজ কোন বক্তব্য নেই। এ এক উন্মত্ত বর্বরতা। মানুষের জীবন, তার স্বপ্ন, ভালবাসা, শ্রেয়বোধ ও কল্যাণ-চিন্তার ওপর এমন পীড়ন আর দুটি নেই। বিজ্ঞানের সত্যান্বেষা ও ফলিত প্রয়োগের সুবিপুল সম্ভাবনার সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সৃষ্টিশীল আবেগের সুগভীর একাত্মতা যুদ্ধকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করতে পারে।

৬

'মানুষের পরিচয় তার গূঢ়সত্তায়, তার জন্মলব্ধ এষণাসর্বস্বতায়। সে পরিপার্শ্ব নিরপেক্ষ অহমের আয়ত্তে লালিত হলে তার পক্ষে মূক পশু হয়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তার বদলে সে কোন বিশেষ ধরনের সমাজে বিশেষ ধরনের মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে। গূঢ়সত্তার একক অস্তিত্ব অসম্ভব। দেহই তার আধার। প্রত্যেক মানুষই কোন-না-কোন সভ্যতা, নির্দিষ্ট মতবাদ, বাস্তব পরিপার্শ্ব ও শিক্ষা থেকে অবিচ্ছিন্ন। তার চেতনা এমন এক পরিপার্শ্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা জন্মনির্দিষ্ট এবং ব্যক্তিক ইচ্ছা-অনিচ্ছার সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে।'

কার্ল মার্কসের উক্তি অনুকরণ করে আমরা বলতে পারি, মানুষ পরিপার্শ্বকে বদলেই নিজেকে বদলায়। মানুষের বিকাশে তার নিজস্ব প্রধান অবদান হল পরিপার্শ্ব অনুধাবন ও তার প্রয়োজনানুগ পরিবর্তন। তাই সার্বিক বিকাশের সর্বাধিক উপযুক্ত পরিপার্শ্বের (সমাজব্যবস্থা, জীবন ও জীবিকার সুযোগ ইত্যাদি) সন্ধানও ইউজেনিক্সের একটি বিষয়। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, জীব হল জিনসংস্থা ও পরিপার্শ্বের মিথষ্ক্রিয়ার সৃষ্টি। মানুষের ক্ষেত্রে তার জিনসংস্থা নিয়ন্ত্রণাতীত বিধায় তার বিকাশের পক্ষে পরিপার্শ্বের গুরুত্ব সমধিক।

মানুষের সার্বিক উন্নতির প্রশ্নে জিনসংস্থার গুরুত্ব স্বীকার করেও বলা চলে, আমাদের গবেষণার সীমাবদ্ধতার জন্যই শুধু নয়, সামাজিক রীতি ও নীতিবোধের জন্যও ইউজেনিক্সের বাস্তব প্রয়োগ অত্যন্ত জটিল। অধ্যাপক কে, মাথুর মানুষের জিনসংস্থার পরিবর্তন ঘটানোর পক্ষে আমাদের ঔদাসীন্যকে আক্রমণ করেও শেষাবধি স্বীকার করেছেন যে, বংশগতিতত্ত্বে সীমিত জ্ঞান এবং বর্তমান সমাজ ও নীতিবোধের সঙ্গে এ বিজ্ঞান-শাখার রীতিনীতির বিরোধের দরুন কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ আপাতত অসম্ভব। 'বংশানুক্রমজনিত সমস্যা বর্তমান সামাজিক

www.pathagar.com

অবস্থায় মানুষের পরিপার্শ্বজ জটিলতার তুলনায় অপ্রধান', মাথুরের এ উক্তির সঙ্গে 'মানুষের বিবর্তনে বর্তমানে বংশানুক্রম পরিবর্তনের চেয়ে তার সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর প্রয়াস অধিকতর কার্যকর'– উয়েডিংটনের এ বক্তব্যের সামঞ্জস্য সুস্পষ্ট। জুলিয়ান হাক্সলির মতে, মানব-বিবর্তনের প্রশ্নে কেবল পরিপার্শ্ব পরিবর্তনের একক বিধান বামপন্থী রাজনীতি মাত্র। তবু শেষাবধি নান্যপন্থা।

জিনসংস্থার প্রকৃষ্ট বিকাশ তার সহযোগী পরিপার্শ্বের ওপর নির্ভরশীল। জীবের অস্তিত্ব ও বিকাশ শুধু জিনসংস্থানির্ভর নয়, পরিপার্শ্বনির্ভরও। এ প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সাযুজ্য প্রয়োজন। অতি-উৎকৃষ্ট জিনসংস্থাও প্রতিকূল পরিবেশে আশানুরূপ বিকাশে সক্ষম নয়। আবার অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট জিনসংস্থাও বিশেষ নির্বাচিত পরিবেশে অনেকাংশে স্বাভাবিক ফলই ফলায়। জীবমাত্রই এ দুটো অবস্থার মিথষ্ক্রিয়ার ফল। জিনসংস্থার পরিবর্তনের জন্য কিছু কিছু কার্যকর বিধির (বৈজ্ঞানিক বিবাহরীতি, বিদেশাগত নিয়ন্ত্রণ, বংশানুক্রমিক ব্যাধিগ্রস্তদের বন্ধ্যাকরণ ইত্যাদি) সুপারিশ থাকলেও এগুলো মোটেই যথেষ্ট নয়। তাই মানুষের বিবর্তন ত্বরণে, অর্থাৎ ব্যষ্টি ও সমষ্টির সার্বিক উন্নয়নে সমাজসংস্থার পরিবর্তন ব্যতীত আমরা অনন্যোপায়। তবে স্মর্তব্য, জীনসংস্থার চেয়ে মানুষের সমাজসংস্থার কাঠামো কম জটিল নয়।

সমাজসংস্থার ত্রুটি মানুষের গুণগত বৈশিষ্ট্য বিকাশের পক্ষে যেসব বিঘ্ন সৃষ্টি করে আমরা তা জানি। যেসব সমাজে বৃত্তিনির্দিষ্ট জাতিভেদ প্রথা একদিন চালু ছিল, সেখানে জিনবিন্যাসের বৈচিত্র্য বিভিন্ন পরিবেশের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিকশিত হবার সুযোগ পায় নি। আজ বৃত্তিনির্দিষ্ট জাতিভেদ প্রথার রেওয়াজ প্রায় বিলুপ্ত হলেও অনগ্রসর দেশসমূহের আর্থিক দুরবস্থায় মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ ও ইচ্ছানুযায়ী জীবিকা নির্বাচনের স্বাধীনতা সত্য হয়ে ওঠে নি। তাই ফল প্রায় সমানই রয়ে গেছে।

একথা সর্বসম্মত যে, প্রতিভা বংশানুক্রমিক নয়। জিনবিন্যাস ও অন্যান্য বহু কারণসঞ্জাত জিনসংস্থার আকস্মিক কোন বিশিষ্ট অবস্থার সঙ্গে অনুকূল পরিপার্শ্বের সন্নিপাতেই প্রতিভার জন্মলাভ ঘটে। পশ্চাৎপদ অর্থনীতির দেশগুলোতে মাত্র শতকরা ২০ ভাগ লোক অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ পেতে পারে। প্রতিভা সৃষ্টির মতো বিশিষ্ট জিনসংস্থা একটি আকস্মিক ব্যাপার হলে সেই সম্ভাবনা ৮০ ভাগ দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যেই বেশি হবে। কিন্তু এদের মধ্য থেকে কোন বিশিষ্ট প্রতিভার উদ্ভব প্রায়ই ঘটে না। তাদের জন্মলব্ধ প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ সেখানে নেই। সামজব্যবস্থার ত্রুটি বহু প্রতিভার বিকাশ থেকে মানবসমাজকে বঞ্চিত করেছে এবং আজো করছে। যে-সমাজ যত অনগ্রসর, যে-সমাজে যত বিপুল সংখ্যক মানুষ দরিদ্র ও নিরক্ষর সেখানে

www.pathagar.com

প্রতিভাধরদের আবির্ভাব ততই আকস্মিক। পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও রাজনীতিতে প্রতিভার ধারা মোটামুটি অটুট থাকে এবং আমাদের দেশে থাকে না, তার কারণ এটাই। প্রসঙ্গত অধ্যাপক জুলিয়ান হাক্সলির মত উল্লেখ্য। তিনি মনে করেন, প্রতিভা সৃষ্টির উপযুক্ত জিনসংস্থা প্রতিকূল পরিপার্শ্বে প্রহত হলে তার পক্ষে বিধিধ বিকৃতি (মানসিক বৈকল্য, নৈরাশ্য, কর্মবিমুখতা, অপরাধপ্রবণতা, নৈরাষ্ট্রিক আদর্শপ্রীতি, উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদি) প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে। অধ্যাপক হাক্সলির এ উক্তির যাথার্থ বর্তমান সমাজসংস্থার দুর্বলতাকে স্পষ্ট করে তোলে।

কিন্তু পথ কোথায়? পরিপার্শ্বকে বদলানোর তত্ত্বীয় খসড়া তৈরি করা গেলেও তা বাস্তবায়ন দুরূহ। জিনসংস্থা আমাদের ক্ষমতার যতটুক আওতামুক্ত, পরিপার্শ্ব ততোটা না হলেও সেখানেও জটিলতা কম নয়। মানবসমাজের বিবর্তন যেসব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তির ওপর নির্ভরশীল সেগুলোর ওপরও আমাদের নিয়ন্ত্রণ খুবই সীমিত। তাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন যতই জরুরি হোক, বাস্তবতার মুখোমুখি সেগুলো ব্যর্থ বা বিলম্বিত হবে। পরিপার্শ্ব ও সমাজসংস্থাকে ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তনের পক্ষে মানবপ্রচেষ্টার এখানেই প্রধান বাধা।

মানুষ যেমন পরিবেশের দাস নয়, পরিবেশও তেমনি মানুষের অনুগত হতে চায় না। পরিবেশকে কাজে লাগান যায় তার নিয়ম জেনে, তার নিয়মকে স্বীকার করে। এটা একটা সমঝোতা। মানবসমাজকেও তার ক্রমবিবর্তনের নিয়ম জেনেই শুধু বদলান সম্ভব। এজন্য মানুষের প্রকৃতি, তার সমাজসংস্থার ইতিহাস, অর্থনীতি, বিজ্ঞান এমনি বহু বিষয় সম্পর্কে আমাদের অধিকতর জ্ঞান এবং আমাদের আয়ত্তাধীন কলাকৌশলের সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ প্রয়োজন।

বিজ্ঞানের গবেষণা আজ মানবজাতির উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের অনেকগুলো সম্ভাবনা স্পষ্টতর করে তুলেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে মূল সমস্যা মানুষের জীবসত্তার পুনর্গঠন নয়, তার সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠন। একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে সেই সমাজব্যবস্থাই বাঞ্ছিত যেখানে উৎকৃষ্ট জিনসংস্থা সামাজিক প্রতিবন্ধে এতটুকুও লুপ্ত বা বিকৃত হবে না এবং অপকৃষ্ট জিনবিন্যাসও পাবে সম্ভাব্য বিকাশের আনুকূল্য। মানব-বিবর্তনের জীবসম্ভাবনা এখনো লুপ্ত হয় নি, বরং মিউটেশন কিংবা নববিন্যাসে উৎকৃষ্টতর জিনসংস্থার উদ্ভবও ঘটতে পারে।

এ প্রেক্ষিতে ইউজেনিক্সের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জীববিজ্ঞানীর যেমন সমাজবিজ্ঞান অধ্যায়ন প্রয়োজন, তেমনি সামজবিজ্ঞানীর পক্ষেও মানব-বিবর্তনের সম্ভাবনাসমূহ অনুধাবনে জীববিজ্ঞান অনুশীলন আবশ্যক। কী ধরনের সমাজ মানব-বিবর্তনের সর্বাধিক অনুকূল, আমাদের তা অবশ্যই আবিষ্কার করতে হবে। জীববিজ্ঞানীরা আজও সমাজতত্ত্বে ততটা আকৃষ্ট নন। তবুও স্বীকার্য যে, তাদের গবেষণা মানবজাতির ঐক্য ও সামগ্রিক বিকাশ-সম্ভাবনাকে বহুদূর সম্প্রসারিত

www.pathagar.com

করেছে। মানব-ঐক্যের পরিপন্থী যেসব ধারণা এককালে বিজ্ঞানসিদ্ধতার নামে আমাদের চিন্তা ও কর্মকে প্রভাবিত করেছে, জীবজ্ঞানের অগ্রগতির কল্যাণেই আজ সেগুলোর বিলয় ঘটেছে। সকল মানুষ এক, তাদের কল্যাণও অভিন্ন – এ ধরনের প্রাচীন ধারণা এখন ধর্মীয় আদর্শ কিংবা মহৎ বাণীমাত্র নয়, বিজ্ঞানভিত্তিকও। বিশ্বমানবের কল্যাণসাধনা আজ বিজ্ঞানের দৃঢ়-ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ মানবচিন্তায় বিপ্লব ঘটিয়েছে। অতঃপর এমন প্রত্যাশা অবশ্যই অযৌক্তিক নয় যে, যে-শিল্পবিপ্লব সমাজবিপ্লব ত্বরান্বিত করেছিল আজকের বিজ্ঞানও একদিন অনুরূপ এক মহৎ যুগের আবির্ভাব ঘটাবে। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন বিশ্বমানবের সমবেত প্রচেষ্টা।

১৯৬১

তথ্যসূত্র :

1. *Origin of Species*, C. Darwin, P 14.
2. *The Life and Letters of Charles Darwin*, Vol I, Basic Books Inc. N. Y.
3. *Back to Methusela*, J. B. Shaw, P 50.
4. *Man and the Modern World*, Julian Huxley, A Menter Book, 1952, P 90.
5. *Aspects lf Human Equality*, H. Hoagland.
6. *The Impact of Science on society*, Bertrand Russel, P 19.
7. *Man and the Modern World*, Julian Huxley, A Menter Book, 1952, P 90.
8. *Illusion and Reality*, Christopher Caudwell, P 136.
9. *Genes, Plants and People*, C. D. Darlington and k. Mather, P 137.
10. *Evolutionary System* : *Animal and Human*, Prof. C. H. Wadington, C.B.E. F.R.S; উৎস Nature, Vol 183, June, 1959, P 1637.
11. *Meaning of Evolution*, Gaylord Simpson, A Menter Book, 1956, P 174.

www.pathagar.com

ডেভিলস্ চ্যাপলিন

'মানুষের নিয়তি মানুষের চেয়ে শক্তিশালী কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত'– এই ভ্রান্তি থেকে মুক্তি লাভের কাহিনির নাম ডারউইনবাদ।'[১] এমন মতবাদের হোতাকে উনিশ শতকী ধর্মবিশ্বাসী ইংরেজদের পক্ষে 'শয়তানের সঙ্গী' নামে আখ্যায়িত করাটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। ডারউইন সৃষ্টিতত্ত্বে অবিশ্বাসী, কট্টর নাস্তিক, ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি যে এসব বিশেষণে বিভূষিত হবেন তা জানতেন আর সেজন্যে শয়তানের সঙ্গীর চেয়ে অধিকতর ব্যঙ্গাত্মক একটি অভিধা উদ্ভাবন করেছিলেন – 'শয়তানের সঙ'। 'অরিজিন অব স্পিসিজ' নামের যে-গ্রন্থের জন্য তিনি বিখ্যাত ও কুখ্যাত সেটা প্রকাশের তিন বছর আগে ১৮৫৬ সালে সুহৃদ উদ্ভিদবিদ ডালটন হুকারকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'বিশ্রী, বর্জতুল্য, ভুলে-ভরা, সস্তা ও মর্মবিদারী বিষয় নিয়ে এমন বই ডেভিলস্ চ্যাপলিনই তো লিখবে।'[২] স্বআরোপিত 'সঙ' ও তত্তুল্য আরও নানা বিশেষণ অতঃপর অনেক নিন্দুক ও সমালোচক ব্যবহার করেছেন। ডারউইনের তত্ত্ব মোটামুটি আমাদের জানা। অতিসরল কাঠামোর আদিপ্রাণ কোটি কোটি বছরের পথপরিক্রমায় প্রকৃতির নিয়মে পরিবর্তিত হতে হতে আজকের বিশাল ও বিচিত্র জীবজগৎ উৎপাদন করেছে। কোন সর্বশক্তিমানের খেয়ালে তা সাত দিন, সাত মাস, এমনকি সাত কোটি বছরেও সৃষ্টি হয়নি। বিজ্ঞানের নানা শাখা থেকে তিনি তাঁর মতবাদের পক্ষে অজস্র তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তবে এটুকুই সব নয়, আছে বিবর্তনের খোদ প্রক্রিয়াটিও, অর্থাৎ 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'। *অরিজিন অব স্পিসিজ* গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদটি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। 'একটি আঁকাবাঁকা নদীতীর নানা জাতের অজস্র তরুলতায় ঢাকা। গাছে গাছে পাখির কলকাকলি, ঝোপঝাড়ে কীটপতঙ্গের ওড়াউড়ি, সোঁদা মাটিতে কেঁচোর হামাগুড়ি। এই সুগঠিত সুসম্পূর্ণ জীবেরা পরস্পর থেকে একেবারেই পৃথক এবং একটি জটিল প্রক্রিয়ায় আবার পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলও। তারা সকলেই আমাদের বেষ্টনকারী সক্রিয় নিয়মের আওতায় উৎপন্ন। গোটা ব্যাপারটি ভাবনায় ডুবে যাওয়ার মতো বড়ই চিত্তাকর্ষক। বৃহত্তর অর্থে দেখলে এই নিয়মগুলো হলো অত্যধিক বংশবৃদ্ধি, প্রজননে পরিস্ফুট বংশগতি, পরিবর্তনশীলতা, জীবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার। বংশবৃদ্ধির অনুপাত এতই অধিক যে জীবদের সুকঠিন

www.pathagar.com

জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হতে হয় এবং ফলত প্রাকৃতিক নির্বাচনে ভিন্নতর ধরন ও স্বল্পোন্নতদের বিলুপ্তি ঘটে। এভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম, খাদ্যাভাব ও মৃত্যুর আবহ থেকে উন্নততর জীবেরা জন্মায় যা আমাদের পক্ষে কল্পনাসম্ভব এবং পরম আনন্দের একটি বিষয়। একটি চমকপ্রদ মতবাদ অনুসারে অভিকর্ষের চিরায়ত নিয়মে ঘূর্ণমান এই গ্রহে সৃষ্টিকর্তা সর্বপ্রথম খুব সীমিত ক্ষমতাধর একটি বা কয়েকটি সত্তায় প্রাণসঞ্চার করেন। সেই সূচনা থেকেই অতীব সুদর্শন ও বিস্ময়কর অজস্র গড়নের জীব উৎপন্ন হয়েছে ও হচ্ছে।'

১৮৫৯ সালের ২৪ নভেম্বর 'অরিজিন অব স্পিসিজ' প্রকাশের প্রথম দিনই ১২৫০ কপির সবই বিক্রি হয়ে যায়। ডেভিলস্ চ্যাপলিন ভালোই জানতেন তাঁর এই পরিচয়টি অচিরেই খোলাসা হয়ে পড়বে, জিন-তাড়ুয়ারা তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজবে এবং কটুকথার ঢল নামবে। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্যে তিনি ডাউন গাঁয়ের নিভৃত নিবাস ছেড়ে লন্ডনে এলেন, বিজ্ঞানী ও বিদগ্ধজনের দুয়ারে দুয়ারে কড়া নাড়তে লাগলেন, কোথাও অনুকূল সাড়া মিলল না। ঈর্ষাকাতর রবার্ট ওয়েনের কারসাজিতে ব্রিটিশ মিউজিয়াম শত্রুপুরী হয়ে উঠল। এককালের শিক্ষাগুরু স্টিভেনস হেনশ্লো, মুখ্য পৃষ্ঠপোষক চার্লস লায়েল, প্রিয়বন্ধু ও সদাসহায় ডালটন হুকার সকলেই নিশ্চুপ। টমাস হাক্সলি শুধু এটুকুই বললেন যে, এটি কোন তত্ত্ব নয়, বড়জোর একটি হাইপোথেসিস। ভূতত্ত্ব সমিতির সভাপতি ও পারিবারিক বন্ধু এডাম সেজ্উইক বইটি পড়ে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্মানির বিজ্ঞানীরা *প্রজাতির উৎপত্তি*কে ভ্রান্ত তত্ত্ব বলে নাকচ করলেন। সমধিক শোরগোল তুললেন বিগল জাহাজের ক্যাপ্টেন ফিট্স রয়। ইতিপূর্বে তিনি ডাউন গাঁয়ে গিয়ে ডারউইনকে বইটি লেখা থেকে বিরত রাখার চেষ্টাও করেছিলেন। এবার প্রকাশ্যে বলতে লাগলেন যে একটি 'কেউটে সাপকে' তাঁর জাহাজে আশ্রয় দেওয়া বড় ভুল হয়ে গেছে এবং এই পাপস্খলনের জন্যে বিনামূল্যে জনসাধারণ্যে বাইবেল বিলি করতে লাগলেন। হতাশ ডারউইন অগত্যা ডাউন গাঁয়ে নির্জনে আত্মগোপন করলেন।

কিন্তু অচিরেই ডারউইনের বিরোধিতা বিজ্ঞান-বিরোধিতার রূপ পরিগ্রহ করল এবং উদারপন্থি বিজ্ঞানীরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ডারউইনের বন্ধুদের মধ্যে হেনশ্লো, লায়েল ও হুকার ধর্মবিশ্বাসী, হাক্সলি সংশয়বাদী। চার্চ ও কুচক্রীদের তাণ্ডবে এঁদের পক্ষে নিরপেক্ষতার আড়ালে থাকা আর সম্ভব হল না। তাঁরা সম্ভবত অরিজিন অব স্পিসিজের শেষ পরিচ্ছেদের শেষবাক্যে বিবর্তনবাদ সমর্থনের সহায়ক যুক্তি খুঁজে পান। সৃষ্টিকর্তা প্রথমে প্রাণসঞ্চার করে থাকলে বিবর্তনের বাকিটুকু প্রকৃতির পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব এবং এই প্রক্রিয়াটি উদ্ঘাটন মোটেও ঈশ্বরবিরোধিতা নয়, দোষণীয় তো নয়ই। লায়েলের ভূতত্ত্বচিন্তা এবং হুকারের উদ্ভিদশ্রেণিবিন্যাস দুটিতেই ছিল ডারউইনের যুক্তিবিন্যাস ও স্বীকৃতির নানা উপাদান। পরের ঘটনাবলি

www.pathagar.com

এখন ইতিহাসের অন্তর্গত। ১৮৬০ সালের ৩০ জুন স্টিভেন্‌স হেনশ্লোর সভাপতিত্বে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিতর্কে টমাস হাক্সলির কাছে বিশপ উইলবারফোর্সের পরাজয়ের পর সূচিত হল জীববিজ্ঞানে এক বিপ্লব এবং বিশ্ববীক্ষায় বিজ্ঞানের অটল অনুপ্রবেশ ও ডারউইনের প্রতিষ্ঠা। ডারউইনের তত্ত্ব নিয়ে তারপরও নানা বিতর্ক চলেছে, উদ্ঘাটিত হয়েছে নানা ত্রুটি, সংশোধিত হয়েছে সবই, নতুন নতুন তথ্য আত্তীকরণের মাধ্যমে সেটি আজ শক্ত এক বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়েছে। উন্নত বিশ্বে সৃষ্টিতত্ত্ব বনাম বিবর্তনবাদ নিয়ে এখন আর কোনো বিতর্ক নেই, ব্যতিক্রম শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেখানে রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে সৃষ্টিতত্ত্ব দিব্যি বেঁচেবর্তে আছে। কেন এমন হল, কী সেই স্বরূপ, কারা মদতদাতা সবাই আলাদা এক অনুচ্ছেদে আলোচিত হবে। তবে এটুকু বলে রাখা ভাল যে মার্কিন বিজ্ঞানীদের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলেই মূলত সংশ্লোষিত বিবর্তনবাদের সৃষ্টি। সংশোধনের জন্য এই সংযোজন এতটাই গুরুভার যে কেউ কেউ মনে করেন বিবর্তন ব্যাখ্যায় 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' এখন অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু অনেকেই তা স্বীকার করেন না এবং লক্ষণীয় মৌলবাদী আক্রমণের মূল বিন্দু পূর্ববৎ ডারউইনই আছেন।

শুধু ধর্মবিশ্বাসীরাই নয়, উদারপন্থিদের অনেকেও ডারউইনের তত্ত্ব সমর্থন করেননি এবং তাঁর মূল কারণ 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' যা একাধারে নিষ্ঠুর, নির্মুখ ও মৃত্যুকীর্ণ। তারা বালখিল্য সারল্যে মহাবৈশ্বিক নিয়ম ও মানুষী নৈতিকতার পার্থক্য গুলিয়ে ফেলেছিলেন এবং এখনও ফেলেন। তাই ফ্যাবিয়ান সোস্যালিস্ট ও নাস্তিক বার্নার্ড শ *ব্যাক টু মেথুসেলা* গ্রন্থে লিখেছেন, 'গোটা তাৎপর্যটি লক্ষ করলে আপনার হৃদয় বালুকাস্তূপে তলিয়ে যাবে। এতে আছে এক ভয়ঙ্কর অদৃষ্টবাদ এবং সেইসঙ্গে সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তার, শক্তি ও উদ্দেশ্যের, মর্যাদা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার মারাত্মক বিনষ্টি।'[৪] উপায় ও উদ্দেশ্যের সঙ্গতি মানুষের সমস্যা, প্রকৃতির নয়। সে কাউকে ঘৃণাও করে না, ভালও বাসে না। প্রকৃতির কোন উদ্দেশ্যও নেই। তাই শ অপেক্ষাকৃত কম নিষ্ঠুর এবং অধিকতর ইচ্ছাশক্তিনির্ভর লামার্কবাদকে গ্রহণযোগ্য ভেবেছেন। ওল্ড *ম্যান অ্যান্ড দ্য সি* উপন্যাসে শিকারির সংলাপ মনে পড়ে। সে মাছটিকে ভালোবাসে, তাকে ভাই বলেও ডাকে অথচ মাছটিকে সেজন্যেই মারতে চায়। হেমিংওয়ে কি তাহলে প্রকৃতি ও জীবজগতের দ্বন্দ্বমূলক আন্তঃসম্পর্কের কথা বলতে চেয়েছেন? প্রকৃতির নিয়ম এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা। এ থেকে পরিত্রাণ নেই। আমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্ট ফল-ফসল আর গৃহপালিত পশুকুলের উৎপত্তিও প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই অসচেতন অনুকৃতি এবং একই মাত্রার হিংসাত্মক অথচ শেষ ফলশ্রুতি কত-না মুগ্ধকর। মাঠের ফসল, বাগানের ফুল, দৌড়ের ঘোড়া, শৌখিন পায়রা, লোমশ কুকুর-বিড়াল থেকে চোখ ফেরান দায়। এসবই নির্মম নির্বাচনের সৃষ্টি। তাই স্রেফ নিষ্ঠুরতার ওজরে ডারউইনবাদ বর্জন এবং লামার্ককে আলিঙ্গনের

www.pathagar.com

কোন হেতু নেই। অধিকন্তু লামার্কবাদ প্রমাণসিদ্ধ কোন তত্ত্ব নয়, ধারণা মাত্র আর সেই ধারা অনুসরণ করলে আমাদের পক্ষে কৃষিক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন অসম্ভব হতো এবং সভ্যতারও বিকাশ ঘটত না। লামার্কের তত্ত্ব – পরিবেশের প্রভাবে অর্জিত পরিবর্তনগুলো বংশানুসৃত হয় – তা কোথাও সত্য প্রমাণিত হয় নি।'

কার্ল মার্কস সুবিদিত ডারউইনবাদী, বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষা নির্মাণে তিনি ডারউইনের তত্ত্ব থেকে পর্যাপ্ত সহায়তা পেয়েছিলেন। সঙ্গত কারণেই তাই বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ডারউইনকে তাদের অন্যতম বীরের স্বীকৃতি দেয় এবং বিশাল ডারউইন মিউজিয়াম নির্মাণের সঙ্গে স্কুল পর্যায় থেকে ডারউইনবাদ পাঠ্যসূচিভুক্ত করে। কিন্তু সমস্যা দেখা যায় স্তালিন শাসনে। তিনি কৃষির বাধ্যতামূলক যৌথীকরণ সম্পন্ন করেন এবং রাশিয়ার বিরূপ জলাবায়ুর সঙ্গে লাগসই নতুন নতুন ফসলের জাত উৎপাদনে উদ্যোগী হন। ভ্যাবিলভ তখন লেনিন কৃষি-আকাদেমির প্রধান এবং আন্তর্জাতিক উদ্ভিদবিদ্যা কংগ্রেসের সভাপতি। তাঁদের অনুসৃত ডারউইনি পদ্ধতিতে দৈবচয়িত পরিবৃতির ওপর কৃত্রিম নির্বাচন চালিয়ে পছন্দসই ভ্যারাইটি উদ্ভাবন অত্যন্ত কালক্ষেপক। স্তালিনের চাই কালসংকোচন। এমন সময়ই পাদপ্রদীপের আলোয় মিচুরিন ও লিসেঙ্কোর উদয়। তাঁরা ক্রমোসম বা জিনের পরিবর্তে পরিবেশের চাপের সাহায্যে জীবদেহের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটান এবং অল্পকালের মধ্যেই নতুন জাতের ফসল উৎপাদন করেন। এই অসম্ভবের দাবিদাররা স্পষ্টতই লামার্কবাদী। তাঁরা অচিরেই স্তালিনের আনুকূল্য পেলেন এবং আয়োজিত হল ভাবিলভ ও লিসেঙ্কোর জন্য এক বিতর্কসভা। স্মর্তব্য, হাক্সলি ও উইলবারফোর্সের অক্সফোর্ড বাগযুদ্ধ। কিন্তু ফল হল বিপরীত, এবার জয় অবিজ্ঞানের, হেরে গেলেন ভাবিলভ। তিনি ও তাঁর সঙ্গীদের কেউ গেলেন কারাগারে, কেউ-বা সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে। তত্ত্ব বর্জিত হলেও তাত্ত্বিক অর্থাৎ ডারউইন বহাল থাকলেন, সোভিয়েত জীববিদ্যায় সংযোজিত হল এক নতুন অধ্যায় – নবডারউইনবাদ। তাতে বিষম ফল ফলেছিল। সোভিয়েত জীববিদ্যা ও কৃষি পিছিয়ে পড়েছিল অর্ধশত বছর। বিজ্ঞানের ওপর ভাবদর্শীয় জবরদস্তির এই হল পরিণতি।

ডারউইনবাদের আরেকটি বিচ্যুতির নাম সোস্যাল ডারউইনিজম বা ডারউইনবাদী সমাজতত্ত্ব। ডারউইনের জীবদ্দশায়ই এই তত্ত্বের উদ্ভব এবং তিনিই দ্ব্যর্থহীন প্রথম প্রতিবাদী। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে হোমো জাতের জীব সেপিয়েন্স হয়ে ওঠার পর তাদের ওপর প্রাকৃতিক নির্বাচন নিষ্ক্রিয় হতে হতে একসময় বিলুপ্ত হয়। হোমো সেপিয়েন্স এখন প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবমুক্ত, একথা জানালেও তাঁর অনুসারী সমাজবিদদের কেউই তাঁকে আমল দেন নি। যুগটি ছিল সাম্রাজ্যবাদের,

www.pathagar.com

জাতিগত অবদমন ও যুদ্ধের আর সেজন্য প্রয়োজন পড়েছিল একটি লাগসই বৈজ্ঞানিক মতবাদের যার খোঁজ মেলে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তত্ত্বে। ডারউইবাদের অন্যতম মুখ্য প্রচারক হার্বার্ড স্পেনসর 'জীবনের জন্য সংগ্রাম' ও 'প্রাকৃতিক নির্বাচনে আনুকূল্যপ্রাপ্ত জাতিসমূহ সংরক্ষণ'– ডারউইনের ব্যবহৃত এই শব্দগুলো 'অস্তিত্বের সংগ্রাম' ও 'যোগ্যতমের উদ্ববর্তন' হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন এবং ডারউইন তা অনুমোদনও করেন।[৬] ডারউইনের তত্ত্ব মানবসমাজেও প্রযোজ্য–এই ধারণা প্রচার করে অতঃপর স্পেনসর ডারউইনবাদী সমাজতত্ত্বের মুখ্য প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে সহজ : মানবসমাজে অস্তিত্বের সংগ্রাম চলছে এবং যোগ্যতমরাই উদ্‌বর্তিত হচ্ছে ব্যক্তিপর্যায়ে, জাতিপর্যায়ে। ফলত সমাজে ধনিকশ্রেণি এবং বিশ্বপরিসরে শ্বেতজাতি কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গ ও পীতাঙ্গ জাতিগুলোর অবদমন বৈজ্ঞানিক বিচারে বৈধ। এই হল মোদ্দা কথা। এই অযৌক্তিক মতবাদ অনেকের নিন্দা কুড়ালেও সমর্থকদের সংখ্যায়ও কম ছিল না। বিরোধীদলের জর্জ বার্নার্ড শ তাঁর *ব্যাক টু ম্যাথুসেলা* গ্রন্থে লিখেছেন, 'খাদ্য ও অর্থের জন্য অবাধ প্রতিযোগিতা ও আদিম স্বাধীনতার সপক্ষে এমন সুদৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক প্রচার ইতিহাসে দেখা যায় নি। বিনা শাস্তিতে সবল কর্তৃক দুর্বলের নিষ্পেষণ, একমাত্র সরকার কর্তৃক সমস্ত বিধিনিষেধ নিয়ন্ত্রণ এবং গুন্ডাশ্রেণির লোকদের আক্রমণ থেকে আইনানুগ দস্যুতার নিরাপত্তা বিধানের জন্যে কেবল পুলিশবাহিনীর সার্বিক নির্ভরতার মধ্যেই যে ব্যক্তি ও সমাজের সমস্ত প্রাচুর্য, উন্নতি ও মঙ্গল নিহিত, এমনভাবে তা আর কখনও মানুষকে বোঝানো হয়নি।[৭] এবার এইচ.জি. ওয়েলসের রক্ত হিম করা বয়ান শুনুন: 'আর কীভাবে নবপ্রজাতন্ত্র অধম জাতিগুলোর সঙ্গে ব্যবহার করবে? কীভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের... পীতাঙ্গদের...ইহুদিদের সঙ্গে? ...দুনিয়াটা দুনিয়াই, কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়... তাদের বিদায় নিতেই হবে... নবপ্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের একটি আদর্শ থাকবে যা হত্যাকে যথার্থ উপযুক্ততা দেবে।'[৮] এই তত্ত্বে হিটলার খুঁজে পান যুদ্ধের ন্যায্যতা, আর্যজাতির কৌলিন্য প্রতিষ্ঠা এবং এককোটি ইহুদি ও জিপসিকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যার যুক্তি। একটি তত্ত্বের অপব্যাখ্যার এমন বিষময় ফল ইতিহাসে বিরল। আরেকটি প্রশ্নও অতঃপর জিজ্ঞাস্য – মার্কস কি শ্রেণিসংগ্রাম প্রশ্নে ডারউইনবাদী সমাজতত্ত্বে প্রভাবিত হয়েছিলেন? সম্ভবত না। কিন্তু লামার্কবাদের প্রভাব মার্কস–এঙ্গেলস এড়াতে পারেন নি। এঙ্গেলস *অ্যান্টি ডুরিং* গ্রন্থে মানুষের বিবর্তনে শ্রমের যে-ভূমিকা উল্লেখ করেছেন তা স্পষ্টতই লামার্কীয়।[৯]

ডেভিলস্ চ্যাপলিন কি তাঁর তত্ত্বের এতসব অপসম্ভাবনা অনুমান করেছিলেন? ধর্মান্ধদের বিরোধিতা ছাড়া অন্যগুলো সম্ভবত না। বার্নার্ড শ'র মতো মানবতাবাদীরা যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভয়ঙ্কর নির্মমতায় ভীত হয়ে লামার্কবাদের দিকে ঝুঁকবেন

www.pathagar.com

সেটাও তাঁর চিন্তায় ঠাঁই পাওয়ার কথা নয়। তিনি তো জীবনের জন্যে মরণপণ সংগ্রামের সঙ্গে জীবজগতে বিদ্যমান সহযোগিতার কথাও *প্রজাতির উৎপত্তি* গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন, যদিও অনেকটা পরোক্ষভাবে। প্রকৃতির এই দ্বান্দ্বিকতা এক অনিবার্য বাস্তবতা যা প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান এবং আমাদের সভ্যতায়ও। প্রকৃতি 'অন্ধ ঘড়িনির্মাতা' হলেও মানুষ চক্ষুষ্মান হোমো সেপিয়েন্স বা 'জ্ঞানীজীব' এবং একজন উৎকৃষ্ট ডিজাইনার। তার পক্ষে এখন প্রকৃতির অনেকগুলো নিয়ম নিয়ন্ত্রণ এবং সংগ্রামের সঙ্গে সহযোগিতার একটা ভারসাম্য সৃষ্টি সম্ভব। জীবনের জন্যে সংগ্রামের হেতুগুলো – অতিপ্রজনন, খাদ্যাভাব এবং ফলত যুদ্ধ সবই আজ বহুলাংশে প্রশমিত। প্রাকৃতিক নির্বাচনের স্থূল হেতুগুলো নিয়ন্ত্রণ এখন মানুষের সাধ্যায়ত্ত, এবার প্রয়োজন সমাজ মনোস্তত্ত্বের ব্যাপক পরিবর্তন। যুদ্ধহীন, খাদ্যে স্বনির্ভর ও অহিংস একটি বিশ্ব আজ আর স্বপ্ন নয়, অর্জনসাধ্য। আমরা গোট জীবজগতের সঙ্গে সহবাস ও প্রকৃতির সঙ্গে মিথোজীবিতামূলক সম্পর্ক উদ্ভাবনে সচেষ্ট। বিবর্তনবাদ থেকেই আমরা এই শিক্ষালাভ করেছি। অন্যথা প্রাকৃতিক নির্বাচনের আওতামুক্ত মানুষ নিজ বিবর্তন অব্যাহত রাখার প্রশ্নে কানাগলিতে আটকে পড়ত। তাই ডারউইনের কাছে গোটা মানবজাতি ঋণী।

বিশ্বজুড়ে এবার ডারউইন জন্মের দুই শ' বছর ও *অরিজিন অব স্পিসিজ* গ্রন্থের দেড়'শ বছর পূর্তি উৎসব উদযাপিত হচ্ছে। ১৮৬০ সালে অক্সফোর্ডে সৃষ্টিতত্ত্ব বনাম বিবর্তনবাদ বিতর্কের পরিসমাপ্তির পর ইউরোপ এই বিভ্রাটমুক্ত হলেও মার্কিনদেশে তা আজও টিকে আছে এবং চার্চ, রাজনীতিক ও কিছু বিভ্রান্ত বিজ্ঞানীর মদতে সৃষ্টিতত্ত্ব সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শের রূপলাভ করেছে। বিজ্ঞানের অন্যতম পীঠস্থান আমেরিকায় কেনই-বা এমন পরিস্থিতি, কেনই-বা ফিলিপ জনসন যাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধের শুরু, বিজ্ঞানমনস্ক আইনবিদ হয়েও এই আন্দোলনের পুরোধা, বোঝা কঠিন। বন্যা আহমেদ তাঁর 'বিবর্তনের পথে' গ্রন্থে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৯] অভিবাসী মার্কিনিদের উদ্বাস্তু সংস্কৃতিও একটি কারণ হতে পারে।

আধুনিক সৃষ্টিবাদীরা অবশ্য বিশপ উইলবারফোর্সের সেকেলে যুক্তি নিয়ে সংশ্লেষিত বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন নি। তাদের অস্ত্রভাণ্ডারে আছে তাপগতিবিদ্যার এন্ট্রপি আর বংশগতিবিদ্যার ডিএনএ, আরএনএ, প্রোটিন, উৎসেচক ইত্যাদি এবং প্রাণের উৎপত্তিসহ বিজ্ঞানের সীমান্তবর্তী কিছু অমীমাংসিত বিষয়। তারা বোঝাতে চান যে প্রাণের উৎপত্তি ও বিবর্তন প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যেয় নয়, এগুলোর পেছনে আছে অদৃশ্য এক ডিজাইন ও ডিজাইনার, পরোক্ষে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। তাই তত্ত্বের নামকরণ হলো ইনটেলিজেন্ট ডিজাইন (আইডি) অর্থাৎ বুদ্ধিদীপ্ত নকশা। অকাট্য যুক্তি বটে! তাদের উপকরণগুলো নতুন, কিন্তু মারপ্যাঁচ মধ্যযুগীয়। এককালে সকল দুর্বোধ্যই ছিল অতিপ্রাকৃত শক্তির লীলা।

www.pathagar.com

আইডি কি আমাদের সেকথাই বলে না? ডারউইনের জীবৎকালে তাঁর তত্ত্বের অনেক কিছু স্বীকার করেও চোখের উৎপত্তি সম্পর্কে কেউ কেউ সন্দিহান ছিলেন, ফলত ডারউইনকে কেঁচোর চোখ থেকে স্তন্যপায়ীদের চোখ পর্যন্ত গোটা বিবর্তনটি ব্যাখ্যা করতে হয়। সকল বিরুদ্ধবাদী তাতে অবশ্য তুষ্ট হননি, আজও অনেকে তুষ্ট নন। কৃত্রিম চোখ না বানান পর্যন্ত তারা নিবৃত্ত হবেন না। আইডি'র খপ্পরে আটকে গেলে সভ্যতার বিকাশ ঘটত না। এই সুচতুর চক্রান্তের লক্ষ্য একটিই – বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষার বহুশতবর্ষ সাধনায় নির্মিত বিজ্ঞানসৌধের মূলে কুঠারাঘাত এবং শিক্ষাসংস্কৃতির অঙ্গনে ভাববাদ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু মার্কিন বিজ্ঞানীরা আর নীরব দর্শকের ভূমিকায় নেই। তাঁরা নিভৃত গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে পড়ছেন, আনুষঙ্গিক বইপত্র ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন, আইডি-বিরোধী সভাসমিতিতে যোগ দিচ্ছেন, আইডি-সংক্রান্ত মামলায় সাক্ষ্য দিতেও হাজির হচ্ছেন। এই ধরনের মামলা হয়েছে অনেকগুলো এবং সৃষ্টিবাদী বক্তব্য অসার অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক প্রমাণিত হওয়ায় সবগুলোতেই তারা হেরেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এককালের সহাপাঠী আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজীববিদ্যার সাবেক অধ্যাপক ড. জ্ঞানেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য সম্প্রতি আমাকে এক চিঠিতে জানিয়েছেন যে আইডি মোকাবিলায় স্কুলশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য গ্রীষ্মকালীন কোর্স খোলা হয়েছে এবং জীবরসায়ন, অনুজীববিদ্যা, বংশগতিবিদ্যা ও বিবর্তনবাদের অধুনাতম আবিষ্কারগুলো পড়ান হচ্ছে যাতে তারা আইডি'র যুক্তিখণ্ডন করতে ও ছাত্রদের ওই কুশিক্ষা থেকে মুক্ত রাখতে পারেন।

আমরা পঞ্চাশ দশকের শেষার্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে বিবর্তনবাদ পড়েছি। শিক্ষকরা ছিলেন ধর্মবিশ্বাসী, বিবর্তনবাদ সম্পর্কে কোন নেতিবাচক মন্তব্য কোনদিন শুনিনি। আমি তারপর অনেক বছর কলেজে বিবর্তনবাদ পড়িয়েছি, কোন সমস্যা হয় নি। দশককাল হল উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যক্রম থেকে বিষয়টি তুলে দিয়ে জীবপ্রযুক্তি পড়ান হচ্ছে। কিন্তু তার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাই নি। আমাদের শিক্ষাঙ্গনে কি আইডি'র অনুপ্রবেশ ঘটেছে, নাকি এটি বিজ্ঞানের ওপর প্রযুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার নীতি? এ নিয়ে প্রতিবাদ উঠেছে, তবে সামান্য। অথচ বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অবিজ্ঞানের কাছে নতিস্বীকার কিংবা জ্ঞান এড়িয়ে প্রয়োগ শিক্ষণ দুটিই আখেরে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর। ফেরা যাক আবার ডেভিল্‌স চ্যাপলিন প্রসঙ্গে। এককালের স্বঘোষিত 'সঙ' এখন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী। তাঁর তত্ত্বে উনিশ ও বিশ শতকী গোটা বিশ্ববীক্ষা আলোড়িত হয়েছিল – সাহিত্য, দর্শন, সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি কোনোটাই বাদ পড়ে নি। নিউটনের মতো ডারউইনও বিশ্বজ্ঞানের জগতে একটি প্যারাডাইম শিফ্‌টের স্রষ্টা। তিনি প্রয়াত হন ১৮৮১ সালের ১৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় এবং সমাহিত হন ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যবির কবরখানায় নিউটনের পাশে।

www.pathagar.com

১. *The God Delusion*, Richard Dawkis, Houghton Mifflin Co., Boston, New York, 2006, p.5

২. *A Davil's Chaplin*, Richard Dawkins, Weidenfeld & Nicalson, London, 2003, p. 10

৩. *The Origin of Species*, Charles Darwin, 6th ed.

৪. প্রাগুক্ত ২, পৃ. ১০

৫. *বিবর্তনবাদ*, ম. আখতারুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ ৫৯-৭৮

৬. *Darwins Biological work*, ed, P.R Bell, John wileyd Sond, New York, 1964 গ্রন্থে দ্রষ্টব্য Natural Selection, J.B.S Haldane, p. 101

৭. *বিজ্ঞান ও শিক্ষা : দায়বদ্ধতার নিরিখ*, দ্বিজেন শর্মা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪, বইয়ে উল্লিখিত *Back to Methuselah* থেকে উদ্ধৃতি, পৃ. ৩৩

৮. প্রাগুক্ত ২, H. H. Wells, *The New World* থেকে উদ্ধৃতি পৃ. ৯

৯. *প্রজাতির উৎপত্তি*, *The Origin of Species* গ্রন্থের ভাষান্তর, ম. আখতারুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, 'অনুবাদকের কথা' ভূমিকার পঁচিশ পৃষ্ঠা

১০. *বিবর্তনের পথে*, বন্যা আহমেদ, অবসর, ঢাকা ২০০৭ পৃ. ১৬৮-২০০

২০১১

www.pathagar.com

ডারউইন : বিশ্বে ও মহাবিশ্বে

আমি অনেক দিন থেকেই প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে লিখছি। শুরু করেছিলাম তখন একা। এখন অনেকেই লিখছেন। কেউ কেউ আমার লেখায় অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবেন এবং তাতে আমি আনন্দিত। কেননা সবাই নিজের কাজের ফল দেখতে চান। একসময় ডারউইন ও বিবর্তনবাদ নিয়েও অনেক লিখেছি, শুরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন থেকে। আমরা সেখানে পড়েছি বিবর্তনবাদের ঢাউস সব বই এবং ইংরেজিতে। পরে কর্মজীবনে কলেজে ডারউইন ও তাঁর তত্ত্ব পড়িয়েছি এবং আশা করেছি, আমার পাঠদান বা বই পড়ে কেউ উদ্বুদ্ধ হয়ে এ বিষয়ে প্রবন্ধ ও বইপত্র লিখবেন। কেননা বিষয়টির পরিসর বিজ্ঞানের ক্ষেত্র অতিক্রম করে দর্শন, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, সাহিত্যসহ মানববিদ্যার প্রায় সব শাখায়ই বিস্তৃত। কিন্তু আমার সেই আশা পূরণ হয়নি। ইদানিং উচ্চ-মাধ্যমিক থেকে ডারউইনবাদ বাদ পড়েছে, বদলি হিসেবে এসেছে জীবপ্রযুক্তি। কেন এই পরিবর্তন জানি না, তবে ডারউইনবাদের প্রতি আদ্যিকালের অনীহা কারণ হয়ে থাকলে বলতেই হয়, পরিকল্পকেরা ভুল করেছেন। কেননা জীবপ্রযুক্তি আসলে ডারউইনবাদেরই সম্প্রসারণ, খোদার ওপর খোদকারির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আমার কর্মজীবনের গোড়ার দিকের ছাত্ররা এখন অবসর নিয়েছেন, তাঁরা আমাকে জানিয়েছেন, কলেজে জীববিদ্যার অনেক শিক্ষক নাকি ডারউইনবাদ পড়াতে চান না, কিংবা পড়ালেও শুরুতেই ছাত্রদের এই তত্ত্বটি বিশ্বাস না করতে বলেন। অথচ পাকিস্তানি জামানায় আমরা ডারউইনবাদ পড়েছি, আমাদের কোনো শিক্ষক এমন কথা বলেননি, বরং তাঁদের এই তত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টাই করেছেন। তাঁরা কেউ নাস্তিক ছিলেন না। ডারউইনের সহযোগী সমর্থকেরাও (লায়েল, হুকার, ওয়ালেস প্রমুখ) প্রায় সবাই ছিলেন ধার্মিক। তাহলে আমাদের এই পশ্চাদগতি কেন? উত্তরটি আমাদের শিক্ষাপরিকল্পকেরা জানতে পারেন।

ডারউইন বিষয়ক আমার প্রথম বই 'ডারউইন : পিতামহ সুহৃদ সহযাত্রী' বেরোয় ১৯৭৫ সালে। তারপর আরও দুটি। আমার বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম. আখতারুজ্জামান যিনি বিবর্তনবিদ্যা (১৯৯৮) নামের একটি মৌলিক পাঠ্যবইয়ের লেখক ও ডারউইনের *অরিজিন অব স্পিসিজ* (প্রজাতির উৎপত্তি, ২০০০) গ্রন্থের অনুবাদক। তিনি এক সভায় দুঃখ করে বলেছিলেন, 'গোটা কর্মজীবনটাই

www.pathagar.com

ছাত্রছাত্রীদের বিবর্তনবাদ পড়িয়ে কাটালাম, অথচ আজও তারা বলে প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে, উৎপন্ন হয়নি। আমি অতঃপর ধরেই নিয়েছিলাম, আমাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ, দেশ উল্টো পথে চলছে। ভুলটি ভাঙল অকস্মাৎ, মার্কিন মুলুকের তিন বাঙালির লেখা বিবর্তন বিষয়ক দুটি বই হাতে এলে। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার, তাঁদের দুজন প্রকৌশলী, একজন সমাজবিজ্ঞানী। আমি অভিভূত ও আনন্দিত। তাঁরা কেউই আমার বই পড়েননি, আমার প্রভাববলয়ের মানুষও নন, কিন্তু তাঁরা নিশ্চিত আমার উত্তরসুরি। তাঁরা বাংলাদেশে পড়াশোনা করেছেন, দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তবে তাঁদের জন্য সম্ভবত আমেরিকায় একটি 'শক' অপেক্ষিত ছিল, আর তা হল, জ্ঞানবিজ্ঞানে অত্যন্নুত একটি দেশে বিদ্যমান পশ্চাৎমুখিনতা, সমাজের একটি অগ্রসর অংশের বিবর্তনবাদ তথা ডারউইনবিরোধিতা। ব্যাপারটা আসলে ওই দেশের পুরোনো ব্যাধি। অনেক বছর আগে সেখানে স্কুলে বিবর্তনবাদ পড়ান নিয়ে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা হয়, শাস্তি হয়। শেষে তিনি মুক্তিও পান এবং এ নিয়ে নাটক লেখা ও চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। কিন্তু সবই এখন ইতিহাস।

সৃষ্টিতত্ত্বেও বিশ্বাসের এই ধারা যে আজ সেখানে আইডি (ইনটেলিজেন্ট ডিজাইন) নামে একটি নতুন তত্ত্বের আশ্রয়ে বেশ পাকাপোক্ত হয়েছে এবং স্কুলে বিবর্তনবাদের পাঠদানে বাধা সৃষ্টি করছে বিভিন্ন স্কুল-বোর্ড, অভিভাবক ও সৃষ্টিবাদী গোষ্ঠীরা, সেই খবরটি জানান আমার আরেক বন্ধু, যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইয়ো রাজ্যের মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীববিদ্যার অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্র কুমার ভটাচার্য। তিনি আরও জানান, তাঁরা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যাটি মোকাবিলার জন্য স্কুল-শিক্ষকদের সামার কোর্সে বিবর্তনবিদ্যার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, ডারউইনবাদের পক্ষে ক্লাসিক্যাল সাক্ষ্যপ্রমাণের সঙ্গে বংশগতিবিদ্যার অধুনাতম আবিষ্কারগুলো শেখাচ্ছেন।

এবার মূল প্রতিপাদ্যে ফেরা যাক। যে দুটি বইয়ের কথা বলেছিলাম সেগুলো হল *বিবর্তনের পথ ধরে* এবং *মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে*, লিখেছেন যথাক্রমে বন্যা আহমেদ এবং অভিজিৎ রায় ও ফরিদ আহমেদ, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৭, প্রকাশক ঢাকার অবসর।

দুটি বই পরস্পর সম্পুরক। প্রথমটির প্রধান আলোচ্য বিবর্তনবাদ, দ্বিতীয়টির প্রাণের উৎপত্তি। সম্ভবত তাঁরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ এবং প্রকল্পটি যৌথ। তাতে আমাদের লাভই হল, একত্রে জানা গেল পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি, বিবর্তন এবং গ্রহান্তরে প্রাণের উৎপত্তি, বিকাশ ও সভ্যতার সম্ভাব্যতা নিয়ে বিস্তারিত।

দুটি বইই তথ্যসমৃদ্ধ, আধুনিক আবিষ্কারের নানা সহযোগী সাক্ষে ভরপুর। *বিবর্তনের পথে* বইয়ের লেখক বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন বিবর্তনের সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর এবং নৃতত্ত্বে, বিশেষত মানুষের উপত্তি বিষয়ে। এটা সহজবোধ্য, কেননা আমরা যদিও-বা জীববিবর্তনের সত্যতা স্বীকারও করি, কিন্তু অভিন্ন ধারায় মানুষের

www.pathagar.com

উৎপত্তি মানতে রাজি নই। মানুষের সঙ্গে বানরসদৃশ বন্যজীবের আত্মীয়তা স্বীকারে আমাদের অপার লজ্জা। অথচ বিশ্বখ্যাত জীবজ্ঞানী ও লেখক গেলর্ড সিম্পসন এই সহজ সত্যটি বুঝাতে বলেছেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষ খুঁজতে বাইরে চোখ মেলে তাকানোই যথেষ্ট। কিন্তু সেখানেই যত ঝামেলা। স্বয়ং ডারউইন, আমরা সবাই জানি, *প্রজাতির উৎপত্তি* (১৮৫৯) লেখার পর অনেক চাপ সত্ত্বেও *মানুষের উৎপত্তি* (১৮৭১) লিখেছেন আরও বারো বছর পর। আর রাচেল ওয়ালেস, যিনি প্রজাতির উৎপত্তিতত্ত্বের অন্যতম শরিক, তিনিও মানুষের উৎপত্তিতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের বদলে আইডিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আসলে এটা আমাদের একটা দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার এবং তা থেকে মুক্তি সুকঠিন। বন্যা সমস্যাটি ভালোই বোঝেন, যেজন্য মানব বিবর্তনকে সর্বজনগ্রাহ্য করতে প্রদত্ত বিবরণের সঙ্গে হাজির করেছেন প্রচুর ছবি, আমাদের মানবসদৃশ পূর্বপুরুষদের সম্ভাব্য দেহকাঠামো ও নানা চার্ট। বইতে আইডি তত্ত্বের সমর্থকদের কার্যকলাপের বিস্তারিত আলোচনাও আছে।

ইউরোপে এটি নেই, অথচ আমেরিকায় আছে, সে এক রহস্য। আমেরিকা কি তাহলে ইউরোপীয় ঐতিহ্যের সম্প্রসারণ নয়, কিংবা আমেরিকার ইতিহাসের এমন কোন দুর্বলতা আছে যেজন্য সেখানে এমন পশ্চাৎপদতা স্থান করে নিতে পেরেছে? নাকি সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বদাতা এ দেশের এখন আত্মিক অবক্ষয় শুরু হয়েছে? বন্যাও তাই ভাবছেন। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বাস্তু-চারিত্র্যও অন্যতম কারণ হতে পারে।

পাঠকদের সুবিধার জন্য বইয়ের অধ্যায়গুলোর নাম উল্লেখ করছি, কেননা বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।

এলাম আমরা কোথা থেকে? বিবর্তনে প্রাণের স্পন্দন, অনন্ত সময়ের উপহার, চোখের সামনেই বিবর্তন ঘটছে! ফসিল এবং প্রাচীন উপাখ্যানগুলো, ফসিলগুলো কোথা থেকে এল, এই প্রাণের মেলা কত পুরোন?, মিসিং লিঙ্কগুলো আর মিসিং নেই, আমাদের গল্প, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন : সৃষ্টিতত্ত্বের বিবর্তন, যে গল্পের শেষ নেই, বিবর্তনতত্ত্ব সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো। এসব নাম থেকেই স্পষ্ট যে বন্যার বইটি শুষ্কং কাষ্ঠং নয়, অত্যন্ত সহজবোধ্য শৈলীতে সুললিত ভাষায় লেখা।

মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে বইটি পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, আমরা যখন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি, সেই পঞ্চাশের দশকে, এমন কোন বই বাংলায় ছিল না। বন্যার মতো আমিও দেবীপ্রসাদের জনপ্রিয় বিজ্ঞানলহরী পড়েছি। ইংরেজি পেপারব্যাক, সেও তখন সহজলভ্য ছিল না। ওপারিনের *হোয়াট ইজ লাইফ* পেয়েছি অনেক পরে। ওয়াটসন বা ক্রিকরা সৌভাগ্যবান, তাঁরা ছেলেবেলায়ই শ্রোডিংগারের বই পড়ার সুযোগ পেয়েছেন।

পশ্চিমে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা পাঠ্যবই ও জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই লেখেন। আমাদের দেশ তথা ভারতেও এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ। একটি গ্রন্থ একজন মানুষকে অবশ্যই বদলে দিতে পারে, একজন তরুণকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিতে পারে।

www.pathagar.com

তবে এটুকুই যথেষ্ট নয়, চাই অনুকূল পরিবেশ, যা আমাদের নেই। বন্যা, অভিজিৎ, ফরিদ কি দেশে থাকলে এসব বই লিখতেন? আমি ৯৯ ভাগ নিশ্চিত যে লিখতেন না।

প্রাণ যেহেতু পদার্থের শুষ্ক কাঠখড় দিয়ে তৈরি, হয়ত সেজন্য লেখকেরা তাঁদের বইটি শুরু করেছেন মৃত্যুর সজ্ঞার্থ ও নানা কৌতূহলজনক কাহিনী দিয়ে এবং পরে এসেছেন জড় থেকে জীবনে, জীবনের ধর্ম ব্যাখ্যা এবং শেষপর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞানী ও কেলাসবিদ জেডি বার্নালের সজ্ঞার্থে : 'জীবন হচ্ছে একটি অতিজটিল ভৌত-রাসায়নিক তন্ত্র যা একগুচ্ছ সুসংহত বা একীভূত ও স্বনিয়ন্ত্রিত রাসায়নিক ও ভৌত বিক্রিয়ার মাধ্যমে তার পরিপার্শ্বের বস্তু ও শক্তিকে স্বীয় বৃদ্ধির কাছে ব্যবহার করে।'

এই পঙ্‌ক্তিমালা একটু জটিল বটে, তবে গোটা অধ্যায়টি এতটাই সহজ ও সরলভাবে লেখা যে বিজ্ঞানে দশম শ্রেণীর ছাত্রের পক্ষেও বোঝা কঠিন হবে না। শুধু একটি কেন, গোটা বইটিই এভাবে লেখা।

প্রাণের উৎপত্তি বিষয়ে ডারউইনের ধারণার একটি উদ্বৃতি বইতে আছে, যা আমাদের অনেকেরই অজানা এবং সেই সঙ্গে বিস্ময়কর। ডারউইন তাঁর বন্ধু ডালটন হুকারকে এক চিঠিতে লিখেছেন : 'একটা ছোট উষ্ণ পুকুরে বিভিন্ন ধরনের অ্যামোনিয়া, ফসফরিক লবণ, আলো, তাপ, তড়িৎ সবকিছু মিলেমিশে... প্রোটিন যৌগ উৎপন্ন হয়েছে।' অর্থাৎ অজৈব পদার্থ থেকেই জৈব পদার্থ উৎপন্ন হয়ে প্রাণেরও বিকাশ ঘটছে। অনুমেয়, গ্রহান্তরে প্রাণের অস্তিত্ব থাকলে তাও ঘটেছে এই উৎপত্তি এক ও অভিন্ন প্রক্রিয়ায়। পরের ঘটনা আমরা জানি, ওপারিন ও হ্যালডেন প্রাণের সজ্ঞার্থ দেন, ইউরে ও মিলার ডারউইনের ধারণারই যেন বাস্তবায়ন করেন পরীক্ষাগারে অ্যামাইনোঅ্যাসিডের সংশ্লেষ ঘটিয়ে। বইয়ের ৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আছে প্রাণের উৎপত্তির আলোচনা, বাকি ৫০ পৃষ্ঠা চিত্তাকর্ষক, গল্পের মতোই সম্মোহক। এতে আছে কার্ল সাগানসহ বিজ্ঞানীদের নানা পরীক্ষার কথা, এনরিকো ফার্মি গোলকধাঁধা, ড্রেকের সমীকরণ, উফো বা উড়ন্ত চাকি ইত্যাদি। বিস্তারিত নিষ্প্রয়োজন। বাকিটা পাঠকের জন্য।

পরিশেষে সেই পুরোনো প্রসঙ্গ : বইগুলোর প্রভাব কি ঈপ্সিত ফল ফলাবে, আমাদের ক্ষেত্রে যা ঘটেনি, অন্তত দৃশ্যত, সেটা কি ওদের ক্ষেত্রে ঘটবে? বইগুলো কি নতুন প্রজন্ম লুফে নেবে? আমি নিশ্চিত নই, কেননা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা অবক্ষয়ের চরম সীমায় পৌঁছেছে। শিক্ষকেরা বাইরের বইয়ের খোঁজ রাখেন না, ছাত্ররা কোচিংয়ের ঘূর্ণাবর্তে দিশেহারা। এই তরুণ লেখকদের তবু আশা না হারাতে বলি। তাঁদের যেতে হবে অনেক দূর, মাইলস টু গো... এবং বিঘ্নসংকুল পথে।

বিবর্তনের পথ ধরে, বন্যা আহমেদ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, অবসর, ঢাকা, ২৫৬ পৃষ্ঠা, ৩৫০ টাকা।
মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে, অভিজিৎ রায় ও ফরিদ আহমেদ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, অবসর, ঢাকা, ১১২ পৃষ্ঠা, ১৩০ টাকা।

www.pathagar.com

ডারউইনবাদ ও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিভাবনা

দ্বিজেন শর্মা

রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রকৃতিসাহিত্যের রাজাধিরাজ। আমি সর্বদাই কবির কাছে নতশির, কৃপাপ্রার্থী, তাঁর অফুরান ভাণ্ডার থেকে দুহাত ভরে কুড়োই সম্মোহক আনন্দের খোরাক, লিখতে বসে তুলে নিই তাঁর শব্দ ও শব্দগুচ্ছ, কাছে রাখি বনবনানী, সঞ্চয়িতা, গীতবিতান। কাব্য-সাহিত্যে প্রকৃতিকে আনন্দ নিকেতন হিসেবে দেখা বহুকালের রেওয়াজ। কিন্তু প্রকৃতির ভিন্নতর একটা স্বরূপও আছে, তার প্রলয়নাচন আমাদের জীবনাভিজ্ঞতার অন্তর্গত। তা সত্ত্বেও আমরা তা দ্রুত বিস্মৃত হই, কেননা প্রকৃতিদ্বষী হওয়া মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। প্রকৃতির স্পন্দ আছে, আহৃত প্রচণতা আছে মানব সত্তার গভীরে। অথচ বেঁচে থাকার জন্য আমরা সভ্যতার আরম্ভ থেকে প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্বলিপ্ত। জীবকুলের এই সংগ্রামের ইতিহাস সুপ্রাচীন, কোটি কোটি বছরের (রবীন্দ্রনাথের বলাই গল্পে তেমন বর্ণনা আছে) আর এই ভিত্তিতেই ডারউইন উদঘাটন করেছেন জীবজগতের উৎপত্তি ও বিবর্তনের পূর্বাপর ইতিবৃত্ত।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিভাবনার পরিসর সুবিস্তৃত, ছড়িয়ে আছে কবিতা গান গল্প প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রে। সীমিত জ্ঞানে এই সমুদ্রমন্থন আমার সাধ্যাতীত, তাই আলোচনা খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এটা স্বতঃস্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির শান্ত-সুন্দর ও রুদ্র রূপ দুটিতেই আকৃষ্ট ছিলেন। 'সোনার তরী' কাব্যের বসুন্ধরা কবিতাটি প্রকৃতিপ্রেমে আপ্লুত এবং তা দিয়ে আলোচনাটি শুরু হতে পারে। বসুন্ধরা প্রসঙ্গে মোহিতচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগ, প্রকৃতির সৌন্দর্যে তাঁহার একান্ত আত্মহারা ভাব, প্রকৃতির মূলে যে বিরাট রহস্য বা মিস্টেরি তাহার নিবিড়তম অনুভূতি। প্রকৃতি তাঁহার নিকট জড় নহে, ইহা প্রাণময়ী। ইহাকে কবি কখনও জননী, কখনও-বা প্রেয়সী বলিয়া সম্মোধন করিয়াছেন। ওয়ার্ডওয়ার্থ, শেলীর মতো। মোটের উপর ইহার মধ্যে তিনি অনন্ত বিশ্বচৈতন্যের এক বিকল্প দেখিয়াছেন। মানুষের মধ্যে এই চৈতন্যের আর-এক প্রকাশ। তাই মানুষ প্রকৃতির মধ্যে আপনার দোসরকে প্রাপ্ত হইয়া এত আনন্দ লাভ করে।' এমন ভাব ও ভাবনা আছে কবির আরও অনেক কবিতা ও গানে।

www.pathagar.com

কিন্তু প্রকৃতি কি কেবলই 'মা মৃন্ময়ী', 'সহস্রের সুখ রঞ্জিত হইয়া আছে সর্বাঙ্গ তাহার'? না, তিনি প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক রূপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন *কড়ি ও কোমল* থেকেই, তাতে অন্তর্ভুক্ত *চিরদিন* কবিতায় আছে পার্থিব বৈচিত্র্যের অন্তরালে বিদ্যমান নিষ্ঠুর জড়শক্তির কথা, অপরের জন্য মমতাবোধের অভাব আর সেটা কবিকে আলোড়িত করেছে। একই বোধের স্পষ্টতর প্রকাশ দেখি *মানসী* কাব্যের সিন্দুতরঙ্গ কবিতায়। 'নাই সুর, নাই ছন্দ, অর্থহীন নিরানন্দ/ জড়ের নর্তন... পাশাপাশি একঠাঁই, দয়া আছে দয়া নাই/ বিষম সংশয়/ মহাশঙ্কা মহা-আশা, একত্র বেঁধেছে বাসা/ একসাথে রয়।' একই কাব্যের নিষ্ঠুর প্রকৃতি কবিতায় আছে অভিন্ন বোধ। প্রকৃতি এখানে নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন এক অন্ধশক্তি, সে সব কিছুর পরিচালক, তাতে কখনো উদয় হয় অকস্মাৎ সৃজনের বন্যা, তার প্রচণ্ড ভয়ানক স্রোতে বিশ্বচরাচর অসহায়ের মতো চলমান। 'সৃষ্টিস্রোতে-কোলাহলে বিলাপ শুনিবে কেবা কার'/ আপন গর্জনে বিশ্ব আপনারে করিছে বধির।' প্রকৃতির উদাসীনতা সম্পর্কের বিলাপে কোন লাভ নেই, দৈবের দরবারে তা পৌঁছায় না।

এইসব উপলব্ধি মানবজীবনের অভিজ্ঞতায় অন্তর্গত, তাতে ডারউইনের প্রভাব খোঁজা অবান্তর ও নিরর্থক। *প্রজাতির উৎপত্তি* প্রকাশিত হয়েছে ১৮৫৯ সালে, আর রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) এসব কবিতা লিখেছেন প্রথম যৌবনে। ডারউইনের বইটি দুনিয়াকাঁপান, চিন্তাজগতের প্যারাডাইম শিফট, একটি নতুন বিশ্ববীক্ষার উন্মোচক, আলোড়ন তুলেছিল, গোটা বিশ্ব যার জের আজও সম্পূর্ণ কাটেনি। ডারউইন প্রকৃতির যে পরিচয় উদঘাটন করেছিলেন তা ভয়ঙ্কর মৃত্যুকীর্ণ, আবার একইসঙ্গে সৃজনশীলও। তাঁর তত্ত্বানুসারে জীববিবর্তনের চালিকাশক্তি হলো 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'। প্রকৃতি এখানে অন্ধ ও নির্মুখ। অনেকের কাছে এই তত্ত্ব ছিল এক প্রচণ্ড আঘাত। বার্নাডশ'র মতো প্রগতিশীল চিন্তকও ডারউইনের তত্ত্বকে স্বাগত জানাতে পারেননি। তিনি লিখেছেন, 'গোটা তাৎপর্যটি অনুধাবন করলে আপনার হৃদয় বালুকাস্তূপে তলিয়ে যাবে। এতে আছে একটি ভয়ঙ্কর অদৃষ্টবাদ এবং সেই সঙ্গে সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তার, শক্তি ও উদ্দেশ্যের, মর্যাদা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার মারাত্মক বিনষ্টি।' রবীন্দ্রনাথের তেমন কোনো প্রতিক্রিয়ার কথা আমাদের জানা নেই। তিনি কি ডারউইনবাদ অগ্রাহ্য করেছিলেন? সম্ভবত না। প্রকৃতির নির্মম সৃষ্টিক্রিয়া তাঁর অনেক কবিতায় নানাভাবে ব্যক্ত আর তারই একটি জীবনসায়াহ্নে লেখা *পত্রপুট* কাব্যের পৃথিবী যাতে আছে প্রকৃতির দ্বৈতসত্তার পরিপক্কতর বর্ণন এবং আমাদের যথাকর্তব্যের ইঙ্গিত। কিন্তু তার আগে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তত্ত্বের সারসংক্ষেপ জ্ঞাপন আবশ্যক।

ডারউইন প্রজাতির উৎপত্তি গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে লিখেছেন, 'একটি আঁকাবাঁকা নদীতীর নানা জাতের অজস্র তরুলতায় ঢাকা। গাছে গাছে পাখির কলকাকলি, ঝোপঝাড়ে ওড়াউড়ি কীটপতঙ্গের, সোঁদা মাটিতে হামাগুড়ি

www.pathagar.com

দিচ্ছে কেঁচোরা। এই সুগঠিত সম্পূর্ণ জীবেরা পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং একটি জটিল প্রক্রিয়ায় আবার পরস্পরের উপর নির্ভরশীলও। তারা সকলেই আমাদের বেষ্টনকারী সক্রিয় নিয়মের আওতায় উৎপন্ন। গোটা ব্যাপারটাই ভাবনায় ডুবে যাওয়ার মতো চিত্তাকর্ষক। বৃহত্তর অর্থে দেখলে এই নিয়মগুলি হল – অত্যধিক বংশবৃদ্ধি, প্রজননে পরিস্ফুট বংশগতি, পরিবর্তনশীলতা, জীবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার। বংশবৃদ্ধির অনুপাত এতই অধিক যে জবিদের সুকঠিন জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয় এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনে ভিন্নতর প্রকারভেদগুলি এবং স্বল্পোন্নতদের বিলুপ্তি ঘটে। এভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম, খাদ্যাভাব ও মৃত্যুর আবহ থেকে উন্নত জীবেরা জন্মায় যা আমাদের পক্ষে কল্পনীয় এবং আগ্রহের বিষয়। একটি চমৎকার মতবাদ অনুসারে অভিকর্ষের চিরায়ত নিয়ম ঘূর্ণ্যমান এই গ্রহে সৃষ্টিকর্তা সর্বপ্রথম খুব সীমিত ক্ষমতাধর একটি বা কয়েকটি সত্তায় প্রাণসঞ্চার করেন। সেই সূচনা থেকেই অতীব সুদর্শন ও বিস্ময়কর অজস্র গড়নের জীব উৎপন্ন হয়েছে ও হচ্ছে। অর্থাৎ জীব অত্যধিক সংখ্যক সন্তানের জন্ম দেয়। পৃথিবীর সীমিত খাদ্যভাণ্ডার ও জীবনোপকরণ তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আহার ও সহায় যোগাতে পারে না, শুরু হয় বেঁচে থাকার জন্য তীব্র সংগ্রাম, টিকে থাকে শুধু তারই যাদের কাছে অধিক ক্ষমতা ও পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনার মতো বিশেষ যোগ্যতা। সংখ্যায় তারা অত্যল্প, অবশিষ্ট সকলের জন্য অবধারিত মৃত্যু। এটাই জীবনের সংগ্রাম ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন। এই যোগ্যতমরাও অধিক সন্তান উৎপাদন করে, পুনরাবৃত্ত হতে থাকে একই সংগ্রাম, অত্যল্পদের টিকে থাকা ও অন্যদের বিলুপ্তি। এভাবেই প্রক্রিয়াটি চলে অবিরাম, তাতে হাজার হাজার বছরে ঘটে প্রজাতির পরিবর্তন ও নতুন নতুন প্রজাতির উৎপত্তি। মানুষও এই একই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন মানুষেতর কোন প্রাণী থেকে। এই হল প্রজাতি উৎপত্তির পূর্বাপর যেখানে টিকে থাকার সংগ্রামে প্রকৃতি কাউকে নির্বাচন করে যোগ্যতার ভিত্তিতে, অন্যদের বিলুপ্তি পূর্বাপর যেখানে টিকে থাকার সংগ্রামে প্রকৃতি কাউকে নির্বাচন করে যোগ্যতার ভিত্তিতে, অন্যদের বিলুপ্তি ঘটায়। এটিই 'প্রাকৃতিক নির্বাচন', ভয়ঙ্কর ও সৃজনশীল। প্রকৃতির এই স্বরূপ প্রকৃতিপ্রেমকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

এমনি একটি কবিতা হল পৃথিবী, ১৯৩৫ সালের ১৬ অক্টোবর লেখা। কবির বয়স ৭৬, 'অবনত দিনাবসানের বেদীতলে'। প্রায় নিশ্চিতই বলা যায় ততদিনে ডারউইনের তত্ত্ব সম্যক, তাই কবিতার ছত্রে ছত্রে উচ্চাতির প্রকৃতির নির্মম নির্মুখ স্বরূপ, জীবনের জন্য সংগ্রাম, যোগ্যতমের উর্দ্বতন, ইত্যাদি ডারউইনী প্রতীতি। দৃষ্টান্ত হিসেবে : 'মহাবীর্যবতী তুমি বীরভোগ্যা,/ বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে।... মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে। ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা,/ বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র,/ তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত কর অট্টবিদ্রুপে,/ দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে মহৎ জীবনে যার অধিকার।/ শ্রেয়কে কর দুরমূল্য, কৃপা কর না

www.pathagar.com

কৃপাপাত্রকে ।/ তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছে প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম,/ ফরে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক ।/ জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন মহারঙ্গভূমি/ সেখনে মৃত্যুর মুখে বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা ।/ তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ/ ত্রুটি ঘটালে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে' ।

অতঃপর কবি পৃথিবীর আদি ভূতাত্ত্বিক যুগের ভয়ঙ্কর তোলপাড়ের ছবি এঁকেছেন। 'গদা-হাতে মুষলহাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্র পর্বত,/ অগ্নিতে বাষ্পেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশে ।/ জড়জগতের সে ছিল একাধিপতি,/ প্রাণের পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা ।' পৃথিবীর এই রুদ্ররূপ একদিন প্রশমিত হল। 'জড়ের ঔদ্ধত্য হল অভিভূত,/ জীবনদাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে ।' জন্ম হল জীবজগতের, রূপান্তর ঘটল পৃথিবীর। মধুর কলকাকলিতে মুখরিত হল প্রকৃতি। তবু লীন হল না দুর্মর হিংস্রতা। 'সে হঠাৎ আনে বিশৃঙ্খলা।... পাতাল থেকে আধপোষা নাগদানব/ ক্ষণে ক্ষণে উঠছে ফণা তুলে ।' কবি তবু বিশ্বাস হারাল না পৃথিবীর, প্রকৃতির ওপর। তাঁর শেষ নিবেদন, 'হে উদাসীন পৃথিবী/ আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে/ তোমার নির্মম পদপ্রান্তে/ আজ রেখে যাই আমার প্রণতি ।'

এটাই কবির দিগনির্দেশ। আমরা জীবজগতের শ্রেষ্ঠ জীব এই নৃকেন্দ্রিক ধারণাটি সত্য নয়, অলীক কল্পনা মাত্র। প্রকৃতির দৃষ্টিতে সকল প্রজাতির সমান গুরুত্ব। তুচ্ছ বিবেচিত ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার কবলে মানুষ অহরহ প্রাণ হারায়। ওপার ঔদাসিন্য সত্ত্বেও প্রকৃতিকে আমরনা মাতৃরূপে কল্পনা করি, তাকে ছাড়া আমরা অসহায়, নিরূপায়। কিন্তু মানুষ এই অসহায়ত্ব থেকে মুক্তি চেয়েছে। সভ্যতার উৎকর্ষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের বিজয়ের ওজনে পরিমাপ্য। আমাদের অর্জন অনেক বিসর্জনও কম নয়। কৃষিসভ্যতায় মোটাদাগে একটা ভারসাম্য থাকলেও শিল্পবিপ্লবের পর তা বদলেছে, শেষাবধি ইতির চেয়ে নেতিই যেন ভারি হয়ে উঠেছে। অতি আহরণ ও উপজাত বর্জ্যে নাভিশ্বাস অবস্থা। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি, ওজনস্তর ক্ষয়, জলবায়ু পরিবর্তনের আসন্ন দুঃসময়ে এখন 'মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্থরে'। মানুষসহ গোটা জীবজগৎ আজ চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি। ডারউইনের তত্ত্বে সমাধানের কিছু ইঙ্গিত ছিল, কিন্তু যথাসময়ে তাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বিবর্তন ক্রিয়ায় প্রতিযোগিতায় সঙ্গে সহযোগিতার গুরুত্বও স্বীকৃত। অতিপ্রজনন, খাদ্যাভাব ও প্রতিযোগিতার চরম পর্যায় যুদ্ধ – এগুলির নিয়ন্ত্রণ ও নিরসন মানুষের সাধ্যায়ত্ত থাকলেও তাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি। সভ্যতা আজ কানাগলিতে আটক। প্রকৃতির সঙ্গে সমঝোতা? কীভাবে সম্ভব? রবীন্দ্রনাথের সভ্যতার প্রতি কবিতাটি আমরা জানি। 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর/ লও যত লৌহ-লোষ্ট্র/ কাষ্ঠ ও প্রস্তর/ হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী/ হে নব সভ্যতা ।' কিন্তু নগরের সঙ্গে অরণ্য বিনিময় সভ্যতার বর্তমান সংকটেও কল্পনাতীত। র‍্যাডিক্যাল পরিবেশবাদীরা উৎপাদন ও পরিভোগের

www.pathagar.com

বিদ্যমান ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চান। যন্ত্রসভ্যতার বিশাল কাঠাম এবং অতি-জটিল ব্যবস্থাপনার রাতারাতি পরিবর্তন অসম্ভব। তদুপরি নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের ধারণাও অস্পষ্ট, ইউটোপিয়াতুল্য আর সেজন্য যেটুকু সময়ের প্রয়োজন সম্ভবত ততটুকু সময় আর আমাদের হাতে নেই। তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ কি?

রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে লিখেছেন : 'আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি- পিচনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।'

রবীন্দ্রনাথ যে মহাপ্রলয়ের কথা বলেছেন তা নিশ্চিতই মনুষ্যসৃষ্ট। মানুষের পক্ষে তার নির্মিত যন্ত্রসভ্যতা থেকে, তার মানুষ ও প্রকৃতি শোষণ থেকে, পশ্চাদপসরণ সম্ভবপর মনে হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতনের পর এই সন্দেহ দৃঢ়তর হয়েছে। অতঃপর এমন ধারণাকে অমূলক বলা যাবে না যে একদিন প্রকৃতি স্বয়ং মানব-সভ্যতাকে ধ্বংস করবে, যেমনটি একাধিকবার ঘটেছে ভূতাত্ত্বিক কালপর্বে। অবশ্য ওই মহাপ্রলয়গুলি ঘটেছিল প্রকৃতির খেয়ালে, এবার ঘটবে মনুষ্যসৃষ্ট কারণে, তার অদূরদর্শিতা ও নির্বিশেষ স্বার্থপরতার জন্য আর তখন কী ঘটবে বলা কঠিন। তবে ব্যাপক ধ্বংসে উৎপাদিকা শক্তি ও জনসংখ্যা নিম্নতম পর্যায়ে পৌছবে এবং আরেকটি নতুন সভ্যতার সূচনা ঘটবে। কিন্তু সেই সভ্যতা কেমন হবে বলা কঠিন। বিজ্ঞানীরা বলেন যে বর্তমান সভ্যতার বিবর্তনের মূলে চালিকাশক্তি হিসাবে সক্রিয় আছে জীববিবর্তনের উত্তরাধিকার হিসাবে প্রাপ্ত আমাদের কিছু জিনভিত্তিক প্রবণতা। মহাপ্রলয়ের পূর্ববর্তী পর্বে ওইসব প্রবণতার কি বিলুপ্তি ঘটবে এবং মানুষ 'বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশের তলে' প্রকৃতিবান্ধব পরিপোষক একটি নতুন সভ্যতা নির্মাণ করতে পারবে? নিশ্চিত পূর্বাভাস অসম্ভব, কেন না বিধ্বস্ত সভ্যতার প্রত্নরূপ পুনরাবৃত্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। আশার কথা, জিনভিত্তিক প্রবণতাও বদলায়, নতুন পরিবেশ হয়ত আমাদের সহায় হবে এবং ডারউইনের 'জীবনরে জন্য সংগ্রাম' উত্তীর্ণ হবে জীবনের জন্য সহযোগিতার স্তরে। মানবসমাজ প্রতিযোগীতাকীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে হবে মিথোজীবিতাবদ্ধ। এই আশাবাদটুকুই আপাতত আমাদের আশ্রয়।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান গবেষণা ও জননৈকট্য

রাঙা বউ মাছ কুটে লো
উঠানে বসিয়া
রকম-সকম মাছ কুটে
বঁটিতে ফেলিয়া।'

১

রই, মৃগেল, কাতলা ইত্যাকার মাছের সংকর প্রজননে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের সাফল্যের কথা শুনে আমার কেবলই বিন্দা, বশই, নেহারি আর রইসদের কথা মনে পড়ছে। এরা আমাদের গাঁয়ের ভূমিহীন চাষীদের ক'জন – উদোম শরীর, স্বাস্থ্যে টইটম্বুর। ওদের পরনে গামছা ছাড়া আর কিছু দেখি নি। প্রায় রোজ সকালে তারা গাঁয়ের খানাখন্দে 'পেলুন' ঠেলে মাছ ধরত। আমরা কৌতূহলে পিছু নিতাম। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই কোমরে বাঁধা খালুইটির অর্ধেক ভরে যেত কুচো-চিংড়ি, পুঁটি, ট্যাংরা, মলন্দি, খলিসা, টাকি, কখনো-বা দু' একটি সরপুঁটি, কালোবাউসের পোনা। তাদের প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর জন্য এই ছিল যথেষ্ট। আমাদের ছোট পাহাড়ি নদীতে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতেন মোবারক আলি। বড় বড় গোলসা ট্যাংরা, পুঁটি, কখনো-বা মাঝারি আকারের বাইন। আশ্বিন-কার্তিকে নদীতে ডুবনো নৌকায় ধরা পড়ত অঢেল মাছ। কেবল হাতড়ে হাতড়েও এক ঝুড়ি মাছ ধরতে দেখেছি কুটুচান্দ মিয়াকে। আমাদের দেশে গাঁয়ের গরিবরা পয়সা দিয়ে মাছ কিনত না। এ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার অবস্থা।

আজও বিন্দা, বশই, রইসরা মাছ কিনতে পারে না। তাদের কপাল থেকে এখন মাছের পাট উঠে গেছে। যে খানাখন্দে তারা মছ ধরত সেগুলো আর নেই। বর্ধমান জনসংখ্যা এবং কৃষিসম্প্রসারণের চাপে সেগুলো আবাদী ক্ষেত। গাঁয়ের নদীটিও শীর্ণা। নানা জায়গায় খাল কেটে ওর জলটুকু ভাগ-বাটোয়ারা করা হয়েছে। এতে আর মাছের নামগন্ধও নেই। জানি না, মোবারক আলি এখন কোথায় মাছ ধরেন। দূরের বিলে যাবার মতো সামর্থ্য তার নেই। আর বিলেই কি মাছ আছে? লোকে বলে, ইরি-চাষে সেখানকার মাছও নাকি উজাড়। এ নিয়ে কোন লেখা চোখে পড়ে

www.pathagar.com

নি। বিন্দা, রইসদের গায়ে এখন জামা লেগেছে, কিন্তু সেই টইটম্বুর স্বাস্থ্য নেই। সবাই হাড্ডিসার, নুড়ে-পড়া। তাদের সংসারে এখন বহু মুখ। নুন আনতে পানতা ফুরোয়। সেই ঝুড়িভরা মাছ, বর্ষার দিনে পুকুরে নতুন জল ঢুকিয়ে চাঁই পেতে অঢেল রঙিন পুঁটি আর ডিম-ভরা রূপালি মলন্দি ধরা আজ স্বপ্ন। আমাদের দেশের গরিব মানুষ এক নতুন দুর্ভিক্ষে ভুগছে। প্রোটিনের দুর্ভিক্ষ। চেহারাটি চেনা দুর্ভিক্ষের মতো প্রকট নয়, তবু এটিও দুর্ভিক্ষ এবং দীর্ঘমেয়াদি হিসেবে ভয়াবহ।

দারিদ্র্যের কূটচক্রে আমরা বন্দী। চাল জোগাড় করতে আমরা মাছ, দুধ, মাংস হারিয়েছি। শর্করা খুঁজতে প্রোটিন হারাচ্ছি। সুষম খাদ্য, 'ব্যালেন্সড্ ডায়েট' আজ স্বপ্নমাত্র। প্রোটিনের দুর্ভিক্ষ নিঃশব্দে আমাদের গ্রাস করছে। আমরা ক্ষয়রোগীর মতো বিলম্বিত মৃত্যুর কবলে কর্মশক্তিহীন দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছি। একমাত্র মাছ ছাড়া আর কোনোভাবেই আমাদের পক্ষে এ দুর্ভিক্ষমুক্তি সম্ভব নয়। তাই আমাদের মৎস্যবিজ্ঞানীদের পূর্বোক্ত গবেষণার মূল্যায়নের প্রশ্নে এটাই বার বার সামনে এসেছে। মনে পড়ছে, বিন্দা, বশই, নেহারি, রইসদের বিষণ্ন মুখ, অশক্ত দেহের কথা।

২

এসব সংকর মাছ কেবল শুদ্ধ গবেষণার বিষয়বস্তু হলে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বিজ্ঞানের এসব গবেষণার সঙ্গে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ লাভালাভের যোগাযোগ প্রত্যাশা নিরর্থক। প্রকৃতির রহস্য সন্ধানের তাগিদটি বিজ্ঞানের এক জন্মান্বিত অনুষঙ্গ এবং বিজ্ঞান থেকে অবিচ্ছেদ্য। অনুন্নত দেশে বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদ যতোই প্রকট হোক, অগ্রাধিকারের প্রশ্নটি যতোই প্রাধান্য পাক, সকল বিজ্ঞানীকে কিংবা বিজ্ঞানের সামগ্রিক প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ ফলিতমুখী করা সঙ্গত নয়। এমন দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই বিজ্ঞানের প্রেরণাবিরোধী। অনুসন্ধিৎসা ও প্রয়োজন, শুদ্ধ ও ফলিত গবেষণা বিজ্ঞানের সত্তায় আষ্টেপৃষ্ঠে বিজড়িত, এদের আলাদা করা যায় না। তবে অবস্থাবিশেষে কোন গবেষণা সম্পর্কে জনসমক্ষে বাড়াবাড়ি প্রচার থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। পুরোপুরি তত্ত্বীয় একটি বিষয়ের ওপর সম্ভাবনার অত্যাধিক রং চড়ালে এবং তা প্রচারের পরিসর পেলে অনাকাঙ্ক্ষিত বিভ্রান্তি ঘটে। এমন ঘটনার নজির মোটেই দুর্লভ নয়।

তেলাপিয়ার প্রসঙ্গটিই ধরা যাক। আমরা শুনতাম, এ বিদেশি মাছটির দ্রুত বংশবৃদ্ধির দৌলতে অচিরেই আমাদের নদী-নালা মাছে মাছে ছেয়ে যাবে। লক্ষ লক্ষ পোনাও খালেবিলে ছাড়া হয়েছিল। কিন্তু ফল কী? বাজারে তেলপিয়া কতটা পাওয়া যায়? যে দেশে শত শত মৎস্যপ্রজাতি আবহমানকাল থেকে প্রাকৃতিক প্রতিবেশে সু-অভিযোজিত, সেখানে একটি বিদেশি মাছের অনুপ্রবেশ কঠিন বৈকি। অথচ মাছটির

www.pathagar.com

অভিযোজনা সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষার আগেই নিশ্চিত সম্ভাবনার রায় ঘোষিত হয়েছিল।

উন্নয়নকামী দেশের আত্যন্তিক প্রয়োজনের তাগিদে এমনটি ঘটা অস্বাভাবিক নয়। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ক্যান্সার ইন্সটিটিউটের একটি ঘটনা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। জনৈক বিজ্ঞানী এ রোগের উপশমলগ্ন একটি ওষুধের সন্ধান পান। যথেষ্ট পরীক্ষানিরীক্ষার আগেই খবরটি সাংবাদিক মহলে রটে যায়। কাগজে হেডলাইন বেরোয়। ওষুধটি যে নিরাময়ক্ষম নয়, এতে যে শুধু যন্ত্রণা ইত্যাদির আংশিক উপশম ঘটে, এ সত্যটি জানার আগেই মঞ্চে এলেন মন্ত্রীরা। দেশের সম্মান বাড়ানোর প্রাণপণ চেষ্টা চলল। কিন্তু ফল কী? বিদেশে নিবিষ্ট পরীক্ষায় ওষুধটির কোন অনন্যতা ধরা না পড়লেও ইন্সটিটিউটের দরজায় রোগীর ভিড় কমল না। দূরদূরান্ত থেকে দুঃস্থ মানুষ এলো ভিটেমাটি, গরুমোষ বিক্রি করে। অবশ্য তাদের নিরস্ত করতে কোন বিজ্ঞানী, সাংবাদিক বা মন্ত্রী সেখানে হাজির হন নি। ইন্সটিটিউটের বন্ধ-দরজা ও দারোয়ানই যথেষ্ট ছিল। এমন নজিরের দু' একটি ঘনিষ্ঠ ঘটনা আমাদের দেশেও কি ঘটে নি? এতো ব্যাপক পরিসর না পেলেও আমরা একাধিকবার নতুন অ্যান্টিবায়োটিক ও দুরারোগ্য ব্যাধির ওষুধ আবিষ্কারের সংবাদ শুনেছি এবং যথাসময়ে ভুলে যেতেও বাধ্য হয়েছি।

যেসব সংকর মাছ উৎপন্ন হয়েছে সেগুলো জনসাধারণের জন্য কী সম্ভাবনা বহন করবে, আমি জানি না। এসব মাছ প্রজননক্ষম হলে কৃত্রিম চাষ হয়ত লাভজনক হবে। অধিকতর প্রোটিনসমৃদ্ধ, চমৎকার সুস্বাদু এ মাছ চড়াদামেও বিকোবে। কিন্তু যে-সমস্যা নিয়ে এ প্রবন্ধের সূত্রপাত, তার কোন সুরাহা হবে কি? কৃত্রিম মৎস্য-চাষের উজ্জ্বল ব্যবসায়িক সম্ভাবনায় পূর্বকথিত প্রোটিন-দুর্ভিক্ষ নিরসিত হবে না। আমাদের দরিদ্রজন কোনোদিনই মাছ কিনে প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে পারবে না। তাদের জন্য প্রাকৃতিক প্রতিবেশে মাছের ব্যবস্থা করতে হবে। খালবিল, নদীনালার দেশি মাছের পুনর্বাসন ব্যতীত কোন বিকল্প আমাদের নেই।

৩

পাশ্চাত্য দেশগুলোর শিল্পোন্নতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় খালবিল নদীনালা আজ দূষিত এবং ফলত নর্দমাপ্রায় এসব জলাধার থেকে মাছেরাও নির্বংশ। এতে অবশ্য সেখানে প্রোটিন-সংকট দেখা দেয় নি। তারা মাছের সন্ধানে সমুদ্রমন্থন করছে, নতুন নতুন কৃৎকৌশলের দৌলতে সেখান থেকেও মাছের বংশ উজাড় করে ফেলছে, দেশে কৃত্রিমভাবে আলোনা জলের মাছের চাষ করছে। তাদের পক্ষে সবই সম্ভব। শিল্পোন্নতির কৃৎকৌশলের প্রসাদ এবং আর্থিক সচ্ছলতা তাদের সহায়। আর মাছ তো তাদের প্রধান প্রোটিন-উৎসও নয়। সেসব দেশে মাংস, ডিম, দুধ অঢেল।

www.pathagar.com

মস্কো থেকে ম্যান্‌চেস্টার অবধি পথের ধারে যেসব বাথান, বনানী আর ঘাসক্ষেত দেখেছি, আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে অবিশ্বাস্য মনে হয়। আমাদের সবটুকু জমিই এখন আবাদ, ধানক্ষেত। গোচরভূমি, জলাজঙ্গল উধাও। মাছের সঙ্গে দুধ, মাংস, ডিমও আমাদের ত্যাগ করেছে।

আমাদের পক্ষে সহজবোধ্য কারণেই সমুদ্রমন্থন তত সহজ নয়। কৃত্রিম মৎস্যচাষেও গরিবদের মাছ যোগান যাবে না। ব্যাপক পশুখামার গড়ে তোলার জন্য ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে দুধ ও মাংসের ব্যবস্থা স্পষ্টতই কঠিনতর। সুতরাং প্রাকৃতিক জলাধারে মাছের চাষবৃদ্ধিই এ ধারার প্রধান গবেষণা হওয়া উচিত। আমাদের মাছের ঘাটতির সর্বজ্ঞাত কারণগুলো ছাড়া অন্যান্য সম্ভাব্য কারণগুলো সন্ধানও জরুরি। খালবিল ইরি-চাষ, রাসায়নিক সারপ্রয়োগ, ধানের খড়পচা, শিল্পবর্জ্যে জলদূষণ ও কীটঘ্ন সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হওয়া আবশ্যক। শুনেছি, কোন কোন জলজ প্রাণী অল্প জলদূষণ পছন্দ করে, এতে তাদের বংশবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। আমাদের জিওল মাছ কি দূষণপ্রিয়? অবশ্য দূষণের রাসায়নিক প্রকৃতিই এক্ষেত্রে প্রধান নির্ধারক। শিল্প ও কৃষির কারণে আমাদের দেশে জল যে-পরিমাণ দূষিত হয়েছে, সেই সঙ্গে দেশি মাছের কোন কোন প্রজাতিকে অভ্যস্তকরণের মাধ্যমে তাদের জন্য প্রতিযোগিতার অনুকূল সম্ভাবনা সৃষ্টি ও ত্বরিত বংশবৃদ্ধি ঘটান কি সম্ভব? দূষণসহিষ্ণু মাছ-উৎপাদনের কোন গবেষণা প্রকল্প আমাদের মৎস্যবিভাগের আছে কি?

৪

আমাদের দেশে গবেষণার প্রধান দুর্বলতাটি সকলেরই জানা। আমাদের প্রকৃতি জলবায়ু মাটি উদ্ভিদ প্রাণী সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট অবহিত নই। আমাদের নিজস্ব সমস্যার চেহারা এজন্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, সমাধানও অন্তরালবর্তী থাকে। এ দায়িত্বটি ছিল সঙ্গত কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর। তারা তা যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে পালন করে নি। যে গবেষণামুখিনতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব, আমাদের দেশে তা আজও বিকশিত নয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক বিজ্ঞানীর গবেষণাগার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রধান গবেষক ও তার দু'জন সহকারীর অধীনে সেখানে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য কাজ করছে। এদের অনেকে আবার 'পার্টটাইম' গবেষক। চাকরিতে থাকা অবস্থায় ছুটির দিনে এবং অবসর সময়ে কাজ করে। বছরে কেবল এই একটি বিভাগ থেকেই ৫-৬ জন ডক্টরেট পায়। স্বাভাবিকভাবেই এসব গবেষণায় দেশীয় উপকরণ এবং দেশীয় সমস্যার অগ্রাধিকার থাকে। এভাবেই দেশের মৌলিক গবেষণার ভিত তৈরি হয়, পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা সম্পর্কে, নিজ সমস্যার পরিসর

www.pathagar.com

সম্পর্কে সত্যজ্ঞান ও যথার্থ উপলব্ধি জন্মে। জানি না, কেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটল না।

এ দৈন্যের জন্যই আমাদের বহু গবেষণা মূল্যহীন এবং উন্নত দেশের অনুকৃতিমাত্র। এ ব্যয়বহুল ও বিপজ্জনক ঝুঁকি এড়ান আমাদের পক্ষে কঠিন। যে বিদ্যা বিদেশ থেকে আমদানিকৃত অথচ দেশে অভিযোজিত নয়, অব্যবহারে মলিনত্বই তার ভবিতব্য। আমাদের গবেষক মহলে তাই সোনার হরিণ সন্ধান কিংবা হতাশার প্রকটতাই চোখে পড়ে। অথচ বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা বিদেশে সুনাম কুড়ান। তাদের অনেকেই গবেষণায় কৃতিত্ব দেখান, সমাদৃত হন।

কিছুকাল আগে (১৯৭৭) প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত আমার জনৈক প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সে মৃৎবিজ্ঞানী। তার গবেষণাগারেও গিয়েছি। একটি ছোট ঘর, তিনজন ছাত্রছাত্রী কাজ করে। তেমন কিছু জটিল যন্ত্রপাতি চোখে পড়ল না। ছাত্রটি কাছের পাহাড়ে কয়েক ফুট চওড়া এক টুকরো জমির মাটি নিয়ে কাজ করছে। এটিই তার থিসিসের বিষয়বস্তু। তার নিজের অভিমত এই যে, কাজটি খুব কঠিন নয় এবং আমাদের দেশেও এ ধারার কাজ সম্ভব। প্রসঙ্গত আরেক জনের কথাও উল্লেখ্য। সেই বছরই তার সঙ্গে আলাপ। তিনি ম্যান্‌চেস্টারের স্যাল্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক। বাংলাদেশের এ কলেজ-শিক্ষক স্থানীয় একটি নদীর জলদূষণ সম্পর্কে গবেষণা করছেন। দেশে জীববিদ্যা পড়াতেন, পাঠ্যবই লিখতেন। এখন নদীতে মোটরবোট চালান, নমুনা সংগ্রহ ও কীটপতঙ্গ শনাক্ত করেন এবং জল ও মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ, প্রাপ্ত তথ্যাদির পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করেন। তিনি বৃত্তিধারী নন। ভরণ-পোষণের জন্য আনুষঙ্গিক একটি স্কিমে তাকে কিছুক্ষণ চাকরিও করতে হয়। এসব দায়িত্ব পালন করেও তিনি চমৎকার কাজ করছেন। তারও ধারণা, এ কাজ আমাদের দেশেও সম্ভব এবং তা মোটেই ব্যয়বহুল বা সাধ্যাতীত কিছু নয়। তবু এ দু'জনকেই ডিগ্রির জন্য দেশত্যাগ করতে হয়েছে। এ গবেষণার কৃৎকৌশলটুকু ছাড়া দেশে তারা আর কীই-বা ব্যবহার করতে পারবেন? অথচ এমন কাজ দেশে হলে পুরো ফলটিই আমরা পেতাম। কিন্তু তা হবার নয়।

(৫)

জাতি হিসেবে আমরা যতটা স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী আমাদের সমস্যাবলির স্বাতন্ত্র্যও ততটাই বাস্তব। আমরা যেমন আমাদের জাতীয় চেতনার ধারক ও বাহক এবং অন্যেরা এ থেকে পরকীকৃত, তেমনি আমাদের সমস্যাও কেবল আমাদের, একান্ত আমাদেরই। তাই বিদেশ থেকে আহৃত জ্ঞান আমাদের সমস্যা সমাধানের সহায়ক হলেও মূল অবলম্বন হতে পারে না। আমরাই কেবল আমাদের সমস্যা সমাধান

www.pathagar.com

করতে পারি, অন্যে নয়। কিন্তু সেজন্যে বিশেষ সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস, শ্রম ও নিষ্ঠা, আপন জনগণের প্রতি ভালোবাসা তথা জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন।

আমরা সর্বাধিক জনসংখ্যা-পীড়িত অঞ্চলের অধিবাসী। সাম্রাজ্যবাদী শোষণে আমরা আজ নিঃস্বপ্রায় এবং তাতে আমাদের বিপুল জনশক্তিরও অবদান আছে। আফ্রিকার সম্পদ আজও বহুলাংশে অটুট। সেখানকার স্বল্প জনসংখ্যার জন্য বিদেশিদের পক্ষে এসব সম্পদের যদৃচ্ছা লুণ্ঠন সম্ভব হয় নি। এ দেশে তাদের এমন অসুবিধা ঘটে নি। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রয়োজনের অনুপাত এক বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। পৃথিবী অন্যত্র এমন অবস্থার নজির কমই আছে।

এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই আমাদের বিজ্ঞান গবেষণার বিষয় ও অগ্রাধিকারের রূপরেখা নির্ধারিত হওয়া উচিত। সামাজিক চেতনা উন্নতিকামী দেশের বিজ্ঞানীর একটি বড় অবলম্বন। যে-পুষ্টিবিজ্ঞানী অপুষ্টির সমাজতত্ত্ব জানেন না আমাদের দেশে তার পক্ষে ফলপ্রসূ গবেষণায় সাফল্য সুকঠিন। জনঘনিষ্ঠ বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এ অভিধা প্রযোজ্য। প্রসঙ্গত আমার জনৈক শিক্ষকের কথা মনে পড়ছে। তিনি পাট-পচানোর ব্যাক্টেরিয়া নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তাঁর আশা ছিল, এমন এক ধরনের ব্যাক্টেরিয়া খুঁজে পাবেন যেগুলোর সাহায্যে বর্তমানের অর্ধেক সময়ে পাটপচানো সম্ভব হবে। এতে পাটের কতো আঁশ বাঁচবে এবং কতো সময়ের সাশ্রয় হবে এসব অঙ্কের মাথা-ঘোরানো হিসেব ল্যাবটেরিতে টানানো থাকত। কিন্তু যারাই আমাদের পাটচাষীদের অবস্থা, তাদের শিক্ষাদীক্ষা ও পরিবেশ জানেন, তাদের কাছে প্রকল্পটির অর্থহীনতা সহজেই ধরা পড়বে। বিশাল দেশের বিপুল জনসংখ্যার জন্য নদীনালায় পাট পচানোর যে নির্ব্যয় ব্যবস্থা এদেশে আবহমানকাল ধরে চালু রয়েছে সেখানে উপর্যুক্ত গবেষণা সাফল্যের সদ্ব্যবহারের অবকাশ কতটা?

বিজ্ঞানের অনুপ্রেরণা হিসেবে গবেষণায় সাফল্যের চেতনাই যথেষ্ট নয়। এজন্য মানুষের প্রতি, বিশেষত বাস্তবাবস্থা এবং দরিদ্রজনের প্রতি ভালোবাসাও আবশ্যক। বিন্দা, বশই, নেহারি, রইসরা সর্বহারা মানুষের প্রতিনিধি। গবেষণাগারে বসে আমরা যেন তাদের ভুলে না যাই।

১৯৭৭

www.pathagar.com

বোটানিক্‌সের পুরান প্যাঁচালি

পরিবেশবান্ধব শব্দটি ইদানিংকালের। পঞ্চাশ দশকের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা পড়ার সময় পরিবেশবিদ্যা নামক শাস্ত্রের কথা শুনিনি। আমরা ইকোলজি পড়েছি, কিন্তু ইকোলজিক্যাল ক্রাইসিস নিয়ে কোথাও কোন গভীর উদ্বেগ ছিল না। তবে বোটানিক গার্ডেনের গুরুত্ব ভালই জানতাম এবং সহজবোধ্য কারণেই, কেননা উদ্ভিদবিদ্যার বিকাশের সঙ্গে উদ্ভিদউদ্যানের ছিল ঐতিহ্যিক সম্পর্ক, উভয়ই বিকশিত হয়েছে পারস্পরিক সহযোগ ও মিথষ্ক্রিয়ার সুবাদে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের একটি বোটানিক গার্ডেন ছিল, অবশ্যই খুব ছোট, তবু বড়ই মুগ্ধকর আর তাকে ঘিরেই স্বপ্ন দেখেছি একটি পূর্ণাঙ্গ বোটানিক গার্ডেনের। আমি কলকাতা সিটি কলেজের স্নাতক। হুগলি নদী তীরের ভারতের সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রাচীন শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে গিয়েছি বহুবার। জানতাম এমন গার্ডেন কতোটা বড় হয়, তাতে কী কী থাকে, কী কাজকর্ম চলে সেখানে। বইতে পড়েছি ভ্রমণ ও পিকনিকজাতীয় বিনোদন থাকলেও এসব উদ্যান হল আসলে উদ্ভিদ-বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। সেখানে থাকে বড় বড় গ্রিন-হাউস, হার্বেরিয়াম, মিউজিয়াম, গ্রন্থাগার ও ল্যাবরেটরি, এমনকি জিন-ব্যাঙ্ক, কাজ করেন বিশেষজ্ঞরা। ভেবেছি ঢাকায় একদিন বোটানিক গার্ডেন হবে, আমরা যে সুযোগ পাইনি, আমাদের পরবর্তীরা তা পাবে, উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষায় কালক্রমে একটি নতুন যাত্রা যোগ হবে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি ঢাকার মিরপুরে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান নির্মাণ শুরু হয় বলধা বাগানকে কেন্দ্র করে। মনে আছে, মগবাজারে ছিল অস্থায়ী কার্যালয় এবং জ্যেষ্ঠ সহপাঠী সোমেশ্বর দাস ছিলেন প্রধান কর্মকর্তা। বলধা বাগানের গ্রন্থাগারও ওখানেই স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং আমি বইপড়ার জন্য নিয়মিত হাজিরা দিতাম। শ্রীযুক্ত দাস আমাকে তখন বাগানের নীলনকশাটি দেখান, জাপান থেকে তৈরি। বড়ই আশান্বিত হয়েছিলাম স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনা দেখে। প্রায় সমকালেই জাতীয় হার্বেরিয়াম গঠনের উদ্যোগও শুরু হয়েছিল। বৈঠক বসেছিল করাচিতে। কিন্তু সমস্যা বাধালেন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধি অধ্যাপক সালার খান এবং ড. এসডি চৌধুরি। তাঁদের দাবি কেন্দ্রীয় হার্বেরিয়াম হবে ঢাকায়, কেননা এখানে

www.pathagar.com

উদ্ভিদপ্রজাতির আধিক্য। বিষয়টি দ্রুত ধামাচাপা পড়ল, সেই ধামা আর উঠল না। তবে বোটানিক গার্ডেনের কাজ চলে নীরবে, বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু বনবিভাগ কেন? যথানিয়মে দেশের 'বোটানিক্যাল সার্ভে' নামের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তার মাধ্যমে নয় কেন? উত্তরটি শুধু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষই জানেন। তারা হয়ত ভেবে থাকবেন বনবিভাগ যেহেতু গাছপালা পালে আর বোটানিক গার্ডেন হল গাছপালার সংগ্রহ, তাই বনপালরাই কাজটি করবেন ভালভাবে। স্বাধীন বাংলাদেশেও সেই ভ্রান্তি দূর হল না। বনবিভাগই শেষ পর্যন্ত বোটানিক গার্ডেন বানাল, যার সঠিক নামকরণ এখন হওয়া উচিত বনোদ্যান। অধ্যাপক সালার খান নিরূপায় হয়ে কিছু অনুগামী নিয়ে 'বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সার্ভে' নামের একটি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন, সাহায্যের হাত বাড়ালেন এসডি চৌধুরি ও কিছু কৃষিবিদ। শুরু হল দেশে উদ্ভিদকুলের জরিপ ও সংগ্রহ, গড়ে উঠল একটি হার্বেরিয়াম ভাড়া-বাড়িতে। এই চলছিল প্রায় তিন দশক। এমন প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক, কিন্তু সমস্যার কোন সুরাহা হচ্ছিল না। শেষে আনুকূল্য দিলো ব্রিটিশ কাউন্সিল, এগিয়ে এল ব্রিটিশ সরকার, কিউ উদ্যানের ব্যবস্থাপনায় তৈরি হলো 'বাংলাদেশ জাতীয় হার্বেরিয়াম' বোটানিক গার্ডেনের এক কোণায়। উঁচু দেয়াল উঠল দুটি প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে। অথচ হার্বেরিয়াম থাকার কথা ছিল বোটানিক গার্ডেনে, তারই অপরিহার্য উপাঙ্গ হিসেবে। আমাদের দেশে ঘটল দুঃখজনক এক বিরল ব্যতিক্রম – বোটানিক গার্ডেনের অদূরদর্শী অঙ্গচ্ছেদ। আশির দশকে আমাদের জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের 'বেহাল' অবস্থা দেখে আমারই কোন ভুল হচ্ছে কিনা সেটা যাচাইয়ের জন্য কিউ উদ্যানের অধ্যক্ষের কাছে চিঠি লিখে জানতে চাই – বোটানিক গার্ডেন বস্তুটি কি? তিনি উত্তরে জানান যে বোটানিক গার্ডেন হতে পারে নানা ধরনের – শিক্ষামূলক, সংরক্ষণমূলক, অর্থকর উদ্ভিদ চাষমূলক, ফল-মূল উন্নয়নমূলক, কিংবা এগুলোর সংশ্লেষ। সেইসঙ্গে পাঠান কিউতে অনুষ্ঠিত বোটানিক গার্ডেনবিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের অনেকগুলো প্রতিবেদনের ফটোকপি। পড়তে বলেন কুয়ালালামপুর থেকে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত *The Role and Goles of Tropical Botanic Gardend* বইটি। অনেক কষ্টে সেটি সংগ্রহ করি এবং ' দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকীর দুটি সংখ্যায় পুরো পৃষ্ঠাজুড়ে এসব প্রবন্ধের অনুবাদ ও দেশের উদ্ভিদবিদদের কিছু মৌলিক লেখা প্রকাশ করি। ভেবেছিলাম সরকারের নজর পড়বে, কিছু একটা ব্যবস্থা হবে, হয়ত তারা বোটানিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশের আওতায় হার্বেরিয়াম ও বোটানিক গার্ডেনকে একত্র করে উদ্যানটিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলবেন, নেতৃত্ব বর্তাবে বনকর্তাদের পরিবর্তে উদ্ভিদবিদ ও উদ্যানবিদদের ওপর। কিন্তু বৃথা। শেখ হাসিনা সরকার হার্বেরিয়ামটিকে

www.pathagar.com

জাতীয়করণ করেন, কর্মীরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত হন। আমরা অনেকেই সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হই, হাততালি দিই। এইটুকুই। স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়।

আমি ১৯৭৭ সালে প্রথম কিউ উদ্যান দেখি। তারপর অনেকবার। প্রত্যেকবারই তীর্থদর্শনের পুণ্য নিয়ে ফিরেছি। কী বিশাল নির্মাণ, কী অনুপম সৌন্দর্য, কী বিস্ময়কর সমৃদ্ধি। প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত এমন কয়েকটি প্রজাতিও আছে সেখানে। কিউ বিশ্বের উদ্ভিদবিদ্যা চর্চারও সহায়তা যোগানোর অন্যতম কেন্দ্রভূমি। ইতিমধ্যে উদ্যানটি বিশ্ব-ঐতিহ্যের স্বীকৃতিও পেয়েছে। কিউ এখন পৃথিবীর বিপন্ন উদ্ভিদপ্রজাতি রক্ষার কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। আমাদের জাতীয় উদ্ভিদউদ্যানে গিয়ে ফিরি কেবল হতাশা নিয়ে। এটিকে রমনা পার্কের একটি বৃহৎ সংরক্ষণ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। স্রেফ বিনোদন ছাড়া আর কিই-বা আছে ওখানে। আজকাল বৃহৎ বোটানিক উদ্যানের বদলে আঞ্চলিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যান নির্মাণের রেওয়াজ চালু হয়েছে, যাতে স্থানীয় উদ্ভিদকুলের ওপর নজরদারি, আশপাশের লোকদের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধকরণ, স্কুল-কলেজে আনুষঙ্গিক জ্ঞানবিতরণ সহজতর হয়। কিন্তু এসব উদ্যান তৈরির কিছুই করা হয়নি।

আমরা বনবিভাগের আওতায় অভয়ারণ্য ইকোপার্ক বানাচ্ছি, কিন্তু সেগুলোর সুপরিচালনা কি বনবিভাগের পক্ষে সম্ভব? এই বিভাগের নানা সীমাবদ্ধতার কথা বাদ দিলেও কাজটি তাদের কর্মনীতিরও বিরোধী। একই প্রতিষ্ঠান কি সংহার ও সংরক্ষণের মতো পরস্পরবিরোধী দ্বৈত-কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে? এগুলোর দায়িত্ব দেয়া উচিত ছিল প্রকৃতিরক্ষক কোন সংস্থার ওপর। এমন আশঙ্কা অমূলক নয় যে, বনবিভাগের হাতে বনের যে হাল হয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে অভয়ারণ্য আর ইকোপার্কগুলোর ভাগ্যেও।

বাংলাদেশের মুগ্ধকর নিসর্গের মতো তার গ্রামীণ জনগণও সুঠাম সৌন্দর্যশীল, শিল্পী সুলতানের কিষাণ-কিষাণীর মতো। তারা শ্রমিষ্ঠ, সহিষ্ণু, সৃজনশীল এবং সেইসঙ্গে প্রকৃতি-চেনতারও অধিকারী। এই বিত্তহীন নগ্নপদ মানুষ নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন করেন, নিজের সামান্য অর্জন দিয়ে জনহিত ব্রতে হাজার হাজার গাছপালা লাগান নিজ গৃহের চত্বরে, পাখির অভয়াবাস গড়ে রাত জেগে সেগুলো পাহারা দেন; কিন্তু আমাদের অর্থনীতি, পরিকল্পনা ও উন্নয়নের কর্ণধাররা কি ওদের বোধ, বুদ্ধি ও সহযোগকে কোনো গুরুত্ব দেন? দেন না। দিলে আমাদের দেশের অবস্থা অন্যরকম হতো আর বোটানিক গার্ডেন নিয়েও আমাকে এই প্যাঁচাল পাড়তে হতো না।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাতীত ব্যাখ্যার নির্বন্ধ

ফোনে যোগাযোগ করেই এসেছিলেন। অবসরভোগী সরকারি কর্মকর্তা। সঙ্গে এনেছেন সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে বিদেশি পত্রপত্রিকার কিছু কাটিং। সন্দেহ নেই প্রাজ্ঞ, সজ্জন। কিন্তু প্রসঙ্গটি আমার জন্য বিব্রতকর। তিনি ডারউইনবাদবিরোধী। যারা সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী তাদের সঙ্গে বিতর্কের অবকাশ থাকে না। আমরা ভালোই জানি টামাস হাক্সলির সঙ্গে বিতর্কে বিশপ ইউলবারফোর্স হেরে গেলেও (১৮৬০) সৃষ্টিবাদীরা হার মানেননি আজও, মানবেননা কোনোদিন। ডারউইনের বিবর্তনবাদের কোন ত্রুটি আবিষ্কৃত হলে তারা দারুণ উল্লাসিত হন এবং ডারউইনের গোটা মদবাদই ভ্রান্ত সে-কথা সোল্লাসে তারস্বরে প্রচার করতে থাকেন। আমার অতিথি অবশ্য এই দলের নন। তিনি সম্ভবত লামার্কবাদীদের কোন ধারার প্রতিনিধি। কিঞ্চিৎ আলাপের পর তাঁকে বোঝানো আমার সাধ্যাতীত বুঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনতত্ত্বের জনৈক চৌকশ অধ্যাপকের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে শেষপর্যন্ত রেহাই মিলেছিল।

একথা লোকদের বোঝান বেশ শক্ত যে ডারউইন বিবর্তনত্ত্বের আবিষ্কারক নন। সরল প্রাণী থেকে জটিল কাঠামোর প্রাণীর উৎপত্তির ধারণাটি যথেষ্ট প্রাচীন। কেউ কেউ বলেন যে, বৈদিক ভারতীয়রাও তত্ত্বটি ওয়াকিবহাল ছিলেন, নইলে মৎস্য, কূর্ম ও বরাহ অবতারদের ক্রমাবির্ভাব ঘটে কিভাবে? ডারউইন ব্যাপারটি ভালোই জানতেন, তাই *Origin of Species* গ্রন্থের শুরুতেই এজন্য একটি পুরো অধ্যায় খরচ করেছেন। চার্লস ডারউইনের পিতামহ এরেসমাস ডারউইন (১৭৩১-১৮০২) কবি, দার্শনিক ও বিবর্তনবাদী পণ্ডিত ছিলেন। ডারউইন কৈশোরে দাদুর বই *Zoonomia* পড়েছিলেন, বিবর্তন সম্পর্কিত তাঁর ধ্যানধারণা জেনেছিলেন, কিন্তু নিজের ভাষায় 'বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত' হননি। এরেসমাসের *Organic Life* কবিতাটি বিবর্তন বিষয়ক। তিনি লিখেছিলেন, অরণ্যের অধীশ্বর বিশাল এক গাছ, সমুদ্রের দানব তিমি, আকাশজয়ী ঈগল, পশুরাজ সিংহ আর ঈশ্বরের আদলে সৃষ্ট মানুষ সকলেই *'Arose from rudiments of form and sense/An embryon point, or microscopic ens.'* ডারউইন *Origin* গ্রন্থের *An Historical Sketch* অধ্যায়ে ফরাসি প্রত্নজীববিদ জর্জ বুফোঁ (১৭০৭-১৭৮৮)

www.pathagar.com

সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি প্রজাতির উৎপত্তি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু কোন সুসংবদ্ধ তত্ত্ব প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা সম্পর্কে নিশ্চুপ থেকেছেন।

আফ্রিকায় কর্মরত চিকিৎসক ড. উয়েল্‌স্‌কে ডারউইন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আফ্রিকার কিছু রোগের বিরুদ্ধে স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গদের অনাক্রম্যতা ও নবাগত শ্বেতাঙ্গদের প্রবণতা সম্পর্কে উয়েলসের পর্যবেক্ষণে (১৮১৮) ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচনের বাস্তবতা লক্ষ্য করেন। কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে ফসলের উন্নতি বিধানের বিষয়টিও এই চিকিৎসকের নজর এড়ায় নি। পৃথিবীর বিভিন্ন আবহাওয়া অঞ্চলে নির্দিষ্ট বর্ণের মানুষের স্বাভাবিক সংখ্যাধিক্যের মূলে বিদ্যমান পরিবেশের প্রভাব ডা. উয়েল্‌স্‌ ঠিকই লক্ষ্য করেছিলেন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব্যাপারটি সঠিকভাবেই শনাক্ত করেছিলেন। তবে তিনি মানুষের জাতিগঠনের বাইরে জীবজগতের ব্যাপক পরিসরে তা প্রয়োগের চেষ্টা করেন নি। ১৮২৬ সালে প্রফেসর গ্রাণ্ট এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে প্রজাতি থেকেই প্রজাতির উৎপত্তি এবং ক্রমপরিবর্তনের মধ্যেই তাদের বিকাশ ও বিবর্তন। ১৮৪৪ সালে *Vestiges of Creation* বইটি বিজ্ঞানীমহলে আলোড়ন তুলেছিল এবং তাতে বিবর্তনে ঈশ্বরের ভূমিকা স্বীকৃত হলেও প্রজাতির উৎপত্তি সম্পর্কে বহু বৈজ্ঞানিক যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছিল। ডারউইন আরও নানা তথ্য এই অধ্যায়ে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রধান আলোচ্য ছিল লামার্কবাদ, কেন-না এই তত্ত্বের ভ্রান্তি উদ্ঘাটন করতে না পারলে তাঁর নিজস্ব বিবর্তনব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্যতা হারাত। আসলে লামার্কবাদই প্রাক-ডারউইনী বিবর্তন প্রক্রিয়ার একমাত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, ডারউইনবাদের প্রধান প্রতিপক্ষ এবং আজও সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত নয়। তাই ডারউইনের বিবর্তনচিন্তাকে যারা ভ্রান্তিদুষ্ট মনে করেন তাদের পক্ষে লামার্কবাদের আশ্রয় ছাড়া অন্যতর গন্তব্য থাকে না। ডারউইনবাদবিরোধীদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা তারা বিবর্তনের অন্যতর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারেন না, তত্ত্বটি ভুল শুধু এইটুকুই বলেন। বিরোধিতার এক মেরুতে আছে সৃষ্টিতত্ত্ব, অন্য মেরুতে লামার্কবাদ এবং দুটিই সজীব ও পরিব্যাপ্ত। উন্নয়নশীল দেশের পশ্চাদপদ গণচেতনা প্রথমটির উর্বর ক্ষেত্র হলেও উন্নত দেশগুলোতে, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই চিন্তাধারা আজও মৃতপ্রায় আগ্নেয়গিরির মতোই মাঝেমেধ্য অজ্ঞতার লাভারাশি উদগীরণ করে কূপমণ্ডুকতার ধোঁয়াশা ছাড়ায়, অথচ ওই দেশেই ডারউইনবাদ বিষয়ক বইপত্র লেখা হয়েছে সবচেয়ে বেশি এবং সেগুলোর জনপ্রিয়তাও অত্যাধিক। *Origin* (১৮৫৯) প্রকাশের শতাধিক বর্ষ অতিক্রান্ত, তবু মার্কিন রাজনীতিতে বিবর্তনবাদবিরোধিতা আজও একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে আছে। স্কুলপাঠ্য বই থেকেই এই তত্ত্বটি তুলে দেওয়ার জন্য সেদেশে মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে, নাটকও লেখা হয়েছে।

www.pathagar.com

জানি না সেই প্রভাবেই কিনা, আমাদের উচ্চমাধ্যমিকের জীবিদ্যার পাঠ্যসূচি থেকে বিশেষজ্ঞরা ইদানিং ডারউইনবাদ বর্জন করেছেন। হাস্যকর হলেও সত্যি, আমাদের ছেলেমেয়েরা ১১-১২ শ্রেণিতে আজ বির্বতনবাদের বিকল্প হিসাবে যে-জীবপ্রযুক্তি পড়ছে সেটা আসলে ডারউইনবাদেরই আধুনিক ভাষ্যনির্ভর একটি প্রযুক্তি এবং সেই অর্থে ওই মতবাদেরই সম্প্রসারণ তথা সমার্থক। লামার্কবাদের অধুনাতম বিস্ফোরণের দৃষ্টান্ত সাবেক সোবিয়েত ইউনিয়নে জীববিদ্যাচর্চা। মার্কস নিজ বিশ্ববীক্ষা নির্মাণে জীবজগতের বিবর্তনের একটি বিজ্ঞানসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বের অপেক্ষায় ছিলেন এবং সেটা ডারউইনবাদেই খুঁজে পান, তাই *Origin* প্রকাশের পর ডারউইনকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি *Capital* গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণটি ডারউইনকে উৎসর্গ করতেও চেয়েছিলেন, কিন্তু ডারউইন সম্মতি দেন নি সম্ভবত এজন্য যে, তিনি তাঁর তত্ত্ব নিয়ে যে ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিলেন তাতে আরেকটি নতুন মাত্রা যোগ হোক তা আর চান নি। ডারউইন ছিলেন নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ, মধ্য-যৌবন থেকেই তৎকালে অজ্ঞাত এক ক্রনিক রোগে আক্রান্ত, সর্বদা ঝুটঝামেলা এড়িয়ে থাকতেন, যেজন্য হাক্সলি ও উইলবারফোর্সের সেই ঐতিহাসিক বিতর্কে পর্যন্ত যোগ দেন নি। তিনি অচেনা অভ্যাগতের সঙ্গেও দেখা করতে চাইতেন না (রুশ উদ্ভিদ-শারীরবিদ তিমিরিয়াজভ তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে বহু কষ্টে ডাউনগ্রামে পৌঁছে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছিলেন, শেষে দেখা হয়েছিল আকস্মিকভাবে)।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় ডারউইনবাদ সম্পর্কে বলশেভিকদের আগ্রহ খুবই স্বাভাবিক এবং তারা এই তত্ত্বচর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটান। সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম ডারউইন মিউজিয়াম নির্মিত হয়েছিল রাশিয়ায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেখানে লামার্কবাদ ডারউইনবাদকে হটিয়ে দিয়েছিল এবং উদ্যোক্তরা এই দুই মতবাদের মৌলিক বিরোধ এড়িয়ে লামার্কবাদের নামকরণ করেছিলেন 'ফলিত বা সৃজনশীল ডারউইনবাদ।' ডারউইনী বিবর্তনবাদের মূল চালিকাশক্তি হিসাবে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' অত্যন্ত মন্থর একটি প্রক্রিয়া বিধায় তাতে ইচ্ছামতো ও দ্রুত জীবের পরিবর্তন ঘটানোর অবকাশ ছিল না যেজন্য রুশ-কৃষিবিদ ত্রফিম লিসেঙ্কো লামার্কবাদের 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসৃতি' তত্ত্বে সহজেই আকৃষ্ট হন এবং জীববিদ্যাচর্চায় রীতিমতো তুলকালাম কাণ্ড ঘটান। লিসেঙ্কো স্বদেশে এই ধারার একজন পূর্বসূরি খুঁজে পান, তিনি ইভান মিচুরিন, বেঁচেছিলেন অক্টোবর বিপ্লবের পরও অনেক বছর, যাঁর ফল ও ফসল উন্নয়নের কিছু সাফল্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল আর লিসেঙ্কো এই সাফল্যের লামার্কীয় ব্যাখ্যা দিয়ে বলশেভিক নেতাদের সহজেই প্রভাবিত করতে সমর্থ হন, নিজেও কৃষিক্ষেত্রে কিছু চমকপ্রদ কাজ করেন এবং এই সুবাদে রুশ-জীববিদ্যায় একটি অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে বিশ্ববন্দিত বংশাণুবিদ

www.pathagar.com

ভ্যাবিলভসহ গোটা একদল বিজ্ঞানীকে কুপোকাৎ করে ক্ষমতাসীন হন। আমরা জানি, শেষপর্যন্ত কৃষিবিদ্যাসহ গোটা রুশ জীববিদ্যা তাতে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যে ক্ষতি আজও পূরণ হয় নি (বিস্তারিত তথ্যাদির জন্য ম. আখতারুজ্জামান লিখিত ও বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'বিবর্তনবিদ্যা' দ্রষ্টব্য)।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের লামার্কবাদী অধ্যাপক পল ক্যামেরার 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসৃতি'র সত্যতা প্রমাণের জন্য ব্যাঙ নিয়ে কিছু পরীক্ষা চালান এবং 'ইতিবাচক' ফল পান। কিন্তু শেষে তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় এবং তিনি আত্মহত্যা করেন (১৯২৬)। আর্থার কোয়েসলার এই ঘটনার ভিত্তিতে *Case of the Midwife Toad'* উপন্যাসটি রচনা করেন এবং *The Salamander* নামের একটি চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়। রিচার্ড ডকিন্‌স্ (*The Selfish Gene* বইয়ের লেখক) লিখেছেন, '*I do remember to my shame, that my own appreciation of Darwinism as a teenager was held back for at least a year by Shaw's bewitching rhetoric in Back to Methuselah. The emotional appeal of Lamarckism, and the accopanying emotional hostility to Darwinism, has at times had a mere sinister impact, via powerful ideologies used as a substitute for thought.' (The Blind Watchmaker,* পৃ. ২২৯)

লামার্কবাদের এই বৌদ্ধিক আবেদনের জন্যই ডারউইনবাদের গভীরে না গিয়েই বার্নার্ডশ ও আর্থার কোয়েসলার প্রথমোক্ত মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ডারউনবাদ সম্পর্কে শ'র মূল্যায়ন হল : *'It seems simple, because you do not at first realize all that it involves, But when its whole significance dawns on you, your heart sinks into a heap of sand within you. There is a hideous fatalism about it, a ghastly and damnable reduction of beauty and intelligence of strength and purpose, of honor and aspiration'.* অভিন্ন কারণেই কোয়েসলার ডারউইনবাদের বিরোধিতায় তাঁর বিভিন্ন রচনায় যেসব মতামত ব্যক্ত করেছেন সেগুলো বস্তুত লামার্কবাদেরই এক অস্পষ্ট ভাষ্য, *'a campaign against his own misunderstanding of Darwinism'* (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১)।

ডারউইনের প্রকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়া এক ভয়ঙ্কর বাস্তবতা, তাতে আছে 'অস্তিত্বের জন্য মরণপণ সংগ্রাম ও যোগ্যতমের উদ্বর্তনের মতো নির্বিশেষ নিষ্ঠুরতা, তাই তত্ত্বটি অনেকের কাছে শুধু এজন্যই গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। কিন্তু লামার্কবাদের বিপদও কিছু কম নয়। অর্জিত বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র বংশানুসৃতির ধারায় বিকশিত হতে থাকলে এবং 'ব্যবহার ও অব্যবহারের' নিয়ম কার্যকর হলে আজকের

www.pathagar.com

জীবজগৎ কী আকার ধারণ করত? আমরা তো শুধু গুণই নয়, দোষত্রুটিও অর্জন করি এবং সেগুলো বংশানুসৃত হলে এতদিনে জীবজগতে লয়প্রাপ্তি ঘটত। আর ব্যবহার ও অব্যবহারের নিয়মে দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন ঘটলে, কল্পনা করুন, পাখির ডানাগুলো কতটা লম্বা আর আমাদের চোখগুলো কতটা বড় হত? লিসেঙ্কো অবশ্য এগুলো না-ঘটার একটি যুৎসই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর মতে এইসব পরিবর্তনের কেবল সেগুলো টিকবে যেগুলো বিপাকক্রিয়ার অনুকূল, অন্যগুলো নয়। তিনি ক্রমোজম বা জিন কিছুই স্বীকার করতেন না, তাই বিপাকক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচনের মতো একটা অস্পষ্ট তত্ত্ব দাঁড় করান ছাড়া নিরূপায় ছিলেন। বলা প্রয়োজন, বিবর্তন কারও পক্ষেই চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়, গোটা ব্যাপারটাই একটা যৌক্তিক কাঠামোর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং সেক্ষেত্রে লামার্কবাদ কোন অর্থেই ডারউইনবাদের সঙ্গে তুলনীয় নয়, আর যতদিন ডারউইনবাদের বিকল্প পূর্ণাঙ্গতর কোন তত্ত্ব দাঁড় করান না-যাবে ততদিন এটিই জীবজগতের উৎপত্তি ও বিকাশের একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হয়ে থাকবে।

এরিখ দেনিকিন (*দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ, বীজ ও মহাবিশ্ব* ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক) অবশ্য এমন একটা ধারণা সৃষ্টিতে কিছুটা হলেও সফল হয়েছেন যে, মানুষ আসলে এই গ্রহের বাসিন্দা নয়, এসেছিল অন্য গ্রহ থেকে। তাতে পৃথিবীর মানুষের কৌলিন্য বাঁচলেও বিবর্তনবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় না। প্রথমত, গোটা জীবজগতে (মানুষ বাদ দিলেও) বিবর্তনের অজস্র সাক্ষ্য সহজলক্ষ্য এবং মানুষের সঙ্গে নরবানর ও বানরদের দৈহিক সাদৃশ্যও অত্যন্ত প্রকট। দ্বিতীয়ত, ভিনগ্রহে মানুষের উৎপত্তি ঘটলেও সেটা ঘটেছে পার্থিব বিবর্তনের অর্থাৎ ডারউইনবাদের নিয়মেই, নইলে সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী হতে হয়। তবে কোন সিরিয়াস বিজ্ঞানী যখন বলেন যে আরএনএ ও ডিএনএ অণুরাশি সংশ্লেষিত হওয়ার পক্ষে পৃথিবীর বয়স যথেষ্ট কম তখন সত্যিকারের সমস্যা দেখা দেয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখন নিশ্চিত যে ধূমকেতুর ভিতর হিমায়িত ডিএনএ ও আরএনএ আছে। তবে কি ভিনগ্রহ থেকে একদা পৃথিবীতে ধূমকেতুরাই জীবনের বীজ বপন করেছিল? আদিম বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেন না থাকায় সেই বীজেরা নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে পৌঁছাতেও পারত। কেউ অবশ্য বলেন, পৃথিবীর সেই আদিম পরিবেশ, বিশেষত সাগরগর্ভের আগ্নেয়গিরির আগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট সেখানকার বিশেষ পরিস্থিতি আরএনএ, ডিএনএ ইত্যাকার জটিল অণুসমূহ সংশ্লেষের অনুকূল ছিল। তবে প্রাণের বীজ ভিনগ্রহে সৃষ্টি হয়ে থাকলে তো আমাদের আশাবদী হওয়ারই কথা, কেননা তাতে প্রমাণিত হচ্ছে মহাবিশ্বে আমরা, মানুষেরা আর নিঃসঙ্গ নই। তবুও স্বীকার্য যে, সূর্যকেন্দ্রিক পৃথিবীর বাস্তবতা এযুগের মানুষ মেনে নিলেও বিবর্তনবাদের গ্রহণযোগ্যতা সর্বজনগ্রাহ্য হতে এখনও যথেষ্ট বিলম্ব আছে।

www.pathagar.com

উদ্ভিদচর্চায় কল্পনা ও উৎকল্পনা

উদ্ভিদবিদ্যা পড়ি শুনে পিতৃব্যতুল্য প্রতিবেশী ফরমুজ আলী নাখোশ হন, 'ঘাসপাতা' পড়ার জন্য কষ্টার্জিত অর্থব্যয়ে তাঁর অনুমোদন ছিল না। আমারও না। চেয়েছিলাম 'বিজ্ঞান-জননী' রসায়ন পড়তে। কিন্তু গণিতে দুর্বলতা সেই স্বপ্নপূরণে বাধা হয়ে ওঠে। বাধ্য হয়েই উদ্ভিদবিদ্যা পড়ি। প্রাণিবিদ্যাও পড়তে পারতাম, কৈশোরে আকৃষ্ট ছিলাম বিহঙ্গজগতে। আসলে পাঠ্য বিষয়ের এই নির্বাচন ছিল দৈবচয়নমাত্র। ঘনিষ্ঠতা থেকে ভালোবাসা জন্মায় আর এভাবেই উদ্ভিদের প্রেমে পড়া। গাছগাছালির পাতা, ফুল ও ফলের খুঁটিনাটি ঘেটে ঘেটে একসময় নজর পড়ল আরো গভীরে কোষ, ক্রোমোসমও জিনে। ডারউন আছর করলেন। তাঁকে মান্য করে ভাবলাম পরীক্ষামূলক শ্রেণীবিন্যাস বিদ্যা নিয়ে কাজ করব। গাইডের অভাবে তা আর হল না। ষাটের দশকের একজন কলেজ শিক্ষকের কিই-বা আর করার থাকে? গবেষণায় জলাঞ্জলি দিয়ে হলাম উদ্ভিদবিদ্যার কাব্যিক ভাষ্যকার।

এক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রবীন্দ্রনাথ গদ্যে-পদ্যে গানের যে স্বর্ণভাণ্ডার রেখে গেছেন, হাত দিলাম, তাতে পাওয়া গেল প্রত্যাশার অধিক – কাঙ্ক্ষিত শব্দবন্ধ, অনবদ্য পঙ্‌ক্তিমালা, খানিকটা অন্তর্দৃষ্টিও। লিখলাম বৃক্ষ লতাগুল্মের কথা – বড়দের জন্য, ছোটদের জন্য। একসময় উদ্ভিদবিদ্যার আরেকটি মাত্রাও ধরা দিল আর সেটি হল বাগান। এক বিদেশী সহকর্মী শিখিয়ে দিলেন আধুনিক উদ্যানশৈলীর রোমান্টিক ধারা– ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেনিং। লেগে গেলাম কাজে, বানালাম কয়েকটি বাগান। নেশা ধরল। বাগান থেকে আর চোখ ফেরাতে পারি না। নিত্যদিন হাজিব হই। 'সন্ধ্যা আগত তমালবিথিতে আঁধিয়ার বনভূমি।' পাখিরা নীড়ে ফেরে। নিস্তব্ধ চরাবর। উদ্ভিদজগৎ সম্মোহনী রহস্যের জাল ছাড়ায় আর সেইসঙ্গে স্বপ্নলব্ধ এক সৌন্দর্যও। কিছুদিন পর এতেও অতৃপ্তি জমে, বাগানে গাছপালা ও রঙের আধিক্য অস্বস্তিকর ঠেকে। শিল্পের স্বকীয় বিকাশের ধারা যথারীতি মূর্ত থেকে বিমূর্তে টানে। জাপানী উদ্যানরীতির বালু ও পাথর বিন্যাসের ব্যঞ্জনা চোখে ভাসে। বুঝতে পারি সামর্থ্যের সীমানায় পৌঁছে গেছি এবং থেমেও যাই।

এইসময় *সিক্রেট লাইফ অব প্ল্যান্টস* বইটি পড়ি এবং আবারও উদ্ভিদচিন্তার দিগবদল ঘটে। গাছপালা কি মানুষের সঙ্গে কোন সম্পর্ক গড়ে তোলে? ঘরে টবে

www.pathagar.com

রাখা একট গাছ কি গৃহকর্তাকে নিরন্তর নজরদারিতে রাখে, তার সুখ-দুঃখে, বিপদে-আপদে প্রতিক্রিয়া দেখায়? আচার্য জগদীশের অব্যক্ত গ্রন্থে তেমন আভাস আছে। কিন্তু প্রথমোক্ত বইয়ের লেখক তাঁদের পালিত একটি গাছে 'লাই ডিটেকটর' যন্ত্র লাগিয়ে উদ্ভিদ-মানব সম্পর্ক বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও বিস্তারিত তথ্যাদি হাজির করেছেন। গাছটি নাকি পালক ব্যক্তির বিপদে সাড়া দেয়, অন্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক জানতেও অতিথি-অভ্যাগতের চরিত্র শনাক্ত করতে পারে। রীতিমতো কল্পবিজ্ঞান। এসব গল্পকথাকে আজগুবি বলে বাতিল করেও দিয়েছিলাম। কিন্তু একদিন ট্রেনে যেতে যেতে জলভরা বিস্তীর্ণ মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা একটি তালগাছ দেখে ওইসব গল্পকথা আবার মনে পড়ে। নিঃসঙ্গ প্রান্তরে গাছটি এভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন? বিশেষ এই ভঙ্গিটি কি কেবল পাতা দিয়ে আলো ধরার জন্য? গাছ ছাড়া তো আর কোনো জীব এভাবে আকাশপানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে না। আমি দারুণ ধন্ধে পড়ি এবং ভাবি গাছটি কি আমাদের অজ্ঞাত কোন তরঙ্গে কোথাও বার্তা পাঠায়? ওরা কি গ্রহান্তরের কোন জীবজগতের অস্তিত্ব জানে এবং সেগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে? সবই উৎকল্পনা। তবে আকর্ষণীয় ও আবিষ্টকর। আজও এ থেকে রেহাই পাইনি।

এক ভাবনা থেকে আরেক ভাবনা জন্মায়। পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি সাড়ে তিনশ কোটি বছর বা আরও আগে প্রোটিনকণা হিসাবে। শুরুতে ছিল পরভোজী, বাড়ত পরস্পরকে গ্রাস করে। একসময় ক্লোরোপ্লাস্ট বা হরিৎকণা জন্মালে ওগুলো শরীরে জুড়ে কিছু আদিকণা হলো স্বভোজী। শিখল আলো থেকে খাদ্য তৈরির কৌশল, তা থেকে নির্গত মুক্ত অক্সিজেন যোগাল সবাতশ্বসনের সুযোগ, গড়ে উঠল প্রাণদ আবহমণ্ডল, শুরু হল জীবজগতের বিবর্তন, জল থেকে স্থলে এল উদ্ভিদকুল, পাথর আর পাঁকে আনল উর্বরতা, মৃত পৃথিবীতে জাগল প্রাণের স্পন্দন। পঞ্চাশ কোটি বছরের কিছু অধিক সময় লাগল জীবজন্তুতে পৃথিবী পরিপূর্ণ হতে আর এতে প্রায় সবটুকু অবদানই উদ্ভিদের। পরভোজী প্রাণিকুলের খাদ্যশৃঙ্খলের গোড়ায় আছে উদ্ভিদ, বলা যায় তাদের উৎপত্তি ও বিবর্তনের মূলেও, আর এই ধারার শীর্ষে আছে নৃকুল, মানুষ, হোমোসেপিয়েন্স।

প্রাণের দুটি ধারা উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য অনেক, তবে তারা স্বভোজী ও পরভোজী হিসাবেও মোটাদাগে বিভাজ্য। পরভোজী উদ্ভিদ আর স্বভোজী প্রাণীও আছে, কিন্তু সংখ্যায় অতিনগণ্য। স্বভোজিতা ও পরভোজিতাকে কল্পনার আঁচড়ে অহিংসা ও হিংসা হিসাবেও ভাবা যায় এবং তাতে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বোঝার এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটে। জীবজগতের বিবর্তনে অহিংসা ও হিংসার ভূমিকা আমরা জানি। ডারউইন হিংসাকেই একক প্রাধান্য দিয়েছেন আবার একইসঙ্গে আধুনিক মানুষের সমাজবিকাশে প্রাকৃতিক নির্বাচনের হিংস্রতাকে অস্বীকারও করেছেন। অথচ মানুষ হিংস্রতর প্রাণী এবং প্রকৃতির নিয়মলঙ্ঘনকারী হিসাবে তার উৎপত্তি

www.pathagar.com

জীবজগতে চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছে। তাহলে সর্বদর্শী প্রাজ্ঞ প্রকৃতি এ মানুষ সৃষ্টি করল কেন যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে? একি বিবর্তন প্রক্রিয়ার কোনো অ্যান্ট্রপি আর মানুষ সেই অ্যান্ট্রপির মূর্তরূপ? জীববিদ্যার দর্শনে হয়ত তার হদিস আছে। মানুষ আজ এতটাই শক্তিধর যে শুধু আপন প্রজাতিকেই নয়, গোটা পৃথিবীর ধ্বংস-সাধনেও সক্ষম। এ আশঙ্কা আজকের নয়, অনেক কালের এবং সেই পূর্বাভাস দিয়েছেন ধর্মবেত্তারা, পরবর্তীকালের মনীষীরাও। সভ্যতার সংকট উত্তরণেরও নানা সুপারিশ আছে তাতে উদ্ভিদের অনুকরণও আছে। আমাদের বৈষ্ণবরা মানুষকে তৃণের মতো নিচু থাকবে, বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু (তৃণাদপি সনিচেনা তরুরূপী সহিষ্ণুনা) হতে বলেছেন। জীববিবর্তনে মিথোজীবিতা একটি পরোক্ষ বাস্তবতা, মানবসমাজে তা প্রত্যক্ষতর করার কথাও বলছেন অনেকে। প্রকৃতি বস্তুত সংগ্রাম ও সহযোগের মধ্যে ভারসাম্য ঘটাতে পারে। মানুষও সেই চেষ্টা করছে, ততটা সফল হতে পারেনি। উদ্ভিদজীবনে গভীরতর অনুসন্ধান আমাদের সহায়তা যোগাতে পারে। পঞ্চভূতে পরিব্যপ্ত, পৃথিবীর নাড়ীর স্পন্দন তাতে ধৃত, হয়ত বৃক্ষে পরিস্ফুটও যা আর কোথাও ঘটে না।

www.pathagar.com

বিশ্বকর্মার বিকল্প

এক নববধূ অবাক হয়ে ভাবেন তার স্বামী বাড়িতে কিছুই কেন মুখে তোলেন না! রান্নায় তার হাত নেই? বাজার থেকে সদ্যকেনা পাকপ্রণালী, বান্ধবীদের সাহায্য সবই বৃথা! স্বামী বলেন, তিনি বাইরে খেয়েছেন, অথবা ক্ষুধা নেই, নতুন কোনো অজুহাত। কিন্তু স্বাস্থ্য তার অটুট, কোথাও দুর্বলতার লক্ষণ নেই। শেষে স্ত্রী এক ডাক্তার বন্ধুর সাহায্য চাইলেন। ডাক্তার কৌশলে তাকে অনেক পরীক্ষা করে দেখলেন। না, কোন রোগের, কোন ক্ষয়ের চিহ্ন নেই। তাহলে?

পরে যা কিছু জানা গেল সবই কল্পবিজ্ঞান এবং আসলেই কল্পকাহিনী। তিনি একদা জাহাজডুবির প র এক দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিলেন। খাবার কিছুই ছিল না। হঠাৎ এক মিউটেশনের ফলে তার রক্তকণিকায় ক্লরোফিল বা হরিৎকণা জন্মাল। তিনি হলেন আলোভুক, ঠিক সবুজ উদ্ভিদের মতো। তাই বলে তার শরীর সবুজ হলো না। উদ্ভিদরাজ্যে বিস্তর গাছপালা আছে যারা সবুজ নয়, অথচ সালোকসংশ্লেষী। তাদের হরিৎকণা ঢাকা থাকে অন্য রঙে, যেমন লালশাক, পাতাবাহার, কলিয়াস আর বাদামি, লাল ও সোনালি শৈবালেরা। আমাদের নায়ক তাই দেহবর্ণের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ছাড়াই এমন এক অনন্য গুণের অধিকারী হলেন যা জীবমাত্রেরই কাঙ্ক্ষিত।

অবশ্য মিউটেশনের এমন আশ্চর্য যাদু বাস্তবে ঘটে না। মিউটেশন প্রায়ই ক্ষতিকর এবং সাধারণ শারীরবৃত্তে তাতে নানা জটিলতা ঘটে। অবশ্য বিষয়টি এখানে আলোচ্য নয়। এটি বংশাণুবিদ্যা বা জেনিটিক্সের ব্যাপার। খোরনার কৃত্রিম ডিএনএ সংশ্লেষের পর জীববিদ্যার ক্ষেত্রে এক নতুন বিপ্লব ঘটেছে এবং জিন বা বংশাণুর মেরামতির এখন আর দূরস্থ নয়। বিজ্ঞানীরা ডিএনএ অণুর জটিল গ্রন্থিবন্দী প্রাণরহস্যের পাঠোদ্ধারের কাছে পৌঁছেছেন এবং এ সম্ভাবনা সভ্যতার অগ্রগতিতে নতুন বেগ সঞ্চার করবে।

ইতিমধ্যেই অবশ্য বৈপ্লবিক সম্ভাবনাশীল জেনিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শুরু হয়ে গেছে। রাসায়নিক পদার্থ, তেজাবেশন ও বিকিরণের মাধ্যমে মিউটেশন উৎপাদন, সংকরায়ণ ইত্যাদির (যা সাধারণ জেনিটিক্সের কাজ) বদলে এটি একের জিন অন্যের মধ্যে, ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়া থেকে ব্যাঙে এবং ব্যাঙ থেকে উচ্চতর প্রাণীতে

www.pathagar.com

সংযোজন করতে পারে। এটি এখনও পরীক্ষার পর্যায়ে থাকলেও অচিরেই তা সত্যি হয়ে উঠবে এবং উপর্যুক্ত কল্পকাহিনী তখন আর অবিশ্বাস্য ঠেকবে না। ফলিত বংশাণুবিদরা এখন স্থপতির ঘনিষ্ঠ। নীলনকশা অনুযায়ী তারা জীবনির্মাণের স্বপ্ন দেখছেন। হাতে তাদের ইট, সিমেন্ট, সুরকি নয়, জিনের টুকরো, অণু-পরমাণু। তারা কলিযুগের বিশ্বকর্মা।

জীবতাত্ত্বিক পরীক্ষায় ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়াদের প্রাধান্যের কারণ শুধু তাদের কাঠামোর সারল্যই নয়, দ্রুত বংশবৃদ্ধির ক্ষমতাও। তাই ফলিত বংশাণুবিদ্যা বা জেনিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষাটি শুরু হয়েছিল ব্যাক্টেরিয়াভুক লাম্‌ডা ও টি-ফাগ, আমাদের অন্ত্রবাসী 'অ্যাস্‌কেরেখিয়া কলাই' নিয়ে। মাত্র দু'বছর আগে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. হার্বার্ট বয়ার ও ড. হাওয়ার্ড গুডম্যান এমন কয়েকটি উৎসেচক আবিষ্কার করেন যা ডিএনএ অণুকে নির্দিষ্ট স্থানে ভাগ করতে পারে। এগুলোকে 'জৈবিক ছুরি' বলা হয়। ফলিত বংশাণুবিদ্যার এ 'জৈবিক ছুরি' আজ প্রধান হাতিয়ার। এগুলোর সাহায্যেই স্টান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টান্‌লি কোহেন ও অ্যানিচাং পূর্বোক্ত ড. বয়ার-এর সহযোগিতায় জিনসংস্থা বিদারণ ও তাতে নতুন জিন সংস্থাপনের দুঃসাধ্য কর্মে সাফল্য লাভ করেন। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে স্টেফাইলোকক্কাস ব্যাক্টেরিয়ার জিন সম্পূর্ণ অসম্পর্কিত 'অ্যাস্‌কেরিখিয়া কলাই'তে সংযোজিত হয় এবং উভয় ব্যাক্টেরিয়ার এক সংকরের উদ্ভব ঘটে। সবিশেষ স্মর্তব্য, এ সংযোজনে সংকরণের কোন ভূমিকা ছিল না। অন্ত্রবাসী যে-ব্যাক্টেরিয়া একদা মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল, জেনিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফলে তাকেই বিপজ্জনক রূপে গড়ে তোলা সম্ভব হল। কিছুদিন পর তারা আরেক বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করলেন। এবার আন্ত্রিক ব্যাক্টেরিয়ায় সংযোজিত হল অনেক উন্নততর প্রাণী ব্যাঙের জিন। এভাবেই সংকরায়ণ ও মিউটেশনের মতো অনিশ্চিত পদ্ধতি পরিহার করে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে জিন-সংযোজনের ফলে বিচিত্র ও বিবিধ জীবসৃষ্টির এক আশ্চর্য দিগন্ত উন্মোচিত হল।

জিনসংস্থাপনের এ সম্ভাব্যতা ফলিত ক্ষেত্রে প্রমাণিত হলেও বহুবিধ সমস্যা এখনো অমীমাংসিত। উচ্চতর প্রাণীর জিন কি সর্বত্রই ব্যাক্টেরিয়ার মতো নিম্নশ্রেণির জীবে সুস্থিত থাকবে? ঈপ্সিত বিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত জিন কি সঠিকভাবে কার্যকর হবে, নাকি অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় উপাদানের প্রতিবন্ধে রূপান্তরিত হবে অন্যতর কিছুতে? এসব প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই লভ্য। আপাতত সম্ভাবনার দিকগুলোই বিবেচ্য।

১. যেসব ব্যাক্টেরিয়া ধান, পাট, গম, ভুট্টা ইত্যাদি ফসলের শিকড়ে বাস করতে পারে তাদের মধ্যে বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রাহক জিন সংযোজন ও পূর্বোক্ত ফসলের শিকড়ে মিথোজীবিতায় তাদের অভ্যস্ত করা। প্রকৃতির

www.pathagar.com

জগতে এ ধরনের ব্যাক্টেরিয়ার সংখ্যা কম নয়। শিমজাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ে তারা মিথোজীবীরূপে থাকে। বাতাস থেকে নাইট্রোজেন শোষণ করে তারা আশ্রয়দাতা উদ্ভিদে সরবরাহ করে। তাছাড়া তাদের সঞ্চিত নাইট্রোজেন ভূমিরও উর্বরতা বাড়ায়। জেনিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এ ধরনের জিন কোন সুঅভিযোজিত দ্রুতবর্ধনশীল ব্যাক্টেরিয়ায় যুক্ত হলে মাটিতে কৃত্রিম সার প্রয়োগের বিপুল ব্যয় থেকে আমরা রেহাই পাব। তাছাড়া কৃত্রিম সারে আখেরে ভূমির যে-ক্ষতি হয় অতঃপর সেই ভয়ও থাকবে না। শুধু এই একটিমাত্র সাফল্যের হিসেব করে দেখুন কী বিপুল সম্ভাবনা এতে নিহিত। কিন্তু এখানেও নিয়ন্ত্রণের সমস্যা রয়েছে।

২. আমাদের দেহে যেসব ব্যাক্টেরিয়া মিথোজীবী হিসেবে বাস করে তাদের মধ্যে ইন্সুলিন-উৎপাদক জিন-সংযোজন সম্ভব হলে ওষুধ ছাড়াই আমরা ক্ষতিকর ও অবক্ষয়জনিত বহুমূত্র থেকে মুক্তি পাব। এভাবে ইন্সুলিন উৎপাদনের ব্যয় ও আনুষঙ্গিক পার্শ্ববিক্রিয়া নিরসন সম্ভব হতে পারে।

৩. অনুরূপ ব্যবস্থানুযায়ী মানুষের বহু বংশানুসৃত ব্যাধি প্রতিরোধের জন্য ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়া ব্যবহৃত হতে পারে, সংযোজিত হতে পারে অ্যান্টিবায়োটিক-উৎপাদক জিন কোন দ্রুতবর্ধনশীল ও সহজলভ্য অণুজীবে।

৪. জিনসংযোজন মাধ্যমে এমন ধরনের ভাইরাস ও অণুজীব উৎপাদন সম্ভব যা ক্যান্সারসহ বিবিধ দূরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ে কার্যকর হবে। এ তো গেল সম্ভাবনার কথা। কিন্তু বিপদের ঝুঁকিও কম নেই। কল্পনা করুন, দ্রুতবর্ধনশীল সু-অভিযোজিত কোন ব্যাক্টেরিয়া বা ভাইরাসে এমন রোগ-উৎপাদক জিন সংযোজিত হল যার বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অনাক্রম্যতা নেই। তখন? মানুষ একই প্রক্রিয়ায় এ ধরনের জীবাণুলহরী তৈরি করতে পারবে যেগুলোর বিধ্বংসী ক্ষমতা হবে পরমাণু-বোমার চেয়ে বহুগুণ মারাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী। কলেরা, টাইফয়েড, কিংবা বসন্তের টিকা নিয়ে আমরা নিরাপদ বোধ করি। কিন্তু এসব জিন অন্যতর ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসে সংযোজিত হলে তার বিরুদ্ধে আমরা অনাক্রম্যতার আশ্রয় কোথায় পাবো? এদের টিকা আবিষ্কার করতে সময় লাগবে এবং এরই মধ্যে মারা যাবে বহু লোক। আর টিকা আবিষ্কৃত হলেই কী? একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে বাধা কোথায়? আর মানুষের প্রজননরোধী কোনো রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদক জিন পাওয়া গেলে এবং তা অণুজীবে যুক্ত করে ছেড়ে দিলে জানবোও না যে আমরা কিসে আক্রান্ত হয়েছি এবং দ্রুত জনসংখ্যা হ্রাসে ক্রমে মানবজাতির অবলুপ্তি ঘটবে।

www.pathagar.com

কোন ডিটেকটিভ কাহিনী কিংবা ছায়াছবির কথা? নির্জন দ্বীপে বা রুদ্ধদ্বার কক্ষে এক বিকৃতমস্তিষ্ক বিজ্ঞানী মানবজাতিকে ধ্বংস করার জন্য কোন রহস্যময় গবেষণায় রত এবং ক্রমে সেই বিধ্বংসী মারণাস্ত্র তার হস্তগত। কিন্তু কোন দৈবদুর্ঘটনায় তার গবেষণাগার বিধ্বস্ত হল কিংবা কোনো ডিটেকটিভের মহতী প্রচেষ্টায় তিনি ধরা পড়ে আত্মহত্যা করলেন কিংবা গেলেন পাগলাগারদে। এ ধরনের গল্প বা ছায়াছবির সংখ্যা কম নয়। ইতিমধ্যে জেনিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে আমরা যেটুকু জেনেছি, তাতে এমন কোন চরিত্রের পক্ষে এ কাজ মানানসই হবে। নয় কি? একজন লোক তো আর বিরাট কোন আণবিক বোমা বানাতে পারে না, বড়জোর এমন জীবাণু-টিবাণু তৈরি করতেও পারে।

কিন্তু আসলে তা নয়। এ ধরনের গবেষণা আণুবীক্ষণিক জীব নিয়ে হলেও তা জটিল ও ব্যয়বহুল। ব্যাপক সংগঠন ছাড়া এতে সামান্যতম সাফল্যও কল্পনাতীত। এজন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কিংবা বিরাট কোম্পানির সদিচ্ছা বা অসদিচ্ছা। কিন্তু রাষ্ট্রমাত্রেই কি এ ব্যাপারে খুব নির্ভরশীল? কোম্পানির কথা বাদই দেয়া গেল। অবশ্যই নির্ভরশীল নয়। তাই স্টান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পল ব্রেস সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন 'পারমাণবিক বোমাকে তালাচাবি দিয়ে আটকে রাখা গেলেও অণুজীব একবার প্রতিবেশে ছাড়া পেলে তাকে আমরা আটকাব কীভাবে?

আটকানো খুবই কঠিন হবে।

১৯৭৪ সালে আমেরিকার 'সায়েন্স' পত্রিকায় ১২ জন প্রখ্যাত জীবরাসায়নিক ও বংশাণুবিদের স্বাক্ষরিত একটি আবেদন প্রকাশিত হয়। এতে ছিলেন অধ্যাপক পল ব্রেগ, অধ্যাপক হার্বার্ড বয়ার, অধ্যাপক স্টেন্‌লি কোয়েন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। ইতিহাসে এই প্রথম বিপদাশঙ্কায় বিজ্ঞানীরা নিজে তাদের গবেষণা বন্ধ করার জন্য সহযাত্রীদের আবেদন জানালেন। অবশ্য সমগ্র গবেষণা নয়, জেনিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কিছু অংশ সম্পর্কেই তাদের আপত্তি ছিল। শেষে ১৯৭৪ সালের ডেভস কংগ্রেসে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মার্টিন ক্যাপলানের প্রস্তাব বহু বিতর্কের পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। এ ধরনের গবেষণা কেবল যোগ্যতম কর্মীদের দ্বারা সীমিত সংখ্যক উন্নত ল্যাবরেটরিতে অনুষ্ঠিত হলে বিপদের ঝুঁকি অনেক কমে যাবে, তাতে সকলেই একমত হন।

১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকার এসিলামারে বিশ্বের ১৬টি দেশের জীববিজ্ঞানী, বংশাণুবিদ, জীবরাসায়নিক এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে এ সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তারা কয়েক ধরনের পরীক্ষা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। উচ্চতর প্রাণী থেকে ব্যাক্টেরিয়ায় জিন-সন্নিবেশ সম্পর্কেও তারা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। কারণ, এসব জিন থেকে অনেক সময় ম্যালিগন্যান্ট

www.pathagar.com

টিউমার হতে পারে। সাধারণভাবে মূল গবেষণা অব্যাহত রাখার পক্ষে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা স্থির করেন যে এমন ব্যাক্টেরিয়া এসকল পরীক্ষায় ব্যবহৃত হবে যারা প্রাকৃতিক প্রতিবেশে বেঁচে থাকতে অক্ষম। এতে এ ধরনের কোন ব্যাক্টেরিয়ার পক্ষে বাইরে ছড়িয়ে পড়া আর সম্ভব হবে না। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এ জাতীয় পরীক্ষায় ব্যাক্টেরিয়াকে অত্যুচ্চচাপে কিংবা ভ্যাকুমে অথবা অত্যুচ্চ তাপ বা অতিনিম্ন তাপমাত্রায় জমান হয়। অতঃপর স্বাভাবিকভাবেই তাদের পক্ষে বাইরে প্রাকৃতিক পরিবেশে বেঁচে থাকার বিপদ হ্রাস পায়।

এখানেই প্রসঙ্গটি শেষ।

কিন্তু আমরা কি বারেক সেই আলোকভুক ভদ্রলোকের প্রসঙ্গে ফিরে যাব? জেনিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কি এমন কিছু ঘটাতে পারে? অন্তত এখনো পারে না, যদিও বিজ্ঞানে অসম্ভব বলে কিছু নেই। এ ধরনের সকল পরীক্ষাই এখন ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসেই মূলত সীমিত। এদের মধ্যেই চলেছে নতুন জিন-রোপণের কাজ। এগুলো মানুষের দেহে মিথোজীবীরূপে বাস করতে পারলে মানুষ উপকৃত হবে। কিন্তু রক্তকণিকা তো আর বাইরে থেকে মানুষের শরীরে আসে না, মানবদেহেই উৎপন্ন হয়। যে প্রত্যঙ্গ এদের উৎস তাতে হরিৎকণা-উৎপাদক মিউটেশন ঘটান কিংবা হরিৎকণার জিনযোজন অসম্ভব। সুতরাং এটি সত্যিই কল্পকাহিনী, তবু কৌতূহলপ্রদ বৈকি?

বিজ্ঞানের ইতিহাসে জীবদ্যিার অগ্রগতি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের তুলনায় শ্লথ ছিল। শিল্প-উৎপাদনের সঙ্গে ততোটা ঘনিষ্ঠ ছিল না বলেই তা ঘটেছিল। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের ব্যাপক অগ্রগতি মানুষের কল্যাণে ও ধ্বংসে একইভাবে যুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জীববিদ্যায়ও ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছে। এই বিদ্যা আজ পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের সমপর্যায়ে ও সহযোগীরূপে বিকশিত হচ্ছে আর দেখছি এতেও বিপুল সম্ভাবনা আর মারাত্মক ধ্বংসের আশ্চর্য সহাবস্থান। এ হল বিজ্ঞানের নিয়তি। মানুষের, গণমানুষের প্রজ্ঞাই শুধু একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আর কেউ নয়।

সম্প্রতি জেনিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কল্যাণে জীবাণুতে নতুন জিনসংযোজনের মাধ্যমে ওদের দ্বারা নতুন নতুন প্রোটিন তৈরি সম্ভব হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য ইনসুলিন। এজন্য এখন আর পশুর প্যাংক্রিয়াস প্রয়োজন হয় না। ফলত ইন্সুলিনের উৎপাদন সহজ ও সস্তা হয়ে গেছে। পশুখাদ্যের মানবৃদ্ধিতেও এ পদ্ধতি কাজে লাগছে। ফসলের খরাসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য উন্নতি বিধানেও তা অচিরেই সুফল ফলাবে।

১৯৭৬

www.pathagar.com

রল্যাঁর দিনপঞ্জী: জগদীশচন্দ্র

মার্চ, ১৯২৪। জগদীশচন্দ্র বসুর 'সারকুলেশন অ্যান্ড অ্যাসিমিলেশন অফ প্লান্টস্' (লন্ডন, ১৯২৪) পুস্তিকা এবং তার সঙ্গে প্যারি থেকে লেখা চিঠির কটি লাইন, (২৮ মার্চ) :

'প্রিয় মহাশয়, মানবতার সর্বজনীন স্বার্থের জন্য আপনার কর্মসাধনা আমার গভীর শ্রদ্ধা উদ্রেক করেছে। প্রাণের ঐক্য সম্পর্কে আমার বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার একটি কপি আপনাকে পাঠাবার অনুমতি দেবেন, বিগত ৩০ বছর যাবৎ ভারতবর্ষে এটি ছিল আমার অনুসন্ধানের (শব্দটি দুষ্পাঠ্য)– আমি অল্পদিনের জন্য ইউরোপ সফরে এসেছি এবং বৈজ্ঞানিক সমাজগুলোতে বক্তৃতা দিয়ে চলেছি। এখন আমি আমার দেশে ফিরে যাচ্ছি– আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ ইত্যাদি। মহাত্মা গান্ধী এবং কবি রবীন্দ্রনাথ আমার অতিশ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিগত বন্ধু।'

৯ জুলাই, ১৯২৭। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু এসেছেন জেনেভা লেকে...তাঁর সঙ্গে লেডি বসু, পরনে ভারতীয় পোশাক, তাঁর মধ্যে স্বামীর চেয়ে জাতিগত লক্ষণ অনেক বেশি স্পষ্ট। আমরা মেত্রো স্টেশনে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁদের আনতে। তিনি ফরাসি বলতে পারেন না, তাই আমার বোন...আমাদের মধ্যস্থ হল।

তিন চার ঘণ্টা ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই মানুষটি যে প্রাণশক্তি, বুদ্ধিমত্তার উত্তাপ ছড়ালেন তার একটা ধরণা কী করে দিই। মানুষটি ছোটখাটো, বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখ, কালো ভুরু, রুপোলী চুল : একটু সেমেটিক রক্ত-মেশা ভূমধ্যসাগরাঞ্চলের মানুষের মতো রোদে-পোড়া গায়ের রং, ছোট ছোট দুটো শুকনো হাতের (প্রতিভাবানের হাত) নখ ছোট করে কাটা, বয়সের তুলনায় এক অবিশ্বাস্য (আমার সমান বা আমার চেয়েও উচ্চস্তরের) তারুণ্য এবং কথা বলার, চিন্তা করার, বেঁচে থাকার এক আনন্দ – আমাকে মনে করিয়ে দেয় গৌরবময় আবিষ্কারের ঠিক পরেরকার (১৯১৫) আইনস্টাইনকে।

তাঁর বিচিত্র বিষয়ের আলোচনার হিসাব রাখা কঠিন, তবুও তারা তাঁর প্রায় গোটা নতুন জগতকে ঘিরেই ঘোরে : এই নতুন জগতের তিনি আবিষ্কর্তা – যেমন আমি তাঁকে বলেছি, তিনি হচ্ছেন মনোজীবন, উদ্ভিদ ও অজৈব পদার্থের সংবেদনশীলতার, মনের নতুন মহাদেশের ক্রিস্টোফার কলম্বাস। ত্রিশ বছর হল হঠাৎ তিনি এটা উপলব্ধি করেছিলেন এক কাঠবাদাম গাছের শরীরে, অসুস্থ অবস্থায়

www.pathagar.com

যে-ঘরে তিনি শুয়ে থাকতেন, তার জানালার সামনেই গাছের ডালগুলো দুলতো। তারপর থেকে, শুধু তাকে পর্যবেক্ষণ করাতেই নয়, তাঁর নিপুণ মাথা খাঁটিয়ে বার-করা অসংখ্য যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ড-করা গ্রাফের মাধ্যমে তাকে দিয়ে কথা বলাতে, তাকে দিয়ে বলিয়ে নিতেও তিনি আর থামেন নি। প্রমাণ ছাড়া কোনকিছু জোর করে বলা নয়, আর সেই প্রশ্নটি, যাকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, তাকে দিয়ে না লিখিয়ে নয়। এইখানেই তাঁর প্রতিভার সবচেয়ে অসাধারণত্ব। কিন্তু এই ধারণার জন্য প্রথমে দরকার হয়েছিল, যা খুঁজতে যাচ্ছেন তার আধা-ধর্মীয় স্বতঃলব্ধ বোধটি (intuition) লাভ। এই ধারণা যাতে একটা উপলব্ধি দিতে পারে, তার জন্য দরকার হয়েছিল মনের মতোই নিপুণ হাতের অধিকারী হওয়া। তিনি বললেন যে এই কাজের জন্য আঙুলগুলো থেকে চরম স্পষ্টতা ও পুরোদস্তুর নিশ্চলতা পেতে কমপক্ষে বছর বারো লাগে, কেননা তিনি যে-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন তারা এককোটি থেকে শতকোটি গুণ বড় করে দেখায় বলে সূক্ষ্মতম কম্পনও স্কেলে ধরা পড়ে যায়। তাছাড়া এই যন্ত্র তৈরির জন্য তিনি বিশেষজ্ঞদের কাছে যান না, যান অত্যন্ত সরল ছোটখাটো কারিগরের কাছে, তাদের তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দেন যা লাভ করতে, উদ্ভিদের গভীরে তাদের মনের (যে-মনকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন) অদৃশ্য গতিবিধি পড়তে, তিনি সফল হতে চান। তাঁর সর্বশেষ আবিষ্কারগুলো উদ্ভিদের উপরে ও মানুষের উপরে ভেষজপদার্থের সমান্তরাল ফলাফলের সঙ্গে সম্পর্কিত। এগুলি চিকিৎসাবিজ্ঞানের না-জানা এক এলাকা উদ্ঘাটিত করছে, কেননা মানুষের মনের উপরে একই ফলাফল নির্ণয় করার আগে তিনি এমন এক পদার্থকে উদ্ভিদের মনের উপরে পরীক্ষা করতে পেরেছেন।

তিনি উদ্ভিদের (প্রায় সুনিশ্চিত) বধিরতার কথা বললেন, এবং তা পুষিয়ে নিতে আলোর সমস্ত ঘাটে (যাদের মাত্র একটা ঘাটকেই আমরা উপলব্ধি করি) – প্রতিটি বৈদ্যুতিক ও সৌর স্পন্দনে– তাদের বিস্ময়কর সংবেদনশীলতার কথা বললেন। কীটপতঙ্গের বধিরতা সম্পর্কে ফেরেলের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল। জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের বললেন সাপেরাও বধির। বাঁশি বাজিয়ে সাপুড়েদের খেলা দেখান একটা ধাপ্পা। আসলে তার কারণ হচ্ছে বাঁশি বাজায় সাপুড়েরা হাতের ও বুকের কিছু কিছু ভঙ্গি করে সাপের দিকে ঝোঁকে। সাপ ওই প্রতিবিম্বগুলোতেই বশীভূত থাকে। লোকদৃষ্টিতে ধরাপড়া প্রতিটি দৃশ্যগোচর ব্যাপারকে খুব কাছে থেকে আবার দেখার প্রয়োজন আছে, কারণ এগুলো প্রায়ই ঠিক দেখা নয়, ভুল দেখা (কিন্তু এগুলো মাথা খাটিয়ে বার করা নয়)।

আমি তাকে ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের অতীত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, দু'হাজার বছর আগেই ভারতবর্ষের রসায়নের দ্বৈত-প্রস্থান ছিল (স্বাভাবিকভাবেই নাম ছিল না) – এক প্রস্থান পদার্থের ছদ্ম-ধর্মকে ঈশ্বরে ও যে-মন

www.pathagar.com

তাদের কল্পনা করে তাতে আরোপ করত, অন্য প্রস্থান অত্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে স্বরূপেই পদার্থ পর্যবেক্ষণ করত এবং এই তত্ত্বটি নিষ্কাশিত করেছিল : যেকোন পদার্থই পরম ভালো বা পরম মন্দ নয়, প্রত্যেকেই ক্ষেত্রানুসারে (এবং মাত্রানুসারে) ভালো অথবা মন্দ। যেমন, গোখরোর মারাত্মক বিষ অসুখে শ্বাস-ওঠা রোগীকেও সঞ্জীবিত করতে, বাঁচাতে পারে। (জগদীশচন্দ্র তাই মানেন বলে মনে হয়; কিন্তু এখানে জানা এই রীতি ইংরেজরা নিষিদ্ধ করেছে, তারা বিষের ব্যবহারই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে)।

আমাকে হালে যে-বইটি পাঠিয়েছেন এক সময় তিনি সেটি হাতে তুলে নিলেন। এটি তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত বই : 'প্লান্ট অটোগ্রাফ অ্যান্ড দেয়ার রিলেশনস', তাতে তাঁর আবিষ্কারগুলোর মূলকথার সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন। আমাদের বাগান থেকে তুলে আনা কয়েকটি গাছড়া হাতে নিয়ে তার কিছু অংশ ব্যাখ্যা করলেন। সংবেদনশীলতার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে গৃহপালিত হাঁসমুরগি ও বাগানের সবজিগাছের (ফ্রেঞ্চ বিন) মধ্যে– লক্ষণীয়ভাবে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে : তাদের সংবেদনশীলতা (বা প্রতিক্রিয়াগুলো) ভয়ংকরভাবে কম যায় এবং লজ্জাবতীর একটা ডগার চারটে স্নায়ু দেখালেন, কেমন করে প্রত্যেকে একটা পাতাকে চালাচ্ছে এবং যেকোন পাতায় রোদের স্পর্শে সৃষ্টি-হওয়া উপরে ও নিচে সংকোচ-প্রসারণের অবিরাম নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করছে।

তিনি ভারতীয় ধরনে গভীরভাবে ধর্মপ্রবণ এবং তা মোটেই গোপন করেন না। (জগতের সামনে এখন যে তাঁর আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাও গোপন করেন না)। তিনি নিঃসন্দেহ যে, জীবন এক ও গতিশীল আর আমাদের অস্তিত্বের চক্র জৈব ও অজৈব (বলে কথিত) পদার্থের সমরাজত্বের মধ্য দিয়ে এক রূপ থেকে অন্য রূপে আমাদের নিয়ে যায়। পরিণামে তিনি সমস্ত অস্তিত্বকে অঙ্গীভূত করেছেন। তিনি বললেন : 'আমি যদি উদ্ভিদ না হতাম, তাকে বুঝবার জন্য যদি আবার উদ্ভিদ না-হয়ে যেতাম, তা হলে তার মন আবিষ্কার করতে পারতাম না।' তারই ফলস্বরূপ মানবতার ঐক্য তাঁর কাছে একটা চোখে-দেখা জিনিস, ব্যক্তিগত নির্বোধ অহংকার যাকে অন্ধ করে রেখেছে, মাত্রা থেকে মাত্রায় মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছে, প্রথমে করেছে জীবের অন্য শ্রেণী থেকে, তারপর মানুষের অন্য জাত থেকে, তারপর অন্যান্য ব্যক্তি থেকে এবং অবশেষে তার মধ্যে বানিয়েছে মরুভূমি।

সামাজিক বিপ্লব বা রাজনীতিতে আগ্রহী হওয়ার পক্ষে তিনি বড় বেশি বৈজ্ঞানিক ভাবাপন্ন। তাঁর চোখে প্রকৃতি তার চিরস্থায়ী পথ অনুসরণ করে চলে আর ওদিকে রাজনৈতিক দলগুলো ওঠে আর পড়ে। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি দূরদর্শী, যারা কলকাঠি নাড়ে তাদের ফাঁদে তিনি ধরা দেন না। বসুবিজ্ঞানমন্দিরে

www.pathagar.com

পাঠান মুসোলিনির ইতালি আসার নিমন্ত্রণ তিনি সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করেছেন। লিগ অব নেশনসে'র মিথ্যার মুখোস খুলে দেখতে তাঁর কোনোই অসুবিধা হয় নি। যে সমস্ত বুদ্ধিমান এশিয়াবাসীকে আমি দেখেছি তাঁদের মতোই তিনি লিগকে নিদারুণ অবজ্ঞার চোখে দেখেন।

বিবেকানন্দকে তিনি খুব ভালো করে জানতেন (এবং রামকৃষ্ণকেও দেখেছেন কিন্তু সত্যিকারের জানাশোনা ছিল না)। বিকেকানন্দকে তিনি ভালোবাসতেন, বিবেকানন্দও তাকে ভালোবাসতেন। (শুনে আনন্দ পেলাম) তাঁর মধ্যে জাতীয়তাবাদী প্রবণতা দেখতে পাচ্ছেন মনে করে এক সময় বিবেকানন্দ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এবং তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন ভারতীয় মনের বৈজ্ঞানিক মূল্যের দাবি নিয়ে কেবলমাত্র বিজ্ঞানেই জাতীয়তাবাদকে দেখান। যারা বিবেকানন্দকে দেখেছেন তাদের সকলের মতোই জগদীশচন্দ্র সেই মোহিনীশক্তির কথা বললেন, যে-মোহিনীশক্তি জীবন ও বুদ্ধিতে উপছে-ওঠা এই ব্যক্তিত্বটি বিস্তার করতেন। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে গড়ে ওঠার আগেই বড়ো তাড়াতাড়ি তার মূল্যেচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় অলৌকিক ক্রিয়াসাধক, ভেল্কি-দেখান ফকির সম্পর্কে যারা যুক্তির ও ইচ্ছাশক্তির সংযমকে মোটেই সংশ্লিষ্ট করে না – তাদের সকলের সম্পর্কে বিবেকানন্দের মতো (এবং আমার বিশ্বাস রামকৃষ্ণের মতোও) তাঁর গভীরতম অবজ্ঞা। থিওসফিস্টদের মনের অস্পষ্টতা, বিভ্রান্তি ও অলসতা সম্পর্কে (তাঁদেরই মতোই) তিনি করুণামিশ্রিত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলেন। বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ পড়ার পর বসুকে বলতে শুনে আমার কাছে এটা স্পষ্ট যে ভারতীয় ধর্মীয় মহৎ স্বতঃলব্ধ বোধের (যা তুরীয় আনন্দ পর্যন্ত যেতে পারে) অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত হচ্ছে সবসময়ই যুক্তির নিয়ন্ত্রণ এবং সাময়িকভাবে হলেও, যা কিছু যুক্তিকে বিসর্জন দেওয়ার, তার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা। কিন্তু কেমন করে তাঁরা এই সঙ্গে স্বচ্ছ যুক্তি ও অন্তরদর্শনকে মেলান, তা এমন এক বিজ্ঞান যা সবচেয়ে বুদ্ধিমান ইউরোপীয়রাও মোটেই অনুমান করতে পারে না (দেহের একাংশে বা গোটা দেহের সংবেদনশীলতার প্রণালীগুলো নিজের ইচ্ছেমতো খোলা বা বন্ধ করার জন্য যে ক্ষমতা মন আয়ত্ত করতে পারে বা মনকে আয়ত্ত করতে হয় সেই ক্ষমতার কথা জগদীশচন্দ্র আমাদের এক মুহূর্তে বলে দিলেন, এইটিই লক্ষ্য করার মতো)।

তাঁর কলিকাতার বসুবিজ্ঞানমন্দিরের জন্য কয়েকখানি বই নাম স্বাক্ষর করে উপহার দিতে অনুরোধ করলেন আর অনুরোধ করলেন মনের যে-আত্মীয়তা আমাদের এক করেছে তার সাক্ষ্যবহ একখানা চিঠি দিতে, যা তিনি তরুণদের হাতে পৌছে দিতে পারেন।

তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিজ্ঞানমন্দিরকে দিয়ে দিয়েছেন (তাঁর কোন সন্তান নেই)। দশ বছর শিক্ষানবিসির পর তিনি কিছু ছাত্রকে বৃত্তি দেন। তিনি বললেন,

www.pathagar.com

তারপর যখন তিনি মনে করেন তারা চালিয়ে যাবার উপযুক্ত, তিনি চান সারা জীবনের জন্য তাদের এমনভাবে এক পর্যাপ্ত বৃত্তির নিশ্চয়তা দিতে যাতে বিজ্ঞান ছাড়া অন্য বৈষয়িক উদ্বেগ তাদের না থাকে– কিন্তু প্রতিটি বিজ্ঞানমন্দিরের জগতকে দিতে হবে। কোনোটিরই গোপনতা বা পেটেন্ট রাখা হবে না। কেননা, তিনি বলেন, বিজ্ঞানের সেইটি একমাত্র ভালো যা সকলকে দেয়া যায়, যা গোপন করতে হয় তাই মন্দ (বিস্ফোরক পদার্থ, মারণাস্ত্রাদি)।

কৌতূহলজনক এত কিছুর প্রথম সাক্ষাৎ – এদের এদের অর্ধেককেই হারিয়ে যেতে দিতে হবে, তবু এদের মধ্য থেকে সেইটি লিখে রাখতে চাই, প্রকৃতির লড়াই, উদ্ভিদজগতের সংগ্রাম সম্পর্কে আমার পর্যবেক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি যে-উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে আরও ভয়ংকর কিছু কাহিনী উল্লেখ করলেন : একটা তালগাছ, তার উপর বটগাছের একবিন্দু বীজ পড়েছে, সেটা একটু একটু করে গাছের উপরে নিজেকে ছাড়াচ্ছে, গাছকে ফাঁদে আটকাচ্ছে, ঢেকে ফেলছে, তারপর চারধারে শেকড় চালিয়ে দিয়ে জ্যান্ত গিলে খাচ্ছে। কিন্তু অন্যদিকে এই একটি যা মানবপ্রজাতির সমস্ত উৎসর্গিতদের আশ্চর্য প্রতীক হতে পারে; দীর্ঘকালের এক লড়াইয়ের পর মনে হয় শান্তি স্থাপিত হয়, জঙ্গল বা বাগানের বিভিন্ন জাতের গাছের মধ্যে এক ধরনের ভারসাম্য ফিরে আসে। প্রত্যেকে তার দূরত্ব রক্ষা করে। কিংবা মনে হয় পর পর মিলেমিশে থাকে... কিন্তু তাদের মধ্যে পরদেশী কোনো গাছ লাগান হোক, সকলে মিলে জোট বাঁধবে। পরদেশী গাছটা বাঁচতে পারবে না, মরে যাবে। মনে হল সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, কিন্তু গেলেও তার দেহের সারাংশ শত্রুর মাটিকে উর্বর করে তুলবে। এক বছর দু'বছর পরে চোখে পড়বে মরা গাছ থেকে জন্ম নিয়ে নতুনগাছ মাথা তুলছে, সেটাই শেকড় বসিয়েছে, কিন্তু তখনো তার জীবনীশক্তি দীর্ঘকালের প্রতিরোধের পক্ষে যথেষ্ট না হয়, সে-শক্তি হবে পরবর্তী বংশধরদের। সন্তানদের মধ্য দিয়েই মৃতেরা জন্মলাভ করে।

লেডী বসু বয়স্কা মহিলা, মোটেই সুন্দরী নন, গায়ের রং কালো, মুখখানা বড়োসড়ো, একটু ভারী, কিন্তু মনে হয় (আমি জানি তিনি) ভালো মানুষ ও বুদ্ধিমতী। স্বামীর প্রতি আশ্চর্য রকম অনুগত, প্রথম থেকে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য সংগ্রামে তিনি অংশ নিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি কদাচিৎ মুখ খোলেন... স্বামীই যখন সর্বক্ষণ কথা বলছেন, তিনি কেমন করেই বা বলতে পারেন। চোখদুটো অর্ধেক বুজে এক হাসিমাখা ক্লান্ত ধৈর্যের ভাব ফুটিয়ে তিনি শুনে যান তাঁর বৃদ্ধ শিশুটি বলে চলেছেন, একই উৎফুল্ল কাহিনী আবার নতুন করে বলতেও যাঁর ক্লান্তি নেই।

বুঝবার অক্ষমতার বিরুদ্ধে, জাতিগত ও পেশাগত সংস্কারের বিরুদ্ধে জগদীশচন্দ্রকে অনেক লড়াই করতে হয়েছে। প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা, তাঁর পেশার সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন (বিপরীত দিকে তাঁকে সমর্থন করেছেন পদার্থবিদরা)। তিনি

www.pathagar.com

বলেন : বর্ণভেদের জন্য ইউরোপীয়রা আমাদের নিন্দা করে। ইউরোপে পেশাগুলো, গোষ্ঠীগুলোই বর্ণ। তার অভিযোগ হল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমানেরও মনের ভীরুতার এবং প্রকৃতি ও মানব শক্তি সম্পর্ক তাদের অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। তাঁর আবিষ্কার দেখিয়েছে যে মানুষের বাইরেও আবেগময় জীবন আছে, তার প্রথমদিকে মহাপণ্ডিত লর্ড কেলভিন তাঁকে বন্ধুভাবে বলেছিলেন : 'না এটা সম্ভব নয়। এটা হবে ঈশ্বর সম্পর্কে শ্রদ্ধার একটা অভাব, তিনি চেয়েছেন মানুষকে বিশেষ অধিকার দিতে।' জগদীশচন্দ্র প্রতিবাদ করেন... ঈশ্বরকে গণ্ডিবদ্ধ করার দাবিটা যেন শ্রদ্ধার অভাব নয়! জগদীশচন্দ্র লক্ষ্য করেছেন, অন্যদিকে সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমানেরও বেশির ভাগ সময়েই সহজতম সমাধান মাথায় আসে না। আর তাঁর ক্ষেত্রে সহজ ও বাস্তব সমাধান বার করা সম্ভব হয়েছে, তার কারণ তিনি এইটি সবসময়ে মাথায় রাখেন। এইভাবে হৃদৎস্পন্দন পরিমাপের অতিসংবেদনশীল যন্ত্রপাতির মধ্য থেকে প্রতিটি স্পন্দন আলাদা করার জন্য তিনি এই নীতি ধরে শুরু করেছেন যে পৃথিবীর আবর্তনের উপলব্ধি এড়াবার শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে তারই সঙ্গে যোগ দেওয়া এবং এই অতিসহজ পন্থাতেই তিনি এর মধ্যে খাপ-খাওয়ানো (এবং বধিরতা) সম্ভব করে তোলেন।

আমাদের মতো যাদের সব সময় চোখ খুলে রাখতে হয় এবং লড়াইয়ের জন্য তৈরি থাকতে হয়, তাদের মনের ভূমিকা প্রসঙ্গে তাঁর মনে পড়ল যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়দের একমাত্র ব্রত ছিল অপরের জন্য লড়াই করা এবং এইভাবেই ক্ষত্রিয়রা সমাজের বাকি অংশের শান্তি ও নিরূপদ্রব কর্মের নিশ্চয়তা দিত। (ব্রাহ্মণরা তাদের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রকের কাজ করত)। যে বীরোচিত ও অনুপ্রাণিত সংস্কারগুলো ভারতবর্ষকে নতুন প্রাণ দিয়েছে তাদের উদ্ভব ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে নয়, ক্ষত্রিয়দের মধ্য থেকে। যে-বুদ্ধের প্রতি জগদীশচন্দ্রের অসীম শ্রদ্ধা তিনিও একজন ক্ষত্রিয়। (আমি নিশ্চত নই জগদীশচন্দ্র একজন ক্ষত্রিয় কিনা) তিনি শেষ করলেন এই বলে যে জগতে মনের এই ক্ষত্রিয়দের এই শ্রেণীকে আমাদের নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

জগদীশচন্দ্র গান্ধীকে ভালো করেই জানেন এবং গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। কিন্তু তাঁর বিচারে গান্ধী বড়োই সংকীর্ণ, তিনি শিল্প-বিজ্ঞানের প্রতি বড়োই উদাসীন বা খড়্গহস্ত, মনের এই স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় ঐশ্বর্যের তাঁর বড়োই অভাব। ঠিক এর বিপরীত, জগদীশচন্দ্র চান, মনের সৃষ্টির সমস্ত শক্তিগুলোকে তরুণদের মধ্যে উদ্দীপ্ত করা হোক। এই শক্তিগুলো সর্বজনীন প্রকৃতির স্বর্গীয় পরিকল্পনার অঙ্গ, অপরিহার্য অঙ্গ। তরুণ বংশধরদের মাধ্যমে সৃষ্টির এই অবিশ্রান্ত উৎসার ছাড়া প্রকৃতি ঝিমিয়ে যায়, ঘুমিয়ে পড়ে এবং অসাড় হয়ে পড়ার ভয় থাকে। শেষ দিন পর্যন্ত তাকে তরুণ থাকতে হবে এবং চিরকাল থাকতে হবে নবতারুণ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে।

www.pathagar.com

গুরুশিষ্যের নিরন্তর সম্পর্ক থাকায় এই ভারতীয় তরুণদের তিনি ভালো জানেন। তিনি বললেন, এদের মধ্যে বাঙ্গালি তরুণদের কল্পনাশক্তির আগুন আছে! স্বতঃলব্ধ বোধের প্রতিভা আছে। কিন্তু এদের অভাব হল, দীর্ঘকাল ধরে কাজে রূপায়িত করার ধৈর্যের। তার কারণ নিঃসন্দেহে দৈহিক। ভয়ংকর দুর্বল-করা এক জলহাওয়া তাদের শক্তিকে ক্ষয় করে দেয়। ভারতবর্ষের অন্য জাতিগুলো অনেক কম প্রতিভাসম্পন্ন হলেও আরও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালাতে সমর্থ এবং তারা বাঙালির চেয়ে ভাল কাজের লোক। এখানে কত ইউরোপীয় তরুণ কলকাতার বসু-বিজ্ঞানমন্দিরে কাজ চাইছে এবং খুব শিগগিরই তারা সেখানে ঢুকতে চলেছে। মনের কর্মে সমগ্র মানবতাকে যুক্ত করতে হবে, ঐক্যবদ্ধ করতে হবে : জগদীশচন্দ্রের এই অন্তরতম আকাঙ্ক্ষায় তারা সাড়া দিয়েছে।

১০ জুলাই তারিখেই জেনেভা থেকে জগদীশচন্দ্র বসু লিখেছেন :

'প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু, আপনার সুন্দর বাড়িটিতে আপনার সঙ্গে দেখা করা এবং যা কিছু সত্য ও সুন্দর তার সংস্পর্শে আসা এক বিরাট সুখ। একমাত্র এরাই টিকবে...

৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও লেডী বসুর আগমন। (লা কলিনে স্বল্পদিনের এক চিকিৎসা করিয়ে এলেন।) আগের চেয়ে তিনি অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও উচ্ছল। আমার বোন যাতে তাঁর কথাগুলো তর্জমা করতে পারেন তার জন্য একটু একটু থামতে না হলে এক নিঃশ্বাসে দু'ঘণ্টা কথা বলে যেতে থামতেন না। সুন্দর ভারতীয় পোশাকে ধীরস্থির লেডী বুস হাসিমুখে শুনে চলেন, শুধু একটা-দুটো কথা সংশোধন করে দেবার জন্য ঠোঁট ফাঁক করলেন। জগদীশচন্দ্রের একথা বলার সঙ্গত কারণ আছে; 'কর্মতৎপরতায় আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে আমি দশটা ইউরোপীয়কে চ্যালেঞ্জ করি।' তিনি ক্ষত্রিয়বর্গের এক অতি বড় প্রতিনিধি, বিবেকানন্দও এই একই ক্ষত্রিয়বর্গের ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি বিবেকানন্দকে জানতেন...তিনি বললেন : 'এই যেমন বিনয়ের ব্যাপারে তাঁর আতিশয্য ছিল না।' জগদীশচন্দ্রেরও নেই, কিন্তু তাঁর মূল্যের এই চেতনা স্বাভাবিক ও ন্যায্য। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা এই চেতনাকে সহমর্মী করে তোলে। সাদৃশ্যের অপর লক্ষণ : বিবেকানন্দ বলতেন, দারিদ্র্য ও ত্যাগের সমর্থন যেমন খুব ভালো তেমিন খুব ভালো ঐশ্বর্য ও রাজকীয় জীবনযাত্রার পক্ষ সমর্থন করাটাও। সব কিছুরই সময় আছে। আজ আমীর, কাল ফকির। জগদীশচন্দ্র উচ্চকণ্ঠে ঐশ্বর্য, ভোগ, জয়, সক্রিয় ও উজ্জ্বল সমস্ত শক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করলেন, কিন্তু তা নিজের জন্য নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের জন্য। মানুষের জন্য। গান্ধীর তপশ্চর্যায় ও প্রকৃতিতে বা সরল জীবনে ফিরে যাবার বাণীর প্রতি তার কোনোই সহানুভূতি নেই। তিনি সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার অতিশক্তিশালী মূর্ত প্রকাশ, সেইজন্য প্রগতির পিছনে না ফিরে কেবলই সামনে এগিয়ে চলার ঘোষিত প্রবক্তা না হয়ে পারেন না। তিনি ভারতবর্ষের বৃহৎ

www.pathagar.com

শিল্পবিকাশের পক্ষে। বললেন, একে আটকাতে ব্যর্থ হয়ে গান্ধীর খদ্দর কেবল জাপানি নকল মাল ডেকে আনার কাজে লাগছে। জাপান এরই মধ্যে পাকা হাতে তৈরি করা মেকি 'মেড ইন টোকিও' খদ্দরে ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেলেছে। জাতীয় গর্ব কিন্তু শুধু ভারতীয় নয়, বাঙালি-গর্ব... তার মধ্য থেকে বিদ্যুতের মতো ঝলসে ঝলসে ওঠে। বুঝতে পারা যায় যে তাঁর মনের মধ্যে অবশ্য আছে বাঙালি চরিত্রের বীর্যহীনতা এবং অশ্যই তথাকথিত ভীরুতা সম্পর্কে ইংলন্ডের (বিশেষত কিপলিঙের) দারুণ আপমান। বাংলাদেশের যে বিপুল দৈহিক ও মানসিক ঘুমন্ত শক্তি আছে তিনি তার সাক্ষ্য দিলেন এবং আমাদের কিছু কিছু দৃষ্টান্তও দেখালেন। আমাদের বললেন : 'একটা জাতিকে বীর বা ভীরু যা বলা হয়, সে তাই।' যেদিন থেকে নিজের সাহস সম্পর্কে বাংলাদেশের চেতনা হয়েছে সেদিনই সে তা পেয়েছে। তিনি আমাদের সাম্প্রতিক কালের (রাজনৈতিক কারণে) ফাঁসির আসামীদের কাহিনী বললেন – ফাঁসির হুকুম পাওয়ার পর থেকে ফাঁসি হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাদের যেন বয়স কমে যায়, শরীর ভালো হয়ে ওঠে...জগদীশচন্দ্র বললেন সম্প্রতি ইংল্যান্ড যখন ভারতবর্ষকে সামরিক নির্যাতনের ভয় দেখিয়েছিল, বন্দুকের গুলি ও গোলার টুকরো লাগলে কী হতে পারে, তা নিয়ে বাংলাদেশে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করা হয়েছিল এবং ভারতীয় জনগণ আগে থেকে তার স্বাদ পেয়েছিল যাতে এসবে অভ্যস্ত হতে পারে।

আমি জগদীশচন্দ্রকে 'রাজযোগ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। ... আমার মতোই একই বৈজ্ঞানিক কিন্তুভাব নিয়ে জগদীশচন্দ্র এ বিচার করতে পারেন বলে মনে হয়। তাঁর বিশ্বাস 'রাজযোগে' বিরাট শক্তিলাভ সম্ভব, তবে একটা সীমার বাইরে নয়। অরবিন্দের উচ্চতর প্রতিভার প্রতি পুরোপুরি শ্রদ্ধা জানিয়েও বিশ বছরে দীর্ঘ নির্জনবাসে ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য যে অলৌকিক ফলের আশা করেছেন সে-সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র সংশয় প্রকাশ করলেন। তিনি যোগের মাধ্যমে যদি এমন অলৌকিক ব্যাপার সম্ভব হত তা হলে প্রাচীন ঋষিরা কেন তার ব্যবহার করলেন না তা বোঝা যায় না। আমি ঠিক এই রকমই ভাবি।

তাঁর উচ্ছ্বসিত একালাপের মুখ্য বিষয় আর সেইটিই তাঁর নিরন্তর আনন্দ, সেইটিই স্বাভাবিক– তাঁর বিপুল বৈজ্ঞানিক কর্ম বছরের পর বছর, মাসের পর মাস, তিনি একটার পর একটা আবিষ্কার করে চলেছেন এবং তাঁর প্রতিভা এমনই শাণিত হয়েছে যে, তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক দীর্ঘ পরম্পরা কোথায় নিয়ে যাবে তা যথাযথ মাত্রায় অনুমান করতে চোখের একবার দেখাই যথেষ্ট। বর্তমানে তিনি তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মোড় ঘুরিয়েছেন উদ্ভিদের নিরাময় ক্ষমতার গবেষণার দিকে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের আত্মীয়তা উপলব্ধি করে উদ্ভিদের মধ্যেই গুপ্তবস্তু ও প্রতিকারের উপায় খুঁজতে যাচ্ছেন, এখনও পর্যন্ত যা খোঁজা হয় শুধু প্রাণীর মধ্যে। উদ্ভিদের মধ্যে তিনি সংক্রামক রোগের বীজের অনুশীলন করেছেন, উদ্ভিদ থেকে সিরাম ও

www.pathagar.com

টিকা তৈরি করেছেন এবং উদ্ভিজ্জ সংক্রমণ থেকে তিনি বিশেষভাবে হৃদ্‌যন্ত্র ও পাকস্থলীর উপরে সবচেয়ে বিস্ময়কর ভেষজ ফলাফল পেয়ে গেছেন। এইভাবে তিনি হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়া একটি ব্যাঙের জীবন এবং তা আরও জোরালভাবে সঞ্চার করতে পেরেছেন। ভিয়েনায় তাঁর অভিজ্ঞতা হাতেকলমে বড়ো বড়ো চিকিৎসকের সামনে দেখিয়ে এসেছেন। তাঁরা এতে বিস্মিত হয়েছেন। প্রতিটি অঙ্গের সম্পর্কেই তিনি গবেষণা চালিয়ে যাবেন এবং মনে করছেন তারপরেই ক্যানসারের চিকিৎসা বার করে ফেলবেন। এরই মধ্যে একটি ফল পেয়ে গেছেন : উদ্ভিজ্জ টিকা বেশি জোরাল ও বিশুদ্ধ। উদ্ভিদের শক্তি প্রাণীর চেয়ে উচ্চস্তরের, তা সংগ্রহ করা যায় এবং সংগ্রহ করতে হবে। অতঃপর জগদীশচন্দ্র ফিরে আসেন মহাজাগতিক ঐক্যের মূলগত বিশ্বাসে, এই ঐক্যকে প্রামাণ করেন জগতের প্রতিটি কোষে, কোনো কোনো শৃঙ্খলার সঙ্গে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত কিছুরই সাধারণ লক্ষণ : সংকোচনতা, সঞ্চারণতা (যদি এক জায়গায় স্পর্শ কর যায় সর্বত্র তার প্রক্রিয়া হয়।) এবং ছন্দ। এবং আদিম উৎস মাটির যত বেশি কাছাকাছি এদের শক্তি তত বেশি সম্পূর্ণ, তত বেশি বিশুদ্ধ।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩০। স্যার জগদীশচন্দ্র বুস ও লেডি বুস খেতে এসেছেন। তাঁরা তেরিতে-য় কলিনে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন, কয়েক দিনের মধ্যেই ভারতবর্ষে রওনা হবেন। জগদীশচন্দ্র একটুও পাল্টান নি, তাঁর তরুণসুলভ প্রাণশক্তি তেমনি অক্ষুণ্ন আছে। কিন্তু পুরোপুরি মন জুড়ে আছে ভারতবর্ষ ও তার সংগ্রামের চিন্তা, তাতে তিনি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন। আর কিছুই তিনি ভাবতে পারছেন না। তাঁর সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। যে-দু'ঘণ্টা আমাদের সঙ্গে রইলেন, আমাদের কথাবার্তার একমাত্র বিষয় ছিল এইটে। নিঃসন্দেহে তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অন্য ধাতুতে গড়া। আমি স্বীকার করছি, তাঁকে আমার বেশি মনে ধরে। তিনি উদ্বেগ ও নৈরাশ্য প্রকাশ করলেন। তিনি ভালোই জানেন যে ভারতবর্ষ জিতবে। কিন্তু তিনি ভাবছেন অপরিসীম দুঃখভোগের কথা – আজকের, আগামীকালের। তিনি দেখেছেন ইংলন্ডের হাতে ভারতবর্ষ শিক্ষাহীন, নির্মমভাবে নির্যাতিত, বাকরুদ্ধ ও অন্ধ। তাঁর জিজ্ঞাসা – যাঁদের উপর তাঁর আস্থা আছে সেই দু'জন রাজনৈতিক নেতা গান্ধী ও অত্যন্ত অসুস্থ মতিলাল নেহরুর মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের কি হবে? যে-জাতি নিজেকে স্বাধীন করে, পুণর্জীবিত হয়ে ওঠে, তার প্রত্যাশিত সঞ্চিত শক্তি সম্পর্কে তাঁর আস্থা জাগাবার চেষ্টা করলাম। আমি মাজিনির ইতালির, বিপ্লবী ফ্রান্স ও রাশিয়ার বীরোচিত দৃষ্টান্ত তাঁকে দিলাম...

বিদায় নিতে গিয়ে তিনি আবেগের সঙ্গে কামনা করলেন আমি যেন তাঁর জাতি ও জগতের মঙ্গলের জন্য অনেক দিন বেঁচে থাকি।

অবন্তীকুমার সান্যাল কর্তৃক মূল ফরাসি থেকে অনূদিত এবং র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলিকাতা, প্রকাশিত রম্যাঁ রলাঁর 'ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী (১৯১৫-১৯৪৩)' থেকে সংকলিত।

www.pathagar.com

এ কী সমাপন !

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির ফ্লোরা ও ফোনা প্রকল্প, বাংলাদেশ জীব-ইতিহাস জ্ঞানকোষের প্রকাশনা অবশেষে সরকারি আমলাতান্ত্রিক জটিলতার গাঁটে আটকা পড়ে গেল। সরকারি অনুদানে ইতিপূর্বে এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাপিডিয়া ও 'বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা' অনেকটা নির্বিঘ্নেই প্রকাশ করেছে। বিপত্তি ঘটল এই প্রথম এবং তা ঘটল এমন একটি কর্মযজ্ঞে যা এই উপমহাদেশে বিরল, হয়ত নজিরবিহীনও। ২৮ খণ্ডের (১৪ খণ্ড উদ্ভিদ ও ১৪ খণ্ড প্রাণীবিষয়ক) এই গ্রন্থমালায় আছে ব্যাকটেরিয়া ও শৈবাল থেকে বটবৃক্ষ এবং অ্যামিবা এবং উল্লুক পর্যন্ত ১২,২৬৯ প্রজাতির (উদ্ভিদ ৬,৭৫২, প্রাণী ৫,৫১৭) সচিত্র বর্ণনা অর্থাৎ বাংলাদেশের গোটা জীবকুলের ইতিবৃত্ত।

প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল ২০০৪ সালের অক্টেবরে। শেষ হওয়ার কথা ২০০৯ সালের জুন মাসে। বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীদের নিরলস শ্রমে ইংরেজি ২৮ খণ্ড ও বাংলা ২৮ খণ্ডের ৭ খণ্ড যথাসময়েই প্রকাশিত হয়েছিল। এটুকুই অসাধ্য সাধন। তাই বর্তমান সরকার বাংলা সংস্করণের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সময় বাড়ায় ২০০৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু বাংলা সংস্করণের উপকরণ গ্রন্থনা শেষ হওয়ার মুখে হঠাৎ করেই ডিসেম্বরের শুরুতে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এই প্রকল্পের অর্থপ্রদান বন্ধ করে দেয়। কারণ, সরকারের কিছু নতুন দাবি সোসাইটির কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের ওপর অযৌক্তিক সরকারি হস্তক্ষেপের অনেক ভোগান্তির অভিজ্ঞতা আমাদের আছে, কিন্তু আওয়ামী লীগের মতো একটি প্রগতিশীল সরকারের কাছে তা বড়ই অপ্রত্যাশিত।

এই প্রকল্পের বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক গুরুত্বের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তবে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে পরিবেশ বিপর্যয় ও জীববৈচিত্র্য হ্রাসের পটভূমিতে জীববিদ্যা, বিশেষত টেক্সোনমি বা শ্রেণীকরণবিদ্যা আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ২৮ খণ্ডের ইংরেজি ও বাংলা জীব-ইতিহাস প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ে গবেষণা, নীতিনির্ধারণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কতটা সহায়ক হতে পারে, তা বুঝতে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন পড়ে না। কলমের এক খোঁচায় এমন একটি মহৎ উদ্যোগ দাবিয়ে দেওয়াকে কী বলে আখ্যায়িত করা যায়, জানি না।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গত, নিজের সামান্য অভিজ্ঞতার কথা বলি। মধ্য-পঞ্চাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা পড়ার সময় বাংলাদেশের গাছপালার একটিমাত্র বই-ই আমাদের ছিল– ডেভিড প্রেইনের দুই খণ্ডের *বেঙ্গল প্লান্টস*, বহুল ব্যবহারে অতি জরাজীর্ণ এবং ছাত্রছাত্রীদের ছুঁতে মানা। সেই সময় জন্মভূমির লাগোয়া পাথারিয়া পাহাড়ের উদ্ভিদকুল নিয়ে কাজ করার স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু তৎকালে এ ধরনের কাজ তত্ত্বাবধানের মতো যোগ্য বিশেষজ্ঞের প্রকট অভাব ছিল, বইপত্রেরও।

সেই পাহাড় আজ বনশূন্য। কাজটি এখনও সম্ভব, কিন্তু তা হবে সেকালের তুলনায় অসম্পূর্ণ। কেননা অনেক প্রজাতি ইতিমধ্যেই লোপ পেয়েছে। আমার প্রথম চাকরি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে। আমরাই সম্ভবত বেসরকারি কলেজে প্রথম উদ্ভিদবিদ্যার স্নাতক কোর্স চালু করি। লেগে যাই গাছপালা সংগ্রহের কাজে, কিন্তু অচেনা প্রজাতি শনাক্তকরণ নিয়ে বিপদে পড়ি। 'বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া' তখন প্রেইনের বইটির নতুন সংস্করণ ছাপিয়েছে জেনে তাদের একটা চিঠি লিখি। কয়েক মাস পর বরিশালের ডিসি অর্থাৎ জেলা প্রশাসক আমাকে ডেকে পাঠান এবং সরকারকে না জানিয়ে এই চিঠি লেখার জন্য ভর্ৎসনা করেন। এভাবেই শ্রেণীকরণবিদ্যা নিয়ে আমার গবেষণার জলাঞ্জলি। বলা বাহুল্য, এমনটি অন্যদের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকবে।

মার্কিন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ হেনরি অ্যাডামস বলতেন, একজন শিক্ষকের প্রভাব কতটা দূরগামী, তিনি নিজেও তা জানেন না। বইয়ের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। একটি বই একজন মানুষের জীবনের গোটা ছকটাই পালটে দিতে পারে। প্রেইনের বইটির খণ্ডদুটি যথাসময়ে পেলে বিজ্ঞান লেখক হওয়ার বদলে হয়ত বিজ্ঞানী হতাম এবং পাথারিয়া পাহাড়ের উদ্ভিদকুলের অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ একটি ইতিবৃত্ত লিখতে পারতাম। অন্যরা আরও বড় বড় কাজ করতে পারতেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ২৮ খণ্ডের 'বাংলাদেশের জীবকুল জ্ঞানকোষ' গ্রন্থমালার গুরুত্ব অনুধাবনীয়। উল্লেখ্য, শুধু জীবকুলের শ্রেণীকরণ গবেষণার সহায়তাই নয়, এই গ্রন্থমালার প্রভাব হবে বহুমাত্রিক ও সুদূরপ্রসারী। আশা করি, সরকার বিষয়টি সত্বর পুনর্বিবেচনা করবে এবং উদ্যোগটি অচিরেই বাধামুক্ত হবে।

২০১০

www.pathagar.com

জঙ্গি জে. বি. এস.

এক

অধ্যাপক জে. বি. এস. হ্যাল্ডেন ১৯৬৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নিজের মরণোত্তর স্মরণিকা রচনা করেন। ক্যান্সার অপারেশনের পর জীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা দিলেও আসন্ন মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা তখনো প্রকট হয় নি। আসলে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রতি অধ্যাপক হ্যাল্ডেনের এক ধরনের প্রবণতা ছিল যেজন্য তিনি দুঃসাহসী এক অভিযাত্রীর চারিত্র অর্জন করেছিলেন। সৃজনশীল এই বিজ্ঞানীর অন্বেষণ শুধু গবেষণাগারের চৌহদ্দিতেই নয়, জীবন ও সমাজ সম্পর্কিত বহু বিপজ্জনক পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও ব্যাপ্ত হয়েছে। তিনি নিজ দেহে বিষক্রিয়া পরীক্ষা করেছেন, সাবমেরিন নিয়ে গভীর জলে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন, স্পেনের গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং প্রথম যৌবনে ভারত-প্রেমের দরুন বার্ধক্যে সে-দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। অধ্যাপক হ্যাল্ডেন বিংশ-শতকের প্রবলপ্রাণ বহুমাত্রিক রোমান্টিক ব্যক্তিত্বের অন্যতম, যারা অতৃপ্তির প্রাবল্যে বহু বৃত্ত পরিক্রম করেও কখনোই শূন্য হাতে ফেরেন নি। বিজ্ঞানের ননা বিষয়ে মৌলিক অবদানের জন্যই শুধু নয়, ইতিহাসের অগ্রগতি সাধনে তার প্রত্যক্ষ ভূমিকার জন্যও তিনি স্মরণীয়।

পূর্বোক্ত তথ্য স্মরণিকে অধ্যাপক হ্যাল্ডেনের উল্লিখিত স্বীয় কর্মকাণ্ডের তালিকাটি নিম্নরূপ :

১. ১৯৩২ সালে আমিই সর্বপ্রথম মানুষের একটি জিনের মিউটেশন হার নির্ণয় করি।

২. ১৯৪২ সালে আমি ও ড. কেইস ছোট এক সাবমেরিনে জলের নিচে ৪৮ ঘন্টা কাটিয়েছিলাম। সেখানে শ্বাসচলাচল ব্যবস্থার জন্য আমাদের আবিষ্কৃত একটি যন্ত্র ব্যবহার করি। এ ধরনের পরীক্ষা এই প্রথম। যে-অক্সিজেন প্রাণের আধার তা যে উচ্চচাপে বিষে পরিণত হয় আমরা সেখানেই তা প্রথম আবিষ্কার করি।

৩. ১৯৩৩ সালে নাৎসি জার্মানি থেকে আমাদের দেশে আসা বহু উদ্বাস্তুর অন্যতম ছিলেন চেইন। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমি তাঁকে অক্সফোর্ডে ফ্লোরির সঙ্গে দেখা করতে বলি। চেইন তা-ই করেছিলেন।

www.pathagar.com

আপনারা জানেন, পেনিসিলিন পৃথকীকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য তাঁরা শেষে নোবেল পুরস্কার পান।... এ আবিষ্কারের জন্য আমার কোন কৃতিত্ব নেই, কিন্তু এ সাফল্যের একভাগের অর্ধেকও আমার প্রাপ্য হলে অবশ্যই আমি কয়েক হাজার লোকের জীবন রক্ষা করেছি।

অতঃপর সমাপ্তি টেনেছেন এই বলে যে 'আগামী একশ বছরেও আমি বিস্মৃত না হলে আমাকে এমন কিছুর জন্যই মনে রাখা হবে যা এখানে উল্লিখিত হয় নি।'

স্বাভাবিক কারণেই স্বীয় মূল্যায়নে অধ্যাপক হ্যান্ডেন অত্যন্ত বিনয়ী। এ স্মরণিকের শুরুতেই তিনি নিজেকে 'ডেবলার' বা পল্লবগ্রাহীরূপে শনাক্ত করেছেন। তাঁর মতো প্রতিভাবান বহুমুখী মনস্বী বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতের পক্ষেই শুধু এমন বিনয় সম্ভব। তাঁর অন্যান্য স্মরণীয় অবদান :

৪. স্বেচ্ছায় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড পান করে অম্লজাত বিষক্রিয়া ও নিঃশ্বাসরোধসহ বিবিধ শারীরবৃত্তীয় উপসর্গ নিরীক্ষণ।

৫. অঙ্কুরিত চারা, মথ ও ইঁদুরের মধ্যে 'সাইটোক্রম অক্সিডেস' নামক উৎসেচক আবিষ্কার। এই উৎসেচক রসায়নবিদ্যায় এটি স্থায়ী অবদান।

৬. ১৯২৪ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে লিখিত 'প্রাকৃতিক' ও 'কৃত্রিম' নির্বাচনের গাণিতিক তত্ত্ব সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলি।

৭. 'প্রাইমুলা সায়নেন্সিস' নামক বাহারি উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা এবং দ্বিগুণ সংখ্যক ক্রমোজম সম্বলিত এ উদ্ভিদে 'লিংকেজ' আবিষ্কার।

৮. ৬ এ.টি.এম.-এর অধিক চাপে অক্সিজেনের স্বাদ নির্ণয়।

৯. গাণিতিক পরিসংখ্যানতত্ত্বে মৌলিক অবদান।

১০. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৫৬ সাল অবধি গামারশ্মি ও অন্যান্য মিউটেশন উৎপাদক উপকরণ নিয়ে ইঁদুরের উপর পরীক্ষা এবং হন্তারক মিউটেশনের হার নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার।

অথচ বিজ্ঞানে তাঁর কোন ডিগ্রি ছিল না। ব্রিটেনের প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে তিনি জীবরসায়ন, বংশাণুবিদ্যা ও জীবগণিত (বায়োমেট্রি) নিয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায় 'যুদ্ধের আগে প্রথম আমি অক্সফোর্ডে গণিত ও গ্রিক-লাতিন নিয়ে পড়াশোনা করি... অথচ বিজ্ঞানের গবেষণা কিংবা অধ্যাপনায় আমার কোন অসুবিধা হয় নি... ভারতীয় পাঠকদের কাছে এটা অবিশ্বাস্য মনে হবে যে, আমি শারীরতত্ত্ব কিংবা বিজ্ঞানের কোন শাখার ডিগ্রি ব্যতিরেকেই শারীরতত্ত্বে অধ্যাপক নিযুক্ত হই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আর্যভট্টের পর ভারতের শ্রেষ্ঠতম গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজের কোন ডিগ্রি ছিল না এবং আজ বেঁচে থাকলে স্বদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে তার পক্ষে চাকরি সংগ্রহ অসম্ভব হত।'

www.pathagar.com

দুই.

জে. বি. এস. হ্যাল্ডেনের জন্ম ১৮৯২ সালে। পিতা জে. এস. হ্যাল্ডেন শারীরতত্ত্ববিদ, শিক্ষক, গবেষক, খনিবিদ্যা ইন্সটিটিউটের সভাপতি এবং গিফোর্ড বক্তৃতামালার অন্যতম বক্তা (বক্তৃতার বিষয় ছিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আরোপিত গুণাবলি)। জে. বি. এস. -এর ভাষায় 'আমার বিজ্ঞানশিক্ষার শুরু প্রায় দু'বছর বয়স থেকে যখন আমি বাবার ল্যাবরেটরির মেঝের ওপর বসে বসে তাঁকে পরীক্ষার জটিল খেলায় নিবিষ্ট দেখতাম।' আট বছর বয়সে এখানেই তার অঙ্কে হাতেখড়ি। অতঃপর বুরেট ধোয়া, ব্যবহৃত গ্যাসের সংখ্যা ও পরিমাণ লিখে রাখা এবং মিশ্রণ তৈরির কাজে ক্রমান্বয়ে পদোন্নতি। শেষে হলেন গবেষণা-নিবন্ধ রচনাকালে পিতার পরামর্শদাতা এবং ক্লাসে যাবার আগে তার বক্তৃতার একক শ্রোতা। স্কুলে গ্রিক ও লাতিনের বদলে তিনি রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস ও জীববিজ্ঞান পড়তে চাইলে প্রধান শিক্ষক তার নিশ্চিত 'ডেবলার' পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তার ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল, অবশ্য ভিন্নার্থে। ষোলো বছর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে গবেষণা শুরু করেন এবং সতেরো বছর বয়সেই তার প্রথম গবেষণা-নিবন্ধ শারীরবৃত্ত সমিতিতে পঠিত হয়। ১৯১১ সালে অক্সফোর্ডে গণিতে অনার্সের ছাত্র, কিন্তু জীববিজ্ঞানের ক্লাসেও অবসর সময়ে পাঠ নিতেন। এ বছরই মেরুদণ্ডী প্রাণীর 'জিন-লিংকেজ' সংক্রান্ত একটি তথ্য আবিষ্কার করেন এবং পরে তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে তা ১৯১৬ সালে নিবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯১২ সালে তিনি গ্রিক-লাতিন কোর্সে ভর্তি হন। সমকালীন দর্শন ও প্রাচীন ইতিহাস তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১৪ সালে গণিতসহ এসব বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভের পর শারীরবৃত্ত অধ্যয়নের জন্য মনস্থির করেন। কিন্তু তখনই শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, গেলেন সৈন্যদলে এবং বিজ্ঞানপাঠের এখানেই ইতি।

যুদ্ধ থেকে ফিরে তিনি অক্সফোর্ডের নিউ কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন এবং কোন ডিগ্রি ছাড়াই সেখানে শারীরবৃত্তে অধ্যাপনা শুরু করেন। এ সময়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন 'ভালো শিক্ষক অবশ্যই ছিলাম। প্রতি সপ্তাহে আমাকে ক্লাস নিতে হত ২০-৩০ ঘণ্টা... এরই মধ্যে পড়াশোনা ও গবেষণার জন্য সময় খুঁজতে হত।'

১৯২২ সালে অধ্যাপক হপ্‌কিনের (পরে নোবেল বিজয়ী) আমন্ত্রণে তিনি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার হিসেবে যোগদান করেন। এবার পড়ানোর বিষয় জীবরসায়ন। দশ বছর চাকরির পর ১৯৩৬ সালে আসেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। পড়াতেন জীবগণিতবিদ্যা।

১৯৫৭ সালে তিনি ভারতের নাগরিকত্ব নিয়ে ভারতীয় পরিসংখ্যান ইন্সটিটিউটে যোগদান করেন। বন্ধুরা একে আত্মহত্যা বলেছিলেন। জীবনসায়াহ্নে এরূপ

www.pathagar.com

বেপরোয়া সিদ্ধান্ত কেবল হ্যান্ডেনের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাঁর মতে 'ভারতবর্ষে থাকাকালীন আমার গবেষণাকে আমি সফল ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। অসুবিধা বহু, যন্ত্রপাতির অভাব, জিনিসপত্রও মেলে না... তবু বাইরের কাজে এখানে সুবিধা অনেক। কাজ করা যায় গাছপালা, জীবজন্তু, আর মানুষ নিয়ে। অনেক ভালো ছেলে আছে এদেশে। তারা ক্যাম্ব্রিজের ছাত্রদের মতোই খাঁটি। সম্ভবত যন্ত্রপাতির অসুবিধার কথা মনে করেই অধ্যাপক হ্যান্ডেন ভারতীয় ছাত্রদের বড় আকারের জিনিস নিয়ে কাজ করতে বলতেন। ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি এক জার্মান অধ্যাপকের কথা উল্লেখ করতেন, যিনি মৌমাছির ভাষা নিয়ে বহুখণ্ড গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

তিন.

উৎসেচকতত্ত্ব, জীবরসায়ন, শারীরতত্ত্ব, পরিসংখ্যান, বিবর্তনতত্ত্ব, বংশাণুবিদ্যা, সৃষ্টিতত্ত্ব, বিজ্ঞানের সামজতত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতি, মানুষের প্রতিবেশ ইত্যাকার বিষয়ে মৌলিক গবেষণা ও প্রবন্ধ রচনা ছাড়াও জে. বি. এস. ছিলেন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য, পার্টির মুখপত্র 'ডেইলি ওয়ার্কার' সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি (যুদ্ধের সময়) এবং মার্কসবাদের একনিষ্ঠ প্রচারক। গবেষণা, অধ্যাপনা ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনার এক সংশ্লেষ তাঁর জীবন, সেগুলো স্পষ্টতই ব্যতিক্রমী ধরনের। চেইন ও ফ্লোরির মধ্যে যোগাযোগ ছাড়াও তাঁর মতে জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি নাকি স্পেনের গৃহযুদ্ধে (১৯৩৬-৩৮) অংশগ্রহণের পুরস্কারস্বরূপ মাদ্রিদের নাগিরকত্ব লাভ। তিনি ছিলেন বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ও রাসায়নিক যুদ্ধ সম্পর্কিত রিপাবলিকান সরকারের উপদেষ্টা। তার ভাষায় 'আমি এক হাজার বছর বেঁচে থাকলেও ১৯৩৬ সালের বড়দিনটিই আমার জীবনের স্মরণীয়তম ঘটনা হয়ে থাকবে, যেদিন আমি মাদ্রিদের নাগরিকত্ব লাভ করেছিলাম।'

ভারতে অবস্থানকালীন কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নেও সেই একই মানসিকতা লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন '১৯৫৭ সালে ভারতীয় পরিসংখ্যান ইন্সটিটিউটে কাজ করতে আসি এবং এজন্য অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ ধন্যবাদার্হ... আমি নিজে সেখানে তাত্ত্বিক বিষয়ে দুটি গবেষণা সম্পূর্ণ করি যার কিছুটা স্থায়ী মূল্য আছে। তাছাড়া যেসব গবেষণা করেছি সেগুলো তেমন উল্লেখ্য নয়... কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে সেখানে আমার শ্রেষ্ঠতম কাজ এস. কে. রায়, কে. আর. দ্রনামার্জুন, টি. এ. ডেভিস ও এ. ডি. জয়কারকে বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্যদান। আমার মতে তারা একদিন বিশ্বখ্যাত হবে। এক্ষেত্রে বিচারক হিসেবে আমি আস্থাভাজন হতে পারি, আমার বিশ

www.pathagar.com

জন ছাত্র এফ. আর. এস.।' অধ্যাপক হ্যান্ডেন শুধু উৎসেচকবিদ হিসেবেই নয়, সমাজজীবনে নিজেও উৎসেচকের ভূমিকা পালন করেছেন। যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের সংযোগ, সে মানুষই হোক আর ঘটনাই হোক, অধ্যাপক হ্যান্ডেন সেখানে কোনো ভুল করেন নি। এ সম্পর্কে তাঁর বোন (ছাত্রজীবনে যিনি তাঁর সঙ্গে ইঁদরের লিংকেজ পরীক্ষায় শরিক হয়েছিলেন) নোয়ামি মিট্‌চিন্সন লিখেছেন 'জেক* সাঁতার ভালবাসত। সে আমার নাতি গ্রেহামের সঙ্গে প্রায়ই সাঁতার কাটত। স্কুলে গণিতের দু-একটি বই ছাড়া গ্রেহামের কিছুই ভাল লাগত না। আমার ভাই তার সঙ্গে গণিত সম্পর্কে আলাপ করল আর তার সামনে একটি বন্ধ দরজা খুলে গেল। গ্রেহাম সেপথেই বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করল আর আজও ওখানেই আছে।' অধ্যাপক হ্যান্ডেন সেই পরশমণির সন্ধান জানতেন যার ছোঁয়ায় পাথর সোনা হয়ে ওঠে।

চার.

'আমি কী চাই' (১৯৪০) প্রবন্ধে অধ্যাপক হ্যান্ডেন নিজের চাহিদার এক নাতিদীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন যা তাঁকে বোঝার জন্য কিছুটা সহায়ক হবে।

১. জগৎকে তার নিজের মতোই গ্রহণ করা উচিত। অসম্ভব প্রত্যাশা থেকে আমাকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। নিখুঁত পৃথিবীতে নিখুঁত মানুষ আশা করলে তাতে ভালোর চেয়ে মন্দই হবে বেশি।

২. কাজ ও কাজের জন্য মানানসই বেতন। অ্যারিস্টটলের মতে সুখ আরামের যোগফল নয়, সুখ হল নির্বিঘ্ন কর্মকাণ্ড। আমি সেই কাজ চাই যা কঠিন কিন্তু কৌতূহলী এবং যার ফলাফল দেখা আমার পক্ষে সম্ভব।

৩. আমি অধিকতর বাকস্বাধীনতার পক্ষপাতী। লর্ড ব্লাঙ্ক-এর সংবাদপত্র, মি. ডেস-এর পিল এবং স্যার জন অ্যাস্টারিক্স-এর বিয়ার যে বিষাক্ত এ সম্পর্কে যা ভাবি তাই লিখতে চাই। কিন্তু এ কাজে মানহানির আইন আমার প্রতিপক্ষ।

৪. চাই আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু... এবং কাজের ক্ষমতা হারালে মৃত্যু।

৫. আমি বিজ্ঞান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আমার সহকর্মী ও কমরেডদের বন্ধুত্ব কামনা করি। আমি সমতুল্য মানুষের সমাজে বসবাস করত চাই যারা আমার সমালোচনা করবে এবং যাদের আমিও সমালোচনা করব। সেই মানুষের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অসম্ভব যার আদেশ আগে বা পরে বিনা সমালোচনায় আমাকে পালন করতে হবে অথবা যে একইভাবে আমার আদেশ পালন করবে। যে-মানুষ আমার চেয়ে অনেক বেশি ধনী বা গরিব তার সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার পক্ষে সহজ নয়।

www.pathagar.com

৬. বিপদহীন জীবন সরষে ছাড়া গোমাংসের মতোই বিস্বাদ। যেহেতু আমার জীবন অন্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় সেজন্য পর্বতারোহণ বা মটর-রেসে যোগ দেয়া আমার পক্ষে উচিত নয়। শারীরবিদ হিসেবে আমার নিজের ওপর এজন্য পরীক্ষা চালান সম্ভব আর সেই যুদ্ধ ও বিপ্লব আমি সমর্থন করি যেখানে আমিও শরিক হতে পারি।

৭. নিজের জন্য একটি ঘর, কিছু বই, ভাল তামাক, একটি গাড়ি এবং রোজ গোসল ব্যবস্থা থাকলে ভালোই হয়। তাছাড়া একটি বাগান, গোসলের পুকুর, কাছে কোন নদী বা সমুদ্র সৈকতও আমার পছন্দ। কিন্তু এগুলোর কিছুই আমার নেই, এ নিয়ে আমার কোনো দাবিও নেই এবং এ ছাড়াই আমি দিব্যি সুখে আছি।

৮. আমি যা চাই তার অনেক কিছুই আমি পেয়েছি। কিন্তু আমার অনেক বন্ধুই জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত। তারা অসুখী থাকলে আমার পক্ষে পুরোপুরি সুখী হওয়া অসম্ভব।

৯. পৃথিবীর সকল সুস্থ নরনারীকে আমি কর্মরত দেখতে চাই। সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে সর্বত্রই (সুইডেনে খুবই কম) বেকারি আছে। যেহেতু অন্তত মন্দার সময় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বেকারি তাদের সমাজের ব্যর্থতা হিসেবে প্রকটিত হয় সেজন্য আমি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। আমি চাই শ্রমিকরা তাদের নিজের কাজের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করুন এবং অন্যের মুনাফা তৈরিতে তা ব্যয়িত না হোক... আমি নতুন জীবতাত্ত্বিক তথ্য আবিষ্কার করি, কিন্তু তা অব্যবহৃত থাকে, কেননা এতে সমাজের লাভ হলেও ব্যক্তির মুনাফা সঞ্চয় সম্ভব নয়।

১০. আমি চাই, পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য তাদের জৈবিক প্রয়োজনানুযায়ী এবং বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যার পক্ষে সম্ভবপর মান ও পরিমাপের খাদ্য, আবাস ও চিকিৎসা।

১১. আমি শ্রেণী-আধিপত্যের এবং পুরুষ কর্তৃক নারী অবদমনের শেষ দেখতে চাই। বিপ্লবের জন্য আমি অর্থব্যবস্থার দিকেই তাকিয়ে আছি, কারণ এতেই তার অবসান সম্ভব।

১২. আমার সহকর্মীরা আমার মতোই সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হোন এজন্যই আমি সমাজতন্ত্রী।

১৩. সমাজতন্ত্র এ মুহূর্তেই সব অসুবিধা দূর করতে পারবে না আমি জানি। মৃত্যুর আগে যদি দেখে যেতে পারি ইউরোপে শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করেছে তবে আমি সুখে দু'চোখ বুজব।

www.pathagar.com

পাঁচ

জে. বি. এস. হ্যাল্ডেন সম্পর্কে প্রচলিত একটা ছড়া :

What teacher, can that object be inside a plate glass drum?
It is prof. Haldane whom you see, testing vacuum.
Why are they hurling bombs so bear the shelter made of tin?
That is a bombproof test; I hear prof. Haldane is Within.
Oh look, from you balloon so high what dangles large and limp?
It is prof. Haldane We espy. air-testing from a blimp.
See drifting near the waterside that buoy of strange design!
That is prof. Haldane, tied, decoying mine.
On sea, on shore and in the air, protecting us from harm
Prof. Haldane meets us everywhere, our scientific arm.

ছয়

১৯৬৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রেকর্ড করা হলেও অধ্যাপক জে. বি. এস. হ্যাল্ডেনের ইচ্ছা ছিল এই মরণোত্তর সংবাদ স্মরণিক তার ৮২ বছর বয়সপূর্তি, অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের আগে প্রকাশিত হবে না। কিন্তু বি. বি. সি. টেলিভিশন থেকে তা প্রচারিত হলো ১৯৬৪ সালের ১ ডিসেম্বর। সেদিনই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৭৬

www.pathagar.com

বিজ্ঞানীদের জীবনীপাঠ কেন?

বঙ্গে বিজ্ঞানের পথিকৃৎ বিষয়ে 'সায়েন্স ওয়ার্ল্ড' একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ যেন নিরন্ধ্র অন্ধকারে আলোর স্ফুলিঙ্গের মতোই আশাসঞ্চারী। পশ্চিমের উন্নত দেশে বইয়ের দোকানে বিজ্ঞানীদের জীবন, কর্ম ও তাদের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে বিস্তর বইপত্র দেখি, কিন্তু সেখানকার স্কুলের পাঠক্রমে অনুপ্রেরণা আহরণের উদ্দেশ্যে খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের জীবনী জানার কোন ব্যবস্থা আছে কি? আছে অবশ্যই, তবে আমাদের মতো নয়, পাঠ্যবইয়ের গৎবাঁধা প্রবন্ধ পড়া নয়, তাদের এজন্য বিশেষ প্রকল্প বা প্রজেক্ট দেয়া হয়। তারা লাইব্রেরিতে পড়ে ও জাদুঘর দেখে নিজেই সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহ করে প্রতিবেদন লেখে। আমাদের পক্ষে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে কাজটা কঠিন, আবার কঠিনও নয়, যদি সেভাবে আমরা স্কুল-লাইব্রেরি গড়ে তুলি এবং ছাত্রছাত্রীদের ছুটিছাটায় ঐতিহাসিক স্থান বা জাদুঘরে নিয়ে যাই। দেশে বিদ্যমান ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও অদক্ষতা শিক্ষাব্যবস্থায়ও সংক্রমিত হয়েছে, তাকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে, শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষাচিন্তার বদলি হয়ে উঠছে ব্যবসাচিন্তা, অভিভাকদের কেউ কেউ তাতে মদদ যোগাচ্ছেন, সব মিলিয়ে এক ঘোর দুর্দিন। অনেক বছর আগে ঢাকা থেকে 'শিক্ষাবার্তা' নামের একটি মাসিক প্রকাশিত হওয়ার পর আমি মস্কোয় বসে কয়েকটি সংখ্যা পড়ে দারুণ উচ্ছাসিত হয়ে উঠেছিলাম, ভেবেছিলাম আমাদের প্রত্যেকটি স্কুল কলেজ ওটি সাদরে গ্রহণ করবে, হাজার হাজার কপি বিক্রি হবে। কিন্তু দেশে ফিরে দেখলাম পরিস্থিতি ভিন্নরূপ, পত্রিকাটি কোনক্রমে টিকে আছে সম্পাদক ও জনাকয়েক পরহিতব্রতীর নিরলস চেষ্টায়। 'সায়েন্স ওয়ার্ল্ড' দেখে, পূর্বের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তেমনই আশাবাদী হয়ে উঠেছিলাম। এখনও আশা হারাইনি, কেননা পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে, হতে পারে শিক্ষকদের তুলনায় শিক্ষার্থীরা নবপ্রজন্ম বলেই, নিজেরাই জ্ঞানার্জনে উদ্যোগী হতে শুরু করেছে। আশা করি, সায়েন্স ওয়ার্ল্ডের এই সংখ্যাটি তাদের এই আকাঙ্ক্ষায় খানিকটা অনুঘটকের কাজ করবে।

মনীষীদের জীবন ও কর্ম থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ ও আপন সৃজনশীলতার দিকনির্দেশনা পাওয়া ও সদ্ব্যবহার আদিকাল থেকেই চলছে যেজন্য মানুষ আজও

www.pathagar.com

একজন 'গুরু' খোঁজে। এভাবেই একদা 'ঘরানা' গড়ে উঠেছিল যা আজও চলছে। পশ্চিমা বিশ্বে অবশ্য শিল্পোন্নতি ও জীবনের মানোন্নয়নের সুবাদে এমন পরিস্থিতি অনেকটা বদলে গেছে। ন্যূনতম প্রতিভারও বিনষ্টির আশঙ্কা হ্রাস পেয়েছে, জ্ঞানান্বেষার ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞানে একক ব্যক্তির বদলে দলের অবদান বাড়ছে। কিন্তু আমাদের দেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি ও শিক্ষার সীমাবদ্ধতা এখন ইউরোপের উনিশ শতকের গোড়ার দিকের পর্যায়ে রয়ে গেছে। তাই ব্যক্তিকে এড়ানোর কেন উপায় আমাদের নেই বলে এই উদ্যোগকে জাতীয়তার গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বপরিসরে পরিব্যাপ্ত করতে হবে। আশা করি, 'সায়েন্স ওয়ার্ল্ড' আগামীতে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের নিয়েও একটি বা একাধিক সংখ্যা প্রকাশ করবে, যদিও ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও তেমন প্রচেষ্টার নজির তারা রেখেছেন।

অনেক সময় ভাবি আমার গুরু কে বা কারা? স্কুল জীবনের কথা মনে পড়ে। শিক্ষকদের অধিকাংশ ছিলেন 'বেত বাতিল ছেলে নষ্ট' তত্ত্বে বিশ্বাসী, প্রায় সকলেই বেত নিয়ে ক্লাসে আসতেন। পরিবেশ ভীতিকর তাতে ব্যতিক্রম ছিলেন বাংলার পণ্ডিতমশায়, গল্পচ্ছলে পড়াতেন, হতে পারে তাঁর প্রভাবেই সাহিত্যে আমার আগ্রহ জন্মে। কলেজে রসায়ন-বিদ্যর শিক্ষক এতোটাই প্রভাবিত করেছিলেন যে রাসায়নিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু উচ্চ-মাধ্যমিকে গণিত নিই নি বলে তা আর হয়ে উঠল না। উদ্ভিদবিদ্যা পড়েছিলাম বলতে গেলে আপতিকভাবে। সেই সময় দবজান্স্কি, স্টোবিন্স্ ও মায়রের পাঠ্যবইয়ের সুবাদে ডারউইনের সাথে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। অতঃপর তাঁকে গুরু ধরি এবং এক সময় গুরুর জন্মস্থল ও কর্মস্থলে তীর্থযাত্রাও শেষ করি। আর তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে তিনটি বই লিখি এই আশায় যে আমার ছাত্ররাও আমার দল ভারি করবে, বাংলদেশে গড়ে ওঠে ডারউইন ঘরানা, কিন্তু পরিবেশ বৈগুণ্যে তা আর হল না। সেদিন এক সভায় আমার বন্ধু ড. ম. আখতারুজ্জমান সখেদে জানালেন যে তিনিও অভিন্ন চিন্তাভাবনা নিয়ে *বিবর্তনবিদ্যা* লেখেন এবং ডারউইনের *অরিজিন অব স্পিসিজ* অনুবাদ করেন; কিন্তু কোনই ফল ফলেনি; ত্রিশবছরের অধিককাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন, ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করলে আজও একই জবাব পান – প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে, উৎপন্ন হয়নি, অর্থাৎ বিবর্তনবাদ ও আনুষঙ্গিক তত্ত্ব তাদের প্রথাগত সাবেকি মানসিকতা এতটুকু টলাতে পারেনি।

এই পরিস্থিতির একটা ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। আমাদের বিজ্ঞান ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির একটি অংশ, এদেশে তার জন্মলাভ ঘটেনি, এসেছে বিদেশ থেকে, আরোপতি হয়েছে সংযোজিত উপাঙ্গের মতো, জোড়কলমের মতো, এখনও সঠিক বাস্তুভিত খুঁজে পায়নি এবং সর্বদাই সমাজশরীরের কিছু বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করে টিকে রয়েছে। বিজ্ঞান শিল্পবিপ্লবের সাথে, সমাজবিপ্লবের সাথে,

www.pathagar.com

অর্থাৎ সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজসংস্থার ধনতন্ত্রে উত্তরণের বাস্তবাবস্থার সাথে বিজড়িত। আমাদের দেশ প্রাচীন কৃষি-অর্থনীতির, শিল্প-অর্থনীতি চালু হয়েছে সম্প্রতি, ফলে চলছে একটা রূপান্তর বা উত্তরণ প্রক্রিয়া, বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা যার অন্যতম প্রতিফলন। এই প্রক্রিয়া যেমন সমাজের বহিরঙ্গে দৃশ্যমান, তেমনি চলছে মনোজগতেও, প্রচ্ছন্ন ও অতিধীর গতিতে। আমরা আজও মধ্যযুগীয় মানসিকতা ততোটা ছেঁটে ফেলতে পারিনি যদিও তা আবশ্যক এবং তাতে সহযোগিতা দিতে পারে বিজ্ঞান, দিয়েছেও।

কিন্তু এখানে আরেকটি সমস্যাও আছে। পরিবেশ ও প্রয়োজনের তাগিদে আমরা বিজ্ঞানের বদলে প্রযুক্তিকে অধিকতর গুরুত্ব দিতে চাইছি, কখনও দুটোকে মিশিয়ে একাকার পিণ্ড বানিয়ে ফেলছি, যদিও জানি বিজ্ঞান হল প্রযুক্তির ভিত্তি, বিজ্ঞানহীন প্রযুক্তি অঘোরে উষরতা সৃষ্টি করে, তাতে প্রযুক্তির ক্রমাগত বিকাশেও ব্যাঘাত ঘটে এবং এই পেশার কর্মীরা হয়ে ওঠে যন্ত্রবৎ যা উন্নয়নশীল দেশের জন্য মোটেই কাম্য নয়। প্রসঙ্গত ড. জাফর ইকবালের 'গণিত আন্দোলন' উল্লেখ্য যা বিজ্ঞানের ভিত তৈরির পরিবেশ সৃষ্টি করছে, সম্ভাবনার একটা দুয়ার খুলে দিতে চাইছে, যার ইতিবাচক ফল হবে সুদূরপ্রসারী। গণিত যুক্তিবাদী হতে শেখায়, তাতে সৃজনশীলতা বিকাশের সম্ভাবনা বাড়ে এবং শেষপর্যন্ত প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমাদের বিজ্ঞানভাবনা কতোটা খণ্ডিত তার প্রমাণ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালগুলোর একটিতেও বিজ্ঞানের ইতিহাস ও সমাজজ্ঞতত্ত্ব বিষয়ক কোন অনুষদ নেই। বিভিন্ন বিভাগে সংশ্লিষ্ট যেটুকু ইতিহাস পড়ান হয় তা নামিক এবং তাতে কারও আগ্রহ থাকার কথা নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ক বড় বড় অনুষদ আছে উন্নত দেশগুলোতে। ইতিহাসবিহীন বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ জ্ঞান, তাতে বিজ্ঞানকর্মীদের দৃষ্টিসীমা সীমিত হয়ে পড়ে। তারা সংস্কৃতির অখণ্ডতাবোধ হারান, দুই-সংস্কৃতির মধ্যে ফারাক বাড়ে যার বিপদ সম্পর্কে অনেক বছর আগে সিপি স্নো তার *টু কালচার* বইতে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন। বুয়েটের রসায়নপ্রকৌশল অধ্যাপক ড. জহুরুল হক, যিনি আবার সাহিত্যিকও, স্বাধীনতার পর সেখানে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলবিদ্যার ইতিহাসের একটি কোর্স চালু করেন; কিন্তু সহকর্মীদের এক ধরনের অসহযোগিতায় দুবছরের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির জাড্য আমাদের মনে কতোটা দৃঢ়বদ্ধ এটাও তার একটা প্রমাণ। বলা বাহুল্য, মানববিদ্যা তার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের দরুন মুক্তচিন্তার ক্ষেত্রে যতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছে বিজ্ঞান অভিন্ন কারণেই তা পারেনি, কেননা বিজ্ঞানকে আমরা যান্ত্রিকভাবে, খণ্ডিতভাবে, সংস্কৃতির মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, যার কুফল প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করি গোটা শিক্ষাব্যবস্থার ও বিজ্ঞান গবেষণার বেহাল দশায় এবং আরও নানা অনভিপ্রেত কর্মকাণ্ডে।

www.pathagar.com

পরিশেষে বিজ্ঞানীদের জীবনীপাঠ কেন প্রয়োজন। প্রয়োজন এজন্য যে তা থেকে আমরা আবিষ্কারের প্রক্রিয়া ও আনুষঙ্গিক উদ্দীপনা আংশিক হলেও অনুভব করতে পারি। নিজের ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে একটা ধারণা পাই, নিজেকে প্রস্তুত করতে পারি। কারণ এতে জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় অনেককিছুই ত্যাগ করতে ও প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। সাথে সাথে এটাও জানা প্রয়োজন যে গবেষণায় চমকপ্রদ সাফল্যলাভ ঘটে দৈবৎ, তাতে প্রভূত অনিশ্চয়তা আর হতাশার আশঙ্কাও থাকে, তবু এই ঝুঁকি নিতেই হয়, কেননা এটা একটা ব্যাপক কর্মকাণ্ড, তার ব্যাপকতা ও বিস্তৃতির ওপরই আবিষ্কারের সম্ভাবনা নির্ভরশীল। এই অর্থে প্রতিটি মৌলিক আবিষ্কারেই গোটা বিজ্ঞানী সমাজের, তাদের সমষ্টিগত কর্মকাণ্ডেরও কিছুটা অবদান থাকে। যাই হোক, এটা স্বীকার্য যে, বিজ্ঞানী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার, কেননা একজন সফল বিজ্ঞানী একটি সমাজের কর্মশক্তি, সৃজনশীলতা ও মনীষার প্রতীক।

২০০৯

www.pathagar.com

জীববৈচিত্র্য বিনাশের পূর্বাপর

আরজ আলী মাতুব্বর স্মারক বক্তৃতার সুযোগলাভ আমার জন্য শ্লাঘার বিষয় এবং এজন্য আমি বিজ্ঞানচেতনা পরিষদের কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে শিক্ষকতার সময় (১৯৫৪-৬২) কলেজের স্টাফরুমে আরজ আলী মাতুব্বরকে দর্শনের অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদেরের সঙ্গেও আলাপে নিবিষ্ট থাকতে দেখেছি, কখনও গণিতের অধ্যাপক সুখেন্দু সোমের সঙ্গেও আর ভেবেছি সাদাবিধে একজন মানুষের এত কী কথা দর্শন ও গণিতের মতো দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ও সমধিক জটিল বিষয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে। এখন দুঃখ হয়, চাইলে আমিও তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে এবং জীববিদ্যা বিষয়ে আলাপ করতে পারতাম। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। ক্ষতি হয়েছে আমার। তিনি যথাসময়ে বইপত্র পড়ে জীববিদ্যা, বিশেষত প্রাণের উৎপত্তি ও জীবের বিবর্তন আয়ত্ত করেছেন, কেননা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই বিদ্যার জ্ঞান তাঁর জন্য অপরিহার্য ছিল। আমার বিশ্বাস, আরও কিছুদিন বাঁচলে তিনি বর্তমানের প্রকৃতি ও পরিবেশ সংকট বিষয়েও আগ্রহী হয়ে উঠতেন এবং প্রকৃতিলগ্ন এই চিন্তকের বীক্ষণ ও ভাবনায় আমরা আজ উপকৃত হতাম। ব্রিটিশের চেয়ে নিকৃষ্টতর পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলে সরকারের মদদপুষ্ট মোল্লাতন্ত্র ও প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায় আত্মগর্বী আমলাতন্ত্রের হাতে বারবার নিগৃহীত হয়েছেন এই তৃণমূল দার্শনিক এবং তাঁর প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রের অভ্যুদয় অবধি।

জীর্ণবেশ, অনমনীয়, সত্যসন্ধ এই মানুষটি বাঙালি আমজনতার দার্ঢ্যের প্রতীক এবং সেইসঙ্গে রেনেসাঁর উত্তরসুরিও। তাঁর স্মরণসভায় জীববৈচিত্র্য বিষয়ক, এমনকি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের প্রবন্ধপাঠও সব বিচারেই প্রাসঙ্গিক মনে করি। আরজ আলী মাতুব্বরের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এবার মূল প্রবন্ধটি পাঠ করছি।

বকপাখির ছদ্মবেশধারী ধর্ম স্বশরীরে স্বর্গযাত্রী জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে আশ্চর্য কী? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন–'মানুষ অহরহ মৃত্যু দেখে, কিন্তু আপন মৃত্যুর কথা ভুলে থাকে।' হোমো সেপিয়েন্স অর্থাৎ মানুষ্যপ্রজাতির ক্ষেত্রেও অভিধাটি প্রযোজ্য। মানুষ ব্যাপক প্রজাতিলুপ্তির তথ্য জানে

www.pathagar.com

এবং নিজেও অবিরাম প্রজাতিলুপ্তি ঘটিয়ে চলেছে, কিন্তু নিজের বিলুপ্তির কথা কখনও ভাবে না। প্রজাতিলুপ্তি একটি জীবতাত্ত্বিক বাস্তবতা তথা প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। এই ধ্বংসের মধ্যেই নিহিত সৃষ্টির বীজ এবং বৈচিত্র্যের ভিত্তি। জীবকুল উৎপত্তির পর ভূতাত্ত্বিক কলপর্বে অজস্র প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে। পৃথিবীতে উৎপন্ন প্রজাতির মাত্র ১-৬ শতাংশ আজ বেঁচে আছে। মানবজন্মের আগে বারবার প্রজাতির গণবিলুপ্তি ঘটেছে। সর্বশেষ ৬.৫ কোটি বছর আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল সামুদ্রিক প্ল্যাংটন, মেরুদণ্ডীর অনেকগুলি বৃহৎ বর্গ এবং গোটা ডায়নোসর গোষ্ঠী। বিগত ২০ কোটি বছরের প্রতি শতকে প্রজাতিলুপ্তির হার ছিল প্রায় ৯০ শতাংশ, জন্মেছে ততোধিক। জন্মমৃত্যুর চক্রাবর্তে কোনো প্রজাতিরই চিরজীবী হওয়ার নিশ্চয়তা নেই প্রকৃতিই প্রাণের স্রষ্টা ও বিনষ্টা এবং তা বিবর্তনক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। প্রজাতিলুপ্তির কারণগুলি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেকটাই অস্পষ্ট, যেটুকু ডারউইন (১৮০৯-৮২) উদঘাটন করেছেন আমরা সেটুকুও মান্য করি না। আমরা নিজেরাই এখন প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটাচ্ছি, কিন্তু নিজেরাও যে এই পাকচক্রে বিলুপ্ত হতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের আকাট ঔদাসীন্য। এটাও আরেক আশ্চর্য।

পৃথিবীতে শনাক্তকৃত জীবপ্রজাতির সংখ্যা প্রায় ১৪ লক্ষ, অচেনা অজানা আছে আরও ৫০ লক্ষ, হতে পারে ৫ কোটি। ক্রান্তীয় বৃষ্টিবনে আরও ৩ কোটি পতঙ্গ ও ১৫-২০ হাজার নলবাহী (ভ্যাস্‌কুলার) উদ্ভিদ প্রজাতি থাকা সম্ভব। ছত্রাক ও মাকড়সার অনেকগুলি প্রজাতি শনাক্তকরণ এখনও বাকি। বিগত পাঁচ বছরে আমাজন বনাঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে ৩০০ নতুন প্রজাতির মাছ এবং ৪ প্রজাতির নতুন বানরজাতীয় নতুন প্রাণী। সবকিছু শনাক্ত করতে প্রয়োজন ২৫ হাজার বিজ্ঞানীর বহু বছরের শ্রম আর তাতেও জানা যাবে না ওইসব জীবের জীবনচক্র ও বাস্তুপরিবেশ। বাংলদেশে অদ্যাবধি জ্ঞাত উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা যথাক্রমে ৬৬৩৪ ও ৫৩৫১। সীমিত আয়োতনের এই ভূখণ্ডে বিগত কয়েক বছরে পাওয়া গেছে সপুষ্পক উদ্ভিদের ১২ নতুন প্রজাতি। এখানকার নলবাহী উদ্ভিদের ১০৬ ও প্রাণীর ১৩৭ প্রজাতি নানা পর্যায়ে বিপন্ন, বিলুপ্ত হয়ে গেছে মেরুদণ্ডী প্রাণীর ১৩ প্রজাতি। বাংলাদেশের নিজস্ব বা একান্ত সপুষ্পক উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা ৬। এই হিসাব থেকে বাদ গেছে অণুজীব, ছত্রকা, শৈবাল ও নিম্নবর্গীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিগুলি। বলা বাহুল্য, খতিয়ান ক্রমাগত দীর্ঘতর হবে এবং বিলুপ্ত, বিপন্ন ও নতুন প্রজাতির সংখ্যা বাড়বে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রজাতির বিপন্নতা ও বিলুপ্তির কারণ প্রাকৃতিক নয়, মানুষী কর্মকাণ্ডের ফল। তবে আশার কথা, হিসাবটি নির্বিশেষ নয়। জীবপ্রজাতির ভূগোল রাজনৈতিক ভূগোল থেকে পৃথক। বাংলাদেশের জীবকুল ইন্দো-মালয়ীয় জীবাঞ্চলের অন্তর্গত, এখানে না থাকলেও আশপাশের দেশে কোনোকোনোটি টিকে থাকা সম্ভব।

www.pathagar.com

সমস্যাটি কোনো একক দেশের নয়, গোটা বিশ্বের। জীববৈচিত্র্য একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, প্রকৃতি ও পরিবেশ বিপর্যস্ত হলে জীববৈচিত্র্যেরও অবক্ষয় ঘটে। জীবকূল বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে বসবাস করে। প্রাকৃতিক নিয়মে এই বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটলে বিবর্তনক্রিয়া সক্রিয় হয়ে ওঠে, ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্যে জীবকুলের পূনর্জনন ঘটে, উৎপন্ন হয় নতুন নতুন প্রজাতি। অক্সিজেনহীন পৃথিবীতে একদা অবায়ুজীবী জীবকুলের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছিল, বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন আসার পর এইসব জীবের গণবিলুপ্তি ঘটে, কিন্তু উৎপন্ন হয় বায়ুজীবী জীবকুল এবং আজকের সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি। এটাই বিবর্তন। কিন্তু মানুষ বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটালে প্রকৃতি পশ্চাদপসরণ করে, প্রহত হয় বিবর্তনক্রিয়া, লোপ পায় জীববৈচিত্র্য। প্রকৃতি ও মানুষের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের মধ্যে গুণগত পার্থক্য দুস্তর।

মানুষ যখন থেকে জেনেছে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জীব, গোটা প্রকৃতি তার ভোগ্যবস্তু তখন থেকেই প্রকৃতির ওপর মানুষের অমিত আগ্রাসনের শুরু এবং নৃকেন্দ্রিকতাবাদের উৎপত্তি। এটাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সংগ্রামের সূচনা। প্রকৃতিকে ধাত্রী জেনেও এই সংগ্রামে মানুষ প্রকৃতিকে মান্য করার, বিবেচক হওয়ার ব্যাপারটি ক্রমেই বিস্মৃত হয়েছে, চালিত হয়েছে প্রজ্ঞার বদলে প্রলোভনে এবং শিল্পসভ্যতার কল্যাণে শেষপর্যন্ত হয়ে উঠেছে প্রকৃতির বিকল্প শক্তি। এভাবেই সভ্যতার অগ্রযাত্রা বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেছে কৃষিসভ্যতা থেকে শিল্পসভ্যতায়, সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামো থেকে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় এবং কিছুকাল কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়। এই অগ্রগতির ত্বরণও লক্ষণীয় – ১০,০০০ বছর কৃষিসভ্যতা, ৫০০ বছর ধরে চলছে শিল্পসভ্যতা, সমাজতান্ত্রিক সভ্যতাও এর অন্তর্ভুক্ত যা টিকে ছিল মাত্র ৭০ বছর। জীবতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ত্বরণের আরেকটি মাত্রা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এটি নেতিবাচক, তাতে নিহিত প্রকৃতির ব্যাপক ধ্বংস ও জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তি। নৃকেন্দ্রিককতা নির্বিশেষ সুফলদায়ক হয়নি, তাতে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা বাড়লেও হ্রাস পেয়েছে তার মানসিক ভারসাম্য ও শক্তি, সে ক্রমেই হয়ে উঠেছে যন্ত্রের ক্রীড়নক।

প্রকৃতির প্রত্যাঘাত নতুন কোনো ঘটনা নয়, অতীতেও ঘটেছে আঞ্চলিক পরিসরে। কৃষিযুগে বন-আবাদ, জলাভূমি নিষ্কাশন ও পশুচারণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে আরব ও উত্তর আফ্রিকার মরুভূমিগুলি। পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি সাহারায় একদা মানববসতি ছিল, এটি উৎপত্তির সবগুরি কারণ অজানা থাকলেও তাতে মানুষের ভূমিকা থাকা সম্ভব। অনেকগুলি প্রাচীন সভ্যতার বিলুপ্তিও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার কারণে ঘটে থাকতে পারে। ফসলের মাঠে কীটপতঙ্গের আক্রমণও প্রকৃতির প্রত্যাঘতের আরেকটি দৃষ্টান্ত। বন-আবাদ ও কৃষিক্ষেত্রে কয়েক

www.pathagar.com

প্রজাতির ফসলের এককচাষে বনের পতঙ্গকুল তাদের প্রাকৃতিক খাদ্যভাণ্ডার হারিয়ে অনাহারে মারা গেছে, তাদের প্রজাতিবৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু এই কোণঠাসা অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, প্রকৃতি অর্থাৎ বিবর্তনক্রিয়া তাদের ফসলি গাছগাছালি খেতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করে তুলছে, সহজলভ্য এই খাদ্য তাদের বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা যুগিয়েছে এবং ফসল সংরক্ষণের বিপদ বাড়িয়েছে, অজস্র কীটঘ্ন আবিষ্করের পরও তা থেকে অ্যাহতি মিলছে না। প্রকৃতির শৃঙ্খল ভাঙা সহজ, কিন্তু পুনর্নির্মাণ সুকঠিন, কখনও সাধ্যাতীত। আধুনিক কৃষি ও শিল্পে সর্বত্রই আছে প্রকৃতির প্রত্যাঘাত এবং লাভালাভে প্রশ্নচিহ্ন।

পৃথিবীর প্রতিদিন প্রায় ১০০ প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে এবং সিংহভাগই ক্রান্তীয় বৃষ্টিবনে। বাংলাদশেসহ ক্রান্তীর বনের গোটা জীববৈচিত্র্য এখন বিপন্ন। আগামী ২০-৩০ বা ৫০ বছরে এইসব অঞ্চলের ২৫ শতাংশ প্রজাতি বিলুপ্তির আশঙ্কা অমূলক নয়। অতীতের তুলনায় বর্তমান প্রজাতিলুপ্তির হার ৪০,০০০ গুণ অধিক এবং প্রায় সবই মানুষী কর্মকাণ্ডের কুফল। বিবর্তনক্রিয়ার সৃষ্টিক্ষমতা হ্রাসের জন্য এমনটি ঘটছে এবং পরিস্থিতি এতটা প্রতিকূল আর কখনও ছিল না। মনুষ্যপ্রজাতির মতো আর কোনো একক প্রজাতি কখনও প্রকৃতিকে এতটা প্রভাবিত করতে পারে নি। সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন ভোগ্যবস্তুর ৪০ শতাংশ মানুষ একাই আত্মসাৎ করে। একটি প্রজাতি প্রকৃতির খাদ্যভাণ্ডারের সিংহভাগ লুণ্ঠন করলে জীববৈচিত্র্যের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

জীববৈচিত্র্য হ্রাসের মূলে আছে মানুষী কর্মকাণ্ডের ফলে প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের ব্যাপক বিপর্যয়। মানুষ বাস্তুতন্ত্রগুলোকে যদৃচ্ছা খণ্ডিত ও বিধ্বস্ত করে চলেছে। বিবর্তনক্রিয়ায় বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইসব বাস্তুস্থানের মধ্য আছে প্রবালপ্রাচীর, প্রাচীন হ্রদসমূহ, ভূমধ্যসাগরীয় আবহাঞ্চল, জোয়ারধৌত উপকূল এবং অবশ্যই বৃষ্টিবন। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রটি হল বিবর্তনক্রিয়ার শক্তিকেন্দ্র, এখনেই রয়েছে জীববৈচিত্র্য সৃষ্টির সর্বোচ্চ হার। এটি 'জীবনের জরায়ু'। বাস্তুতন্ত্রের ভিত্তি যে-উদ্ভিদপ্রজাতি তার সিংহভাগ এই প্রথমবারের মতো বিপন্ন হতে চলেছে। অতীত প্রজাতিলুপ্তিতে স্থলজ উদ্ভিদের ওপর ততটা চাপ পড়েনি, কিন্তু আজ উদ্ভিদ প্রজাতির এক-পঞ্চমাংশ বিলুপ্তির সম্মুখীন আর তাতে শুধু জীবকুলেই নয়, বিবর্তনক্রিয়ায়ও ধস নেমেছে। বৃষ্টিবন ধ্বংস হচ্ছে মানুষের সরাসরি হস্তক্ষেপে, প্রবালপ্রাচীরে ক্ষয় ধরেছে সমুদ্রজলে অম্লতা বৃদ্ধির ফলে আর তাতেও আছে মানুষের পরোক্ষ যোগসাজশ। বাস্তুতন্ত্রের বিভাজন ও বিনাশের ফলে উপ-সাহারা অঞ্চলের আদিবাস্তুতন্ত্রের ৬৫ শতাংশ বিনষ্টপ্রায়। এই হার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ৬৭ শতাংশ, পশ্চিম ইউরোপে ততোধিক। কীটঘ্ন, ত্রপোমণ্ডলীয় ওজোন, গন্ধক, নাইট্রেজেন অক্সাইডসমূহ ও শিল্পোন্নত সমাজের অন্যান্য 'আশীর্বাদ' প্রজাতিবৈচিত্র্যের ক্রমাগত

www.pathagar.com

বিনাশ ঘটিয়ে চলেছে। পূর্ব-ইউরোপে পাইনবনের ৮৪ এবং মধ্য-ইউরোপে ৫০ শতাংশ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত। জার্মানির ৫০ শতাংশ স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি আজ বিপন্ন। উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির অত্যধিক আহরণও এই বিনাশের অন্যতম হেতু। বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ এই দেশ সর্বাধিক জনঘন এবং তাতে পরিবেশের ওপর পড়ছে প্রচণ্ড চাপ। একটি দেশের জন্য আদর্শ ২৫ শতাংশ বনভূমির আয়তন বাংলাদেশ ৭-১০ শতাংশ। বড় বড় বিল ভরাট হচ্ছে এবং ছোট নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, নদীগুলি শিল্পবর্জ্যে দূষিত হয়ে চলেছে, নগরায়ন ও শিল্পায়ন ক্রমাগত কৃষিজমি গ্রাস করছে, তদুপরি আছে বিশ্ব উষ্ণায়নে উপকূলীয় অঞ্চলে নোনাপানির আগ্রাসন ও জলবায়ুর পরিবর্তনে কৃষি-বিপর্যয়ের আশঙ্কা। কয়েকটি বিদেশী বৃক্ষের অত্যধিক একক-রোপণে দেশীয় দারুবৃক্ষ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। নির্বিচারে বিদেশী উদ্ভিদ ও প্রাণী চাষ দেশীয় জীববৈচিত্র্যের জন্য একটি বড় হুমকি হওয়া সত্ত্বেও আমরা নির্বিকার। বিদেশী মৎস্যচাষের ফলে আফ্রিকার হ্রদগুলির জীববৈচিত্র্য বিপন্ন হয়ে পড়ছে। পরদেশী স্তন্যপায়ীরা দেশীয় পাখির বিলুপ্তি ত্বরিত করে। ছাগল ও তৃণভোজী স্তন্যপায়ীরা কোনো কোনো দ্বীপরাজ্যের বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করে ফেলছে। আরব দেশগুলিতে এককালের পোষা টিয়াপাখিরা এখন ছড়িয়ে পড়ে খেজুরবাগান লুট করছে। বহির্দেশীয় উদ্ভিদ কোনো কোনো দেশে জাতীয় পার্কগুলির জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। বংশগতি পরিবর্তিত (জিএম) প্রজাতিগুলির পক্ষে একদিন স্থানীয় পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য বিপর্যয়ী হওয়াও অসম্ভব নয়।

জলবায়ুর পরিবর্তন অব্যাহত থাকলে বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বিপন্ন হয়ে পড়বে। অনেকগুলো বাস্তুতন্ত্রের ওপর এই অভিঘাত ধ্বংসাত্মক হবে। বহু বাস্তুতন্ত্র ইতোমধ্যে বিশাল কৃষিক্ষেত্র ও শিল্পসমাহারের 'বদ্ধভূমি'তে বহুধা খণ্ডিত। ফলত অনেক সচল প্রজাতি এগুলি পাড়ি দিয়ে অনুকূল পরিবেশে পৌঁছতে পারবে না। জলবায়ুর পরিবর্তনে বিবর্তনক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হতে পারে। কার্বন-ডাইঅক্সাইডের ঘনীভবন শুধু উষ্ণায়ন বাড়ায় না, উদ্ভিদের প্রস্বেদনের মাত্রাও কমায় এবং তাতে আবহ শীতলীকরণ হ্রাস পায়। বিশ্ববাস্তুতন্ত্রের জটিলতা এবং শিল্পোৎপাদনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ অবহিত না থেকেই আমরা অদ্ভুত আলো-আঁধারিতে যেন এক অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণে এগিয়ে চলেছি। যুদ্ধে কৌশলগত সাময়িক পশ্চাদপসরণের মতো কিছুকালের বিরতিসহ ভাবনা-চিন্তার সুযোগও আমাদের নেই। এটি এক উভয়সংকট, সভ্যতার সংকট।

সাসটেনেবল বা পরিপোষক উন্নয়নের ধারণা এখন বহুলপ্রচারিত, কিন্তু আদৌ তার বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা এমন সন্দেহ অনেকের। কেউ কেউ একে কারচুপিও বলেন। পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতি ও রাজনীতির চারিত্র্যই এক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক।

www.pathagar.com

পুঁজি একটি প্রবল শক্তিধর সত্তা, প্রাকৃতিক ও মানবিক সবকিছুকেই সে পণ্যে রূপান্তরিত করে। পুঁজিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না-পারলে প্রকৃতি ও পরিবেশকে বাঁচান যাবে না, কিন্তু তেমন নিয়ন্ত্রণ আজও সাধ্যাতীত রয়ে গেছে। পশ্চিমের পণ্ডিত ও পরিবেশবাদীরা নিশ্চিতই বিশ্বপরিবেশের সুরক্ষা সম্পর্কে আন্তরিক, কিন্তু তাদের রাজনীতিক ও কর্পোরেটগুলো নানা ছলে ও কৌশলে উন্নয়নশীল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অবিরাম লুট করে চলেছে। তারা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, খনিজ আহরণ, যোগাযোগ উন্নয়ন, কাঠসংগ্রহ সহ রপ্তানিমুখী ফসল ফলানোর জন্য বন-আবাদ, অর্থাৎ উন্নয়শীল ও দরিদ্র দেশের প্রাকৃতিক বাস্তসংস্থান ধ্বংসের জন্য স্থানীয় বশংবদ এলিটগোষ্ঠী, স্বৈরশাসক ও ব্যবসায়ীদের প্রাণোদনা যোগায় এবং বিপুল পরিমাণ মুনাফা সংগ্রহ করে। ক্রান্তীয় দেশগুলোতে এই আগ্রাসনের শিকার প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যসহ সকল আদিবাসী মানুষ। চীন ও ভারতের মতো অ-নৃকেন্দ্রিকতাবাদী দেশগুলিও আজ এই উন্নয়নধারায় শরিক। উন্নয়ন ও প্রকৃতি আজ মারাত্মক সংঘর্ষলিপ্ত, কিন্তু তার ফয়সালা আর দেশি দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, হতে হবে এই শতকেই।

পৃথিবীর স্থলভাগের এক-ষষ্ঠমাংশ জুড়ে থাকা বৃষ্টিবনে ঝরে স্থানীয় মোট বৃষ্টিপাতের ৫০ শতাংশ। প্রস্বেদন, বাষ্পীভবন ও বৃষ্টিপাতের অন্তহীন চক্রাবর্তে কোটি কোটি টন জল এই বনের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়। এই বন ধ্বংস হলে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক জলবায়ুর বিপর্যয় বাড়বে। এইসব বিশাল ও বিস্তৃত বনভূমি জলভাণ্ডারের কাজ করে এবং ভাটি এলাকাকে বন্যা ও খরা থেকে বাঁচায়। অক্ষত বৃষ্টিবনে বৃষ্টিপাতের একাংশ মাত্র বনতলে পৌঁছায়, বাকিটা গাছপালা শুষে নেয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃষ্টিবনের ছায়াছত্র বৃষ্টিপাতের ৩৫ শতাংশ শোষণ করে, কিন্তু গাছ কাটার পর এই হার ২০ শতাংশে নেমে যায় আর রবার গাছের বনে এই হার মাত্র ১২ শতাংশ। গাছপালার জলশোষণ হ্রাস মারাত্মক ভূমিক্ষয় ঘটায়। প্রাকৃতিক বনের তুলনায় তৈল-পাম বাগান ও ক্রান্তীয় খেতজমিতে ভূমিক্ষয়ের হার যথাক্রমে ১৯ ও ৩৪ গুণ বেশি। এগুলির ফলাফল – বন্যা, ভূমিক্ষয়, নদীভরাট, পানীয় জল দূষণ এবং মাছের বৈচিত্র্য ও সংখ্যা হ্রাস।

জনঘনত্ব ও উন্নয়নের যুগ্ম প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি ও পরিবেশের অপরিবর্তনীয় অবক্ষয়ের কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা এবার বলছি। এলাকাটি আমার জন্মস্থান এবং স্মৃতির পরিসর প্রায় সত্তর বছর। মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা-পাথরিয়ার অন্তর্গত শিমুলিয়া আমাদের গ্রাম, পূর্বে পাথরিয়া পাহাড়, পশ্চিমে হাকালুকি হাওর, দুটিই গ্রাম থেকে চার মাইলের দূরত্বে। জায়গাটা উঁচু। বন্যার পানি উঠত না। পাশেই ছোট নদী নিকড়ি পাথরিয়া থেকে উৎপন্ন। সারা বছরই নদীতে যথেষ্ট পানি

www.pathagar.com

থাকত, বর্ষায় প্রমত্তা। দূরদূরান্তর থেকে পণ্যবোঝাই বড় বড় নৌকা আসত। পাহাড় থেকে নামত মুলিবঁশের ভুরা। ছোটবড় প্রচুর মাছ ছিল নদীতে। পূবদিকে এক মাইল পাড়ি দিলেই বন, মাঝে মাঝে বাড়িঘর ক্ষেতজমি, শেষে নিবিড় অরণ্য, পাথরিয়া রিজার্ভ ফরেস্ট। বনে ছিল হরিণ, সম্বর শূকর, বনরুই, বাঘ, মেছোবাঘ, বনবিড়াল, বানর, হনুমান, উলুক, এমনকী রামকুত্তাও, শঙ্খচূড়াসহ বহুজাতের সাপ, আর অগুন্তি পাখি–ধনেশ, মথুরা, বনমোরগ, ভিমরাজ, টিয়া, ময়না, হরিয়াল ইত্যাদি। এখন বন নেই। জীবজন্তুও নেই। বসতি ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় হাজার ফুট উঁচু পাহাড় অবধি। বনদস্যুরা লোপাট করে দিয়েছে বনাঞ্চল। অবশিষ্ট কিছু মুলিবঁ-াশ ফল ফলিয়ে জীবনচক্র পূর্ণ করে মারা গেছে কয়েক বছর আগে। বনপুনর্জননের বদলে সেখনে চলছে সামাজিক বনায়ন। প্রাকৃতিক বন আর মনুষ্যসৃষ্ট বনের ফারাক আকাশ-পাতাল।

প্রাকৃতিক বন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইকোসিস্টেম বা বাস্তুসংস্থান, তাতে থাকে নানা জীব ও জড়ের সম্পূরক সন্নিবেশ। বৃষ্টিপাতের একটা বড় অংশ শুষে নেয় গাছগাছালি এবং হাজার হাজার বছরে বনতলে জমে-ওঠা উদ্ভিজ্জের কয়েক ফুট উঁচু একটা স্তর। এগুলো তড়িৎ-বন্যা ঠেকায়, নদীতে জলের যোগান দেয় সারা বছর। একবার বিনষ্ট হলে তা আর পুনর্স্থাপিত হয় না। আমরা এখন পুনপৌণিক বন্যা এবং বাকি সময় শুখার ভুক্তভোগী। নদীবাহিত পলি ও বালুতে হাকালুকি হাওর ভরাট হয়ে চলেছে, তাতে বন্যায় আমাদের গ্রামেও পানি ওঠে, রাস্তাঘাট ডুবিয়ে দেয়, থাকেও বেশ কিছুদিন। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা ইদানীং। আগামী কয়েক দশকে এলাকাটা ভাটি অঞ্চল হয়ে উঠবে, বদলে যাবে গোটা পরিবেশ, গাছগাছালির ধরন, চাষাবাদ।

এলাকার অনেক লোক বিদেশে চাকরি করে, আসে বৈদেশিক মুদ্রা, উঠছে দালান-কোঠা ও পাকা-বাড়ি, বসে গেছে বৈদ্যুতিক করাতকল ও ইটভাটা, বনবি-নাশের অনুঘটক। রাস্তাঘাট উন্নত হয়েছে, পাকা সড়ক গেছে হাওর পর্যন্ত, চলছে বাস-ট্রাক, অটো ও রিক্শা, সর্বত্র দোকানপাট, উপজেলা সদরে হোটেল ও ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, বাড়ছে শব্দ, ধুঁয়ো ও ধুলোর প্রকোপ। উন্নয়ন অনস্বীকার্য, সেইসঙ্গে পরিবেশের পরিবর্তনও। মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতের এলাকা এখন ইকোপার্ক, নেই ইকোলজি, আছে ট্যুরিজম বাণিজ্য। উন্নয়ন ও পরিবেশ বিনাশের এই যুগলবন্দী অবস্থান শুধু এখানে নয়, বিদ্যমান দেশের সর্বত্র, স্থানভেদে ভিন্নতর আঙ্গিকে এবং লাগোয়া প্রতিবেশী দেশেও।

মালয়েশিয়ায় পরিচালিত একটি সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে গ্রামাঞ্চলের মানুষ খাদ্য ও ভেষজ হিসাবে বনজ ১২০০ প্রজাতির গাছগাছড়া ব্যবহার করে। সংখ্যাটি আরও বেশি হতে পারে, মোট প্রজাতির এক-তৃতীয়াংশ। পৃথিবীর প্রায়

www.pathagar.com

৩০০ কোটি মানুষ এজন্য বনের উপর নির্ভরশীল আর এগুলির সিংহভাগ যোগায় বৃষ্টিবন। উন্নত বিশ্বের ওষুধ কোম্পানিগুলোও সেখানে এই জাতীয় গাছপালা খুঁজছে ও আদিবাসীদের কাছে ধরনা দিচ্ছে। অর্ধশতাধিক দরিদ্র দেশে প্রোটিনের একটি প্রধান উৎস বন্যপশু শিকার এবং ১৯টি দেশে এই হার ৫০ শতাংশ বা ততোধিক। শিল্পোন্নত দেশে বনের গাছগাছালি ও জীবজন্তুর এমন ব্যবহার নেই। ফলত ক্রান্তীয় দেশগুলোতে তাদের পরামর্শে প্রস্তুত উন্নয়ন মডেলে এই উপাত্তগুলো তেমন গুরুত্ব পায় না, অথচ সেখানকার জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ স্থানীয় জীবসম্পদের উপর সরাসরি নির্ভরশীল।

ক্রান্তীয় বৃষ্টিবন ও নাতিশীতোষ্ণ বনের ১৫ শতাংশ বিলুপ্তির জীবতাত্ত্বিক তাৎপর্য তুলনামূকভাবে সম্পূর্ণ পৃথক। এশিয়ার বৃষ্টিবনের মাত্র ১০ হেক্টর জামিতে আছে গোটা উত্তর-আমেরিকার চেয়ে অধিক সংখ্যক বৃক্ষপ্রজাতি। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাজ্যে একটিমাত্র বৃক্ষে বসবাসরত পিঁপড়ে প্রজাতির সংখ্যা গোটা-ব্রিটেনের পিঁপড়ে প্রজাতির সংখ্যার অধিক। মধ্য ও দক্ষিণ-আমেরিকার এক বর্গ-কিলোমিটার জায়গায় শত শত পাখি ও হাজার হাজার পতঙ্গ প্রজাতির বাস। ক্রান্তীয় বৃষ্টিবন হলো গোটা বিশ্বের ৫০ শতাংশ জীবপ্রজাতির আবাসভূমি, হতে পারে ৯০ শতাংশেরও। বৃষ্টিবনের বাস্তুসংস্থানিক মিথষ্ক্রিয়ার সংখ্যা নাতিশীতোষ্ণ বনের তুলনায় ১০০-১০০০ গুণ বেশি এবং এগুলোর ভঙ্গুরতা ও স্পর্শকাতরতা অন্যান্য বন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আরেকটি বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। অনেকগুলো নাতিশীতোষ্ণ দেশে কোনো প্রজাতি বিপন্ন হলে তার পরিযায়ী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু বৃষ্টিবনে ঘটে চিরলুপ্তি। বৃষ্টিবনে একটি প্রজাতির বাস্তুভিতের পরিধি ও জনসংখ্যা সীমিত থাকায় সেখানে কোনো জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, মহাসড়ক বা বৃহৎ খামার নির্মাণের জীবতাত্ত্বিক পরিণতি হল হাজার হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর নির্বিশেষ ধ্বংস।

বৃষ্টিবনের বাস্তুতন্ত্রগুলো দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে চলেছে। ১৯৮৯ সালে প্রায় দেড় লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার ক্রান্তীয় বৃষ্টিবন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং আরও ২ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার ধ্বংসের মুখোমুখি। প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থাকলে অচিরেই অবশিষ্ট বনের বিলুপ্তি ঘটবে এবং উষ্ণমণ্ডলীয় জীববৈচিত্র্য খণ্ডছিন্ন ও বিনষ্ট হয়ে পড়বে। দীর্ঘকাল বসবাসে অভ্যস্ত যে-আদিবাসীরা প্রকৃতির সঙ্গে মিথোজীবিতামূলক জীবনযাপনের কৌশল ও মানসিকতা আয়ত্ত করেছিলেন আমরা তাদের পরিত্যাগ করেছি, হত্যা করেছি এবং এখন কোণঠাসা করে রেখেছি। আমরা ভুলে গেছি দক্ষিণ আমেরিকায় তাদের অত্যুন্নত একাধিক সভ্যতাও ছিল এবং পশ্চিমের দস্যুতা সেগুলোর নির্বিশেষ বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। তাদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় অনেক কিছুই ছিল, মর্গান ও মার্কস সেটা লক্ষ করেছিলেন, কিন্তু পঁজিতান্ত্রিক সভ্যতা সবই প্রত্যাখান করেছে।

www.pathagar.com

আমার কথা শেষ হয়ে আসছে, বাকি আছে একজন রেড-ইন্ডিয়ানের কিছু বক্তব্যের অবতারণা। তিনি ওরেগন অঞ্চলের আদিবাসীদের গোষ্ঠীপিতা সিয়াটল, ওয়াশিংটনের গভর্নরেন কাছে নিজ এলাকাটি বিক্রি করতে বাধ্য হলে তাকে ১৮৫৪ সালে যে-চিঠি লিখেন তা সভ্যতার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে আছে। তিনি লিখেছিলেন: 'আমি ভাবি, মাটির উষ্ণতা আর আকাশকে আপনারা কীভাবে বিকিকিনির নিক্তিতে ওঠাতে পারেন? এই পৃথিবীর প্রতিটি অংশ আমাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। চকচকে পাইনপাতা, বালুকাময় সমুদ্রতীর, ঘন বনের প্রতিটি শিশিরবিন্দু, গুঞ্জরিত পতঙ্গ, সবকিছু আমাদের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতায় পবিত্র। প্রতিটি বৃক্ষের শিরায় শিরায় প্রবাহিত প্রাণরস রেড-ইন্ডিয়ানদের স্মৃতিকেই বহন করে চলেছে।... আমাদের মৃতেরা কখনও এই অপরূপ পৃথিবীকে ভোলে না। তারা তাকে মা বলে জানে।... আমরা এই ধরিত্রীরই অংশ এবং এই ধারিত্রী আমাদেরই অংশ। সুগন্ধি ফুলের আমাদের বোন, হরিণ ঘোড়া পাখামেলা ঈগল সকলে আমাদের ভাই। পাথুরে চূড়া, তৃণভূমিতে জমে থাকা জল, টাট্টুর শরীরের উত্তাপ আর মানুষ আমরা সকলে মিলে যেন একই পরিবার।... হ্রদের স্বচ্ছ জলের গায়ে আলোর প্রতিটি নাচন আমাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতিময় অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বহতা জলের কলধ্বনিতে আমরা আমাদের প্রপিতামহের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। এই ভূমির বুকে বহে-চলা নদীগুলো আমাদের ভাই। তারা আমাদের তৃষ্ণা মেটায়, আমাদের নৌকাগুলোকে বয়ে নিয়ে যায়, আমাদের সন্তানদের আহার যোগায়। আমরা জানি যে, সাদা মানুষের ভাবনাগুলো আমাদের মতো নয়।... এই ধরিত্রী তাদের সহোদর নয়, শত্রু। তারা কেবল শত্রুকে পরাস্ত করে সামনে এগিয়ে যেতে জানে।... যে-ধরিত্রী আমাদের মা, যে-আকাশ আমাদের ভাই, তাদের কাছে তা কেবলই পণ্য।... তাদের সীমাহীন ক্ষুধা একদিন এই পৃথিবীকে নিঃশেষ করে আদিগন্ত মরুভূমি করে তুলবে।... আমি জানি পুকুরের শান্ত জলের উপর দিয়ে বয়ে-যাওয়া কোমল স্বর আর পাইনের গন্ধমাখা বৃষ্টিধোয়া বাতাসের ঘ্রাণ একজন লালমানুষের কাছে কতই-না প্রিয়।... আমি দেখেছি সাদারা চলন্ত ট্রেন থেকে কীভাবে বন্য বাইসনের পালের উপর নির্বিচার গুলি চালাচ্ছে আর হাজার হাজার মৃত জন্তুর পচনশীল দেহগুলি তৃণপ্রান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। যে-প্রাণীকে আমরা শুধু বেঁচে থাকার প্রয়োজনে হত্যা করে থাকি। পশুরা না-থাকলে মানুষের অস্তিত্ব কোথায়? পশুরা বিলুপ্ত হয়ে গেলে মানবাত্মাও মহানিঃসঙ্গতায় ভুগে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কেননা পশুদের অদৃষ্টে যা ঘটবে মানুষও অচিরেই সেই একই অদৃষ্ট ভোগ করবে। বিশ্বজগতের সবকিছুই তো একে অপরের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে জড়িয়ে আছে।... মানুষ এই বিশ্বজগতের জাল বোনে নি, সে এই জালের একটি সুতোমাত্র। এই জাল ছিন্ন করলে সে নিজেই বিপন্ন হবে।... সাদামানুষ, ঈশ্বরের

www.pathagar.com

সঙ্গে নিয়ত যাদের বন্ধুর মতো ওঠাবসা, তারা নিয়তির হাত থেকে রেহাই পাবেনা।... ঈশ্বর, যিনি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে আপনাদের এই ভূখণ্ড নিয়ে এসেছেন এবং এই ভূমি আর লালমানুষের উপর আধিপত্যের অধিকার দিয়েছেন, তিনি তাঁর শাস্তি দিয়ে আপনাদের বিনাশ করবেন। অদৃষ্ট আমাদের কাছে পরম রহস্যময়। যখন প্রান্তরের সব বাইসন শেষ হবে, পোষ মানাবার জন্য আর একটিও বুনোঘোড়া থাকবে না, গহিন দুর্গম প্রান্তরগুলোও যখন মানুষের ভিড়ের গন্ধে শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে আসবে, পাহাড়গুলোকে বেঁধে ফেলবে কথা-বলার তার, তখন আমরা পরস্পরকে প্রশ্ন করব–এই প্রান্তরের অরণ্যগুলো কোথায় আর কোথায় সেই পাখামেলা ঈগলেরা?'

সিয়াটলের এই চিঠি তো সাধারণ কোনো চিঠি নয়, একটি অনন্য অভিভাষণ, তাতে আদিবাসীদের মনোজগতের নিখুঁত প্রতিবিম্ব ছাড়াও আছে জীবনদর্শন, বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান, জীববৈচিত্র্য রক্ষার আবশ্যকতা এবং সেইসঙ্গে যন্ত্রসভ্যতার দেউলিয়াপনা ও অনিবার্য ধ্বংসের পূর্বাভাস। এরই চিৎপ্রকর্ষের ধারক ও বাহক আমাদের জাতিগোষ্ঠীরই মানুষ থোরো, গান্ধী, তলস্তয় ও রবীন্দ্রনাথসহ অনেককেই আমরা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু অনুসরণ করিনা, করা সম্ভবও নয়, কেন নয় তা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এ আরেক অদ্ভুত অগ্রযাত্রা যেখানে প্রত্যাবর্তন দুরূহ। অনেক বছর আগে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) লিখেছিলেন, 'প্রকৃতিকে অতিক্রমণ কিছুদূর পর্যন্ত সয়, তারপরে আগে বিনাশের পালা।... প্রকৃতির নিয়ম-সীমায় যে স্বাস্থ্য ও আরোগ্যতত্ত্ব আছে তাকে উপেক্ষা করে কী করে মানুষ স্বরচিত প্রকাণ্ড জটিলতার মধ্যে কৃত্রিম প্রণালীতে জীবনযাত্রার সামঞ্জস্য করতে পারে এই হয়েছে আধুনিক সভ্যতার দুরূহ সমস্যা।' আমাদের প্রকৃতিপ্রেম দূরাতীত স্মৃতিমাত্র, আমাদের তা ক্ষণিকের জন্য উন্মনা করে, জীবনযাত্রার ধরন পালটাতে উদ্বুদ্ধ করে না। রবীন্দ্রনাথের মতো সিয়াটলও জানতেন যে 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ', তাই সাদামানুষকে উপদেশ দিয়েছিলেন: 'আপনারা নিজেদের সন্তানদের এই শিক্ষা দেবেন যাতে তারা জানে যে তাদের পায়ের নিচের মাটি আমাদের পূর্বপুরুষদের দেহাবশেষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তারা যেন এই মাটিকে যথার্থ সম্মান করতে শেখে। তাদের বলবেন এই পৃথিবী আমাদের জ্ঞাতিজনদের জীবন থেকে ঋদ্ধ হয়েছে। ওদের শেখান যে এই ধরিত্রী আমাদের মা, মায়ের ভাগ্যে যা ঘটবে সন্তানদের ভাগ্যেও তাই ঘটবে।'

মানুষ যে প্রকৃতির সন্তান সেই অনপনেয় ছাপ অনাদিকালকে থেকে ধৃত আছে তার রক্তপ্রবাহে, স্নায়ুতন্ত্রে এবং আজও সে প্রকৃতিপ্রেমিক। একইসঙ্গে এটাও সত্য যে আমরা প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তার সঙ্গে নিরন্তর দ্বন্দ্বলিপ্ত। 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' থেকে মুক্তিলাভের পর মানুষ এখন প্রকৃতির একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

শিল্পবিপ্লব মানুষের অগ্রাযাত্রার একটি বড় অর্জন এবং সেইসঙ্গে অশনিসংকেতও। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে মিথোজীবিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলে নি, তেমন চেষ্টাও করে নি। আজ প্রকৃতির প্রত্যাঘাতের ফলে তার বোধোদয় ঘটেছে, কিন্তু সে কর্তব্যাবিমূঢ়। প্রত্যাবর্তন অবরুদ্ধ, অগ্রগতি ধোঁয়াশাচ্ছন্ন এবং সময়ও সংক্ষিপ্ত, সম্ভবত পঞ্চাশ বছরের অধিককাল নয়। প্রয়োজন তেল-গ্যাস-কয়লা ও পরমাণুর শক্তির পরিবর্তে দূষণমুক্ত শক্তিশালী জ্বালানি উদ্ভাবনি এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যমান গোটা উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও ভোগবাদ বিসর্জন। কিন্তু তা কি সম্ভব? মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদে পুঁজিতন্ত্রের অনিবার্য ধ্বংস ও নতুন সমাজব্যবস্থা উদ্ভবের যে-পূর্বাভাস আছে সেজন্য প্রয়োজনীয় সময়টুকু কিন্তু আমাদের নেই। অতঃপর একটিই বিকল্প থাকে আর সেটি হলো স্বয়ং প্রকৃতি-জননীর সংহারমূর্তি ধারণ, তাতে যদি মানুষের বোধদয় ঘটে!

অতঃপর আর কীই-বা বলার থাকে। মুখবন্ধে আছেন যুধিষ্ঠির, অন্ত্যে কবি জন ডান। তাঁদের দুটি আলোচ্যই মৃত্যু-বিষয়ক, তবে শেষোক্ত পঙ্‌ক্তিমালায় উল্লিখিত মানুষ্য শব্দটিকে প্রজাতি শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করলে তা এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্যের সঙ্গে আরও সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে।

'No man is an ISLAND entire of itself; every man is a piece of the CONTINENT, a part of the MAIN. If a CLOD be washed away by thee SEA, EURPPE is the less, as well if a promontory were, as well as if a manor of thy friends of THINE OWN were. Any man's death diminishes ME, because I am involved in MANKIND. AND therefore never send to know for whom the BELL tolls: it tolls for the.'-

সব্বে সত্তা সুখিতা হন্তু
সকল সত্তা সুখী হোক।

তথ্যসূত্রঃ

Biodiversity: Social and Ecological Perspctive, Vandana Shiva and others, World Rainforest Movement, Peaing, Malaysia, 1991.

If you Love this planet, Helen Caldecott, Norton co, London, 2009

The Rise of the Green Left, Derek wall, Pluto press, Lorton 2010.

পরিবেশ বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ, পরমেশ চৌধুরী, প্রকাশক জি, সাহা, কলিকাতা, ১৪০৫

A selection of prose By John Donne, The Folio Society, London, 1997.

সাত রং, কিশোর মাসিক, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ব্রাক সেন্টার, ২০০৯।

আরজ আলী মাতুব্বর শান্তনু কায়সার, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ১৪১৬।

আরজ আলী মাতুব্বর স্মারক বক্তৃতা, ১৪১৭

www.pathagar.com

শিক্ষা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ব্রাত্যজনের শিক্ষাচিন্তা

ডায়না মিলারের সঙ্গে শিক্ষা-সংক্রান্ত দীর্ঘ আলোচনায় আমি যেটুকু পুঁজি লগ্নি করেছিলাম তার সবটুকুই আমার বাল্যবন্ধু মাখমদ, মকদ্দস আর সুখেন্দুর কাছ থেকে ধার করা। আলোচনাটিকে একটি প্রবন্ধের আকার দেবার সময় তাদের কথাই বার বার মনে পড়ছে। সিলেট জেলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের এ বাসিন্দাত্রয়, যাঁদের জীবনে অধীত শিক্ষা কোনোই ফল ফলায় নি, লেখাটি হয়ত কোনদিন তদের চোখে পড়বে। তারা আজকাল মাঝে মাঝে স্টেশনের চায়ের স্টলে বসে সংবাদপত্র পড়ে।

আমরা চারজন বহু বছর ধরে একসঙ্গে স্কুলের পথে হেঁটেছি। আমাদের স্কুলের দূরত্ব গ্রাম থেকে তিন মাইলেরও বেশি। রেলসড়ক ও লোকালবোর্ডের রাস্তা দুটিই আমরা ব্যবহার করতাম। গ্রামের কাছেই রেলস্টেশন। কিন্তু কোনোদিন ট্রেনে স্কুলে যাবার কথা মনে পড়ে না। তখন বৃটিশ আমল। সবকিছু নিয়ম মতো চলত। গ্রামীণ স্কুলের ক'টি ছাত্রের জন্য ট্রেনের টাইম-টেবিল বদলান সেদিন সম্ভব ছিল না।

সেকালে ঘাসে-ঢাকা লোকালবোর্ড সড়কটাকে বড়ই নিষ্প্রাণ মনে হত। সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা দীর্ঘ তিন মাইল পথেও তেমন লোকজনের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটত না। কোথাও মাঠের উন্মুক্ততা পার হয়ে, কোথাও ছায়াঘন গ্রামের বুক চিরে শেষে ওটি থানাসদরেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের জীবনে রাস্তাটির কোন ভূমিকা ছিল না। দরিদ্র গ্রামীণ মানুষের না ছিল সাইকেল, না থাকত পায়ে জুতা। একমাত্র বাজারবারেই ভিড়। অন্য সময় থাকত প্রায় জনহীন।

আর আমাদের স্কুল! ওটি ছিল স্থানীয় জমিদারদের কীর্তি। সর্বসাকুল্যে দুটি মাত্র ঘর। একটির মেঝে পাকা, ওখানে ছিল উচ্চশ্রেণীর ক্লাস আর শিক্ষকদের কমনরুম। কাঁচা ঘরটিতে নিম্নশ্রেণীর ক্লাস বসত। মাঝের ফাঁকা জায়গাটির কোণে ছিল একচিলতে ফুলবাগান, আর বাকিটায় ব্যাডমিন্টন ও ভলিবলের মাঠ। স্কুলে ধর্মঘট দেখিনি। শুধু বিয়াল্লিশের আন্দোলনে স্কুল-ক্যাপ্টেনকে থানা অবধি এগিয়ে দেয়া একটি শোভাযাত্রার কথাই মনে পড়ে। শিক্ষকরা ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ আর ছাত্রেরা একান্ত অনুগত।

স্কুলের এ পথযাত্রায় পূর্বোক্ত তিন বন্ধু একে একে যাত্রাভঙ্গ করেছিল। মাখমদই প্রথম। ক্লাসের ফার্স্টবয় হলেও হঠাৎ তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল। সে তখন ষষ্ঠ

www.pathagar.com

শ্রেণীতে। তার ভাই একদিন বললেন, মাখমদকে পড়ান তার সাধ্যাতীত। ওর নাকি দোকানে বসা দরকার। অতত্রব মাকমদ ষষ্ঠ শ্রেণীর ফার্স্টবয়, অশেষ সম্ভাবনার আকর, দোকানী হল। পণ্ডিত মশায় দুঃখ করলেন। গণিতের শিক্ষক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমরা নিঃসঙ্গ বোধ করলাম। কিন্তু এ পর্যন্তই। তারপর এল সুখেন্দুর পালা। সে ছিল অবিকল রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেটা'। স্কুলে 'মার খায় দমাদম, গাল খায় অজস্র'। সপ্তম শ্রেণীতে সে ফেল করল। কর্মকার বাবা ওর পড়া বন্ধ করে দিলেন। মকদ্দস চমৎকার রচনা লিখত। শ্রুতলিপিতে কোনোদিন বানান ভুল হত না। তবু তারও পড়া হল না। কোন এক পীর সাহেবের প্ররোচনায় ইংরেজি স্কুল থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে মাদ্রাসায় পাঠান হল। ওখানে সে পড়তে চাইল না। কিছুদিন টানাপোড়েনের পর শিক্ষাজীবন থেকে ছিটকে পড়ল। এখন চাষবাস করে। সুখেন্দু লোহা পেটাচ্ছে। মাখমদের দোকান চলছে। তারা সকলেই বেজায় বুড়িয়ে গেছে। বহু ছেলেমেয়ে, সংসার আর দারিদ্র্যের ভার ওদের মাথায়। শিক্ষা তাদের তেমন কিছু কাজে আসেনি। আমাদের দেশে গ্রামীণ হাটের দোকানদারি, কর্মকারবৃত্তি এবং চাষাবাদে শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন, নিরর্থক।

তারপর তিন দশকেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। আমি কিছুকাল ঢাকায় অধ্যাপনা করে এখন বিদেশবাসী। মাঝে মাঝে দেশে যাই। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়। সেই পুরনো পথে স্মৃতিসন্ধানে স্কুলে যাই। অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ে। পথের বুকে এখন সবুজ ঘাসের বদলে অঢেল নুড়ি। সেই নির্জনতা নেই। চলছে সশব্দে বাস ট্রাক রিক্সা, উড়ছে ধূলা। সমুদ্রশায়িত নদীর মতো পথটি আজ বেগার্ত। শহরের সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে। এ পথে স্কুলযাত্রী ছেলের সংখ্যা বহু। আছে মেয়েরাও। রেলপথেরও কিছুটা গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। গাড়ির সেই জৌলুস নেই, নেই চুলচেরা সময়-চেতনা। বহু ছেলেমেয়ে ট্রেনে চড়ে স্কুলে যায়। ট্রেন তাদের সময়মতো স্টেশনে আসে, কখনো-বা ওদের জন্য একটু দেরিও করে।

আর স্কুল! তারও বাড়-বাড়ন্ত। জমিদারদের রায়াতিপনার দিন গেছে। উঠেছে নতুন দালানকোঠা, বিজ্ঞানবিভাগ। এসেছে সহশিক্ষা। বহু ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা। আজকাল ধর্মঘট হয়। শিক্ষকদের সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেই। যুগের দাবি অনুযায়ী তারা বেশ নমনীয়। কিন্তু এ সবই মাত্রিক পরিবর্তন। গুণগত পরিবর্তন নয়। ছাত্রছাত্রীদের যে ক'জন প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হয়, তাদের ভগ্নাংশ উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়। অন্যরা বেকার থাকে এবং ফেল ও ড্রপ-আউটদের দলভুক্ত হয়। তারা কিছুদিন চায়ের স্টলে আড্ডা দেয়, শহরে চাকরি খোঁজে এবং শেষে যথানিয়মে অচলায়তন কৃষিজীবনে আত্মসমর্পণ করে। অধীত শিক্ষা তাদের কোনোই কাজে আসে না। আজ তিন দশক পরও আমাদের শিক্ষা মাখমদ, সুখেন্দু, আর মকদ্দসদের জীবনে কোনো গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। শিক্ষা এখনো সেই

www.pathagar.com

সাবেকি আমলের পোশাকি ব্যাপার। জনজীবনের কোন স্থিতিমাপের সঙ্গেই যুক্ত নয়। এটি বহিরঙ্গীয় এবং এক বিরাট ইলিউশন।

মিলারকে আমি সেই কথাই বলেছিলাম। আমি আমাদের স্কুল ও পাশের লোকাল-বোর্ড সড়কের মধ্যে একটি তুলনার সাহায্যে বোঝাতে চেয়েছিলাম, সড়কটি বড় শহরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে, কিন্তু পাশের স্কুল আজও নিজ উজ্জীবনের উৎসটি খুঁজে পায়নি।

ডায়না মিলারের সঙ্গে মস্কোর এক রেস্তোরাঁয় আলাপ। তিনি ব্রিটিশ নাগরিক। তাঁর পিতা জার্মান, মা রুশ। রাইখস্টাগে আগুন লাগার পর ফ্যাসিস্ট নির্যাতন এড়ানোর জন্য পিতা যখন ইংল্যান্ড পালান, তিনি তখন শিশু। ওখানেই লেখাপড়া। পেশায় তিনি সাংবাদিক, রাজনীতিতে শ্রমিকদলের সদস্য। গণিতের ওপর বই লিখেছেন, শিক্ষা সম্পর্কে খুবই উৎসাহী। আলাপ জমে উঠল। বললেন, 'শিক্ষা সম্পর্কে নতুন ধারণার জন্য নৈরাজ্যবাদীদের বই পড়া উচিত।' তাঁর মতে, আমাদের স্কুলে ছেলেদের জন্য জুতা তৈরি ও চুলকাটা আর মেয়েদের জন্য রান্নাবান্না ও পোশাক তৈরির শিক্ষাক্রম বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। উন্নয়নশীল দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্যপাশ যুবক-যুবতীরা যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে পারে, এ সম্পর্কে তিনি আশাবাদী। পোশাকি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকেই নাকি এদের পক্ষে কেবল আদর্শ ও নিষ্ঠার যাদুমন্ত্রেই একটা 'ব্রেক থ্রু' ঘটান সম্ভব। এমনটি পূর্ব জার্মানিতে ঘটেছে। সেখানকার ৯০ শতাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা ফ্যাসিস্ট ছিল। যুদ্ধ শেষে ওদের বদলান হয় সদ্যপাশ প্রগতিশীল তরুণ-তরুণীদের দিয়ে। ওরা শিক্ষাবিজ্ঞানের কিছুই জানত না। নিজেদের সাধ্যমতো জ্ঞানবুদ্ধি দিয়েই কাজ করেছিল। শেষে নাকি ফল ফলেছিল অভাবিত। আমাদের দেশে স্কুলে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যয় এবং আনুষঙ্গিক জটিলতা নিয়েও তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁর মতে, ল্যাবরেটরির সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সবই বাহ্য। মূল প্রাণশক্তি শিক্ষক। তিনি উদ্যমী হলে ছাত্রদের সাহায্যে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ ও নির্মাণ তেমন কিছু দুঃসাধ্য নয়। একটি 'টুল্‌স-বক্স' দিয়েই একজন শিক্ষক যাদু সৃষ্টি করতে পারেন। মনে পড়ল ড. লিভিংস্টোনের কথা। আমাদের এক মার্কিন অধ্যাপক। মাত্র এক বছর অধ্যাপনা করেছিলেন। শারীরবৃত্তের প্রায়োগিক পরীক্ষা সাজ-সরঞ্জামের অভাবে আমাদের বিভাগ থেকে উঠে গিয়েছিল। দেখলাম, তিনি নিজেই কতো সাধারণ যন্ত্রপাতি বানিয়ে কঠিন সব পরীক্ষা করছেন। তাঁর কাজে কোন বয়-বেয়ারা প্রয়োজন হত না। নিজেই ঘাড়ে করে জিনিসপত্র বয়ে আনতেন। অক্লেশে উঠে আসতেন একতলা থেকে তিনতলায়। প্লাস্টিকের মোজায় কোমর অবধি ঢেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে শেওলা, আগাছা তুলতেন। শেষে উদ্ভিদসন্ধানে সারা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘুরে এলেন এবং পায়ে হেঁটে। ছাত্ররা একবছরে তাঁর কাছ থেকে শুধু নতুন বিষয়ই শিখল না, দিব্যদৃষ্টিও পেল।

www.pathagar.com

আলোচনাটি শেষে মাখমদ, সুখেন্দু আর মকদ্দসদের প্রসঙ্গে এসে ঠেকেছিল। আমাদের গ্রামীণ ছাত্র-ছাত্রীরা যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ভাল ফল করতে পারে না, তার একটি কারণ দারিদ্র হলেও তা একমাত্র কারণ নয় এটাই ছিল আমার বক্তব্য। আমার যুক্তি ছিল এরূপ : আধুনিক শিক্ষা সর্বৈব শিল্পবিপ্লবোত্তর উইরোপের এবং সেজন্য তা নাগরিক পরিবেশের তথা শিক্ষিত পারিবারিক প্রতিবেশের অধিকতর উপযোগী। একটি গ্রামীণ শিশুমন প্রাকৃতিক প্রতিবেশ থেকে, সেখানকার জীবনধারা থেকে যে উদ্দীপনা ও অন্যান্য উপকরণ আত্তীকরণে লালিত হয় তার সঙ্গে শিল্পপ্রধান সমাজের শিক্ষা-উপকরণের বৈপরীত্য আছে। তাই এ শিক্ষা তার কাছে অনাকর্ষী এবং পরকীয় হয়ে ওঠে (শিক্ষকের উদ্যত বেতের কথা নাই-বা ধরা হল)। তার জগতের শিক্ষাদর্শীর অভাবে তার পাঠ্যবিষয়ে 'গোবরেপোকা' এতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, কোনোদিন 'ব্যাঙের ঘাঁটি' কথাটি কিংবা 'নেড়ি কুকুরের ট্র্যাজেডি' লেখা হয় না। যে-শিশু দু'পায়ে দাঁড়ানোর পরই উঠোনে কাদামাটি ছানে, ফড়িং ধরে, চাষবাসের ও মাছ-ধরার উপকরণ দেখে, বইপত্র যার চোখেও পড়ে না, তার পক্ষে বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ান, নদীতে মাছ-ধরা, গাছের মগডালে পাখির বাচ্চা খোঁজার সঙ্গে স্কুলের বন্দী বেষ্টনীতে বইয়ের পাতার সজ্জাহীন নীরস তথ্যের বিমূর্ত বস্তু থেকে জ্ঞানার্জনের বিরক্তিকর মল্লযুদ্ধ কি তুলনীয়? এভাবেই আধুনিক শিক্ষার উপকরণ ও পদ্ধতি এ-দুয়ের সঙ্গেই তার অন্তর্লীন এক বিরোধ গড়ে ওঠে এবং শেষবধি তার শিক্ষাজীবনে ব্যর্থতা দেখা দেয়।

মিলার বললেন, সমস্যাটি পাশ্চাত্যেও কিছু কম প্রকট নয়। তবে সেখানে অধিকাংশ মানুষই শহরবাসী বলে প্রতিবেশগত পার্থক্যটা আমাদের দেশের মতো এতো দুস্তর নয়। তবুও সেখানে এ নিয়ে নানা গবেষণা চলছে। আমাদের গ্রামীণ শিশুদের প্রাক-স্কুল পর্যায়ে শিশুভবনের আধুনিক শিক্ষাপোযোগী পরিবেশে রাখার কথাটি প্রসঙ্গত ভাবা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে বাস্তবে এটা সম্ভব নয়। যে-দেশে আজও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয় সেখানে গ্রামাঞ্চলে প্রাক-স্কুল পর্যায়ের শিশুভবন দিবাস্বপ্ন।

ডায়না মিলারের মতামত এক অর্থে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পর্যাপ্ত জ্ঞান ও সহমর্তিতা সত্ত্বেও একজন বিদেশির পক্ষে যে অন্য দেশের সমস্যার সমাধান দেওয়া সুকঠিন এখানেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। চুলকাটা ও জুতা তৈরি আমাদের দেশে পেশা হিসেবে কেন অনাকর্ষী এবং স্কুলের শিক্ষাক্রমে এগুলোর সংযোজন যে অসম্ভব, তা মিলারকে বুঝানো শক্ত। তাছাড়া আমাদের দেশে জুতার ব্যবহার যেমন সীমিত, তেমনি চুলকাটার লোকও অঢেল। একটি 'টুল্‌স বক্স' নিয়ে নিজ উদ্ভাবনী ক্ষমতা খয়রাত করে গ্রামের বিজ্ঞানশিক্ষায় যাদুসৃষ্টির মতো শিক্ষক আমাদের দেশে দুর্লভ। জার্মানিতে যা সম্ভব, বাংলাদেশে কেন তা সম্ভব নয়, মিলার তা না বুঝলেও

www.pathagar.com

তাকে দোষ দেওয়া যায় না। তঁার কাছে আমাদের ঘুণে-ধরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিস্তারিত বিবরণী দাখিলে আমি সঙ্কোচ বোধ করেছিলাম। বলতে চাইনি, আমাদের এসব বিদ্যায়তন গবেষণা, নতুন শিক্ষাদৃষ্টি কিংবা শিক্ষার মানোন্নয়নে কোনই উল্লেখ্য অবদান রাখে না। এগুলোও শিক্ষার ইলিউশন সৃষ্টিকারী সংস্থারই প্রতিরূপ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের গ্রামে পাঠান যেমন কঠিন, তেমনি অচলায়তন গ্রামীণ সমাজে কোন 'ব্রেক থ্রুও' তাদের পক্ষে অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কী শিক্ষা দেয়, নাকি শিক্ষা-পরবর্তী জীবনে এরূপ কোন প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ তাদের আছে? কায়িক শ্রমে অনীহ, পারিপার্শ্বিক সম্ভাবনা সম্পর্কে অজ্ঞ, চাকরিসন্ধানী, কল্পনাবিলাসী কিছু তরুন-তরুণী সৃষ্টিতেই আমাদের শিক্ষার মূল পুঁজি অবসিত হয়। বলা বাহুল্য, অপচয়িত জনশক্তির নজির হিসেবেই নয়, বিক্ষোভপ্রবণ শ্রেণী হিসেবেও এরা একটি সুস্থিত সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। অথচ আমাদের শিক্ষা আজ এই মারাত্মক অনুঘটকই তৈরি করে চলেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা যে সমাজের মূল কাঠাম তৈরি করে, তার ওপরই ভর দিয়ে যে সংস্কৃতির পুরো অবয়বটি দাঁড়িয়ে থাকে, এ-সম্পর্কে সন্দেহ না থাকালেও মাধ্যমিক শিক্ষার কোনই পরিবর্তন ঘটান হচ্ছে না কেন? একাধিক কমিশন সত্ত্বেও আমরা আজও সেই তিমিরেই আছি। কেউ কেউ মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। তাদের মতে, একই বিদ্যায়তনে অষ্টম শ্রেণীর পর বৃত্তিমুখী ও সাধারণ এ দুই শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হওয়া উচিত। কিন্তু এ ব্যবস্থা বাস্তবানুগ মনে হয় না। আসলে স্কুলশিক্ষার এ বিভক্তি বিভ্রান্তিই ঘটাবে। মাধ্যামিক শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করার জন্য এ শিক্ষার মানোন্নয়নসহ এতে কায়িক শ্রমের অনুষঙ্গ হিসেবে কৃষি ও কিছু কারিগরি বিষয় যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষায় বৃত্তিমুখিনতার যদৃচ্ছা অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বিদ্যালয়িক শিক্ষার গুরুত্বের তরলীকরণ সম্ভবত সঠিক নয়। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর দেশীকরণ, বাস্তবানুগকরণের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাক্ষেত্রে কড়াকড়ি ও নতুন ব্যবস্থা আরোপিত হওয়া দরকার। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ সুবিধার অবকাশ সৃষ্টি না করে আমাদের দেশে আলাদাভাবে ব্যাপক হারে কৃষি ও কৃৎকৌশল সংক্রান্ত বহুমুখী বিদ্যালয় খোলা উচিত, যেখানে মাধ্যামিক শিক্ষা-উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অনুত্তীর্ণ এবং ড্রপআউটদেরও স্থান হবে। শিক্ষার মানোন্নয়নের নামে শিক্ষার সুযোগ হরণ কোন কাজের কথা নয়। কিন্তু আমরা তত্ত্বীয় উচ্চশিক্ষায় যেন মোহাবিষ্ট। শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিমধ্যে যত দাবি উঠেছে ও পরিবর্তন ঘটেছে, তা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা নিয়ে, কলেজে অনার্স, এম.এ. ও এম.এস-সি খোলা নিয়ে। এটি মধ্যবিত্ত বিভ্রান্তিরই নামান্তর। কেউ মাখমদ, সুখেন্দু ও মকদ্দসদের কথা ভাবেন না। কারণ, সমাজের যে-স্তরে এদের অবস্থান তার শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাদের শিক্ষিত

www.pathagar.com

সমাজ সচেতন নয়। অথচ সমস্যা ওখানেই মূলীভূত এবং তার সমাধানের অভাবেই আমাদের উচ্চশিক্ষাও আজ বিষ্টব্ধ। আমাদের এমন একটি মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা দরকার যা দেশে কৃষি ও শিল্প-বিপ্লবের অনুকূল প্রতিবেশ তৈরি করবে। শিল্পবিপ্লবের দিনে আজকের মতো কেন্দ্রীভূত কলকারখানা ইউরোপে ছিল না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যে উৎপাদিকা শক্তির উৎরসণ ঘটিয়েছিল শিল্পক্ষেত্রে তাই বিপ্লব সৃষ্টি করে এবং এরই অভিঘাতে পুরন অচলায়তন ফিউডাল সমাজ ভেঙে যায়। আমাদের তরুণদের এমন শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন যা দেশের মাটিতে বন্দী সেই শক্তির উচ্ছ্বয় ঘটাতে তাদের হাতিয়ার হয়ে উঠবে। সেই শক্তি-উৎসের চাবিকাঠি খুঁজে পেলে তারা গ্রামাঞ্চলের অচলায়তনে বন্দী সম্ভাবনা মুক্ত করতে, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের দানবকে হঠাতে পারবে। আর তখন গ্রামাঞ্চলের রূপবদল ঘটবে, গড়ে উঠবে নতুন সমাজ-সম্পর্ক, নতুন জীবন। এজন্য শিক্ষা সম্পর্কে একেবারে নতুন চিন্তাধারা প্রয়োজন, দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে জীবন যোগ করা আবশ্যক। এভাবেই আমরা শিক্ষায় প্রাণসঞ্চারী মাত্রা যোগাতে পারব আর তখনই আমাদের স্কুল আর পাশের লোকাল-বোর্ড সড়কের মধ্যকার পার্থক্য ঘুচবে, শিক্ষা মূল্যহীনতার দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পাবে এবং মাখমদ, মকদ্দস ও সুখেন্দুরা আর শিক্ষাহীন দুর্ভ্যাগ্যের শিকারে পরিণত হবে না। আর তা না হলে মাখমদ, সুখেন্দু আর মকদ্দসদের স্কুলযাত্রী ছেলেমেয়েরা তাদের পিতাদের মতো নীরবে নিজ দুর্ভাগ্যে আত্মসমর্পিত হবে না, তারা সমাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, সকলের জন্য মর্মান্তিক দুঃখ ডেকে আনবে।

১৯৭৭

www.pathagar.com

শিক্ষার মুখ ও মুখোশ

আদর্শ বনাম বাস্তব

আমাদের দেশে আছে ত্রিমুখী – বাংলা, ইংরেজি, ইসলামী শিক্ষাধারা। অনেকেই চান একমুখী শিক্ষা অর্থাৎ বাংলা ও ইংরেজির মিশ্রমাধ্যমের একই ধরনের পাঠ্যক্রম। অবশ্যই এটি আদর্শ, কিন্তু বাস্তব নয়। কেন নয় তা ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। চোখ-কান খোলা রাখলেই বোঝা যায়। ইসলামী ও ইংরেজি ধারার শিক্ষার সংকোচন বাস্তবসম্মত নয়। ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা বিশ্বায়নের যুগে আরেকটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। অধিকন্তু আমাদের সাধারণ শিক্ষার দৈন্যদশার পরিপ্রেক্ষিতে বিত্তবানদের ইংরেজি মাধ্যমের দিকে আকৃষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। চাহিদা ও সরবারাহের নিয়মকে ঠেকান যায় না। এই পরিস্থিতিতে সামঞ্জস্য সৃষ্টির একটিই পথ – প্রথম ধারার ব্যাপক সংস্কার ও উন্নয়ন। কিন্তু কাজটি কত কঠিন আমাদের ডজনখানেক শিক্ষাকমিশনের প্রতিবেদনগুলোর দুর্দশার মধ্যেই স্পষ্ট। সবচেয়ে বড় আঘাতটি এসেছে কুদরত-এ-খুদা শিক্ষাকমিশনের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যানে।

আমাদের সমাজ মধ্য ও আধুনিক যুগের একটি মিশেল। তাই মনোজগতেও আছে পশ্চাৎমুখিনতার নানা জঞ্জালের জট, সেগুলোর মধ্যে আছে কার্যকর গণতন্ত্রের প্রতি অনীহা ও আমলাতন্ত্রে আসক্তি, যা একটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা নির্মাণের বড় প্রতিবন্ধ। আমরা কেন স্কুল-কলেজের সরকারিকরণ চাই, স্বায়ত্তশাসন নয়? উত্তর সহজ। সরকার ও শিক্ষক উভয়ই আমলাতন্ত্রে আস্থাশীল। আমলানির্ভর সরকার সবকিছুই নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, বিকেন্দ্রীকরণ ঠেকাতে চায়। জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য অনেক সময় কিছু কৃত্রিম ব্যবস্থাও উদ্ভাবিত হয়, আমরা সেগুলোর নতুনত্বে কিছুদিন আবিষ্টও থাকি। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ধারণাটি এমন একটি নজির হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যাদের স্বচ্ছ ধারণা আছে তারা ভালই জানেন এই মেলবন্ধন কতটা অবাস্তব ও স্ববিরোধী। কলেজের তুলনামূলক পলকা কাঠামোর ওপর সাধ্যাতীত, দুর্ভর এই বোঝা চাপান সাময়িক হলে গ্রহণযোগ্য, অন্যথা বলতেই হয়, এটি একটি নিকৃষ্ট অব্যবস্থা। আমি অনেক বছর কলেজে শিক্ষকতা করেছি, কলেজের সামর্থ্য ভালই জানি, তাই সেখানকার স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তা হয়।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার শীর্ষ মেধাতালিকাটি ঢাকাসহ বড় বড় শহরের শিক্ষার্থীদেরই দখলে থাকে। কারণ সহজবোধ্য। কিন্তু গণ্ডগ্রামের সুবিধাবঞ্চিত শ্রমজীবী দীনহীন কিছু ছাত্রছাত্রীরা জিপিএ-৫ পাওয়া রহস্যই থেকে যায়। কাগজে তাদের ছবি দেখি, জীবনবৃত্তান্ত পড়ি, আনুষঙ্গিক আরো নানা কথা শুনি, কিন্তু এই ব্যতিক্রমী ঘটনার কারণ কেউ ব্যাখ্যা করেন না। এটা কি প্রতিভা, মজ্জাগত ইচ্ছাশক্তি? শহুরে যেসব বিত্তবান কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা গুনে ছেলেমেয়েকে কোচিং সেন্টারে পাঠান বা একাধিক গৃহশিক্ষক রাখেন তারাও নিশ্চয়ই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবেন। আমিও ভাবি। ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ে। নিজে নিজে পড়েই পরীক্ষা দিয়েছি, ফল খারাপ হয়নি, গৃহশিক্ষক থাকলে আরো ভালো হতো, অস্বীকার করি না। এই সমস্যার সমাধান কী? অনেক কিছুই ভাবা যায়, কিন্তু বাস্তব বড়ই কঠিন।

এই ছেলেমেয়েরা তাই গোটা শিক্ষাব্যবস্থার সামনে একটা চ্যালেঞ্জ হয়েই থাকবে। আমরা যাকে প্রতিভা বলি তার রকমফের আছে, সবাই প্রচলিত ধারার পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পারে না, শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটিও আছে, রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেটা' কবিতাটি মনে পড়ে। ভ্যারিয়েশন বা বৈচিত্র্য প্রকৃতির নিয়ম, সে সেটাকে বিবর্তনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে আদর্শ প্রজাতি প্রস্তুত করে। কিন্তু প্রকৃতির এই প্রক্রিয়া অতিনিষ্ঠুর, সমাজে তার অনুমোদন নেই, মানুষের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্যও নয়, তবু সেখানেও প্রতিযোগিতা রাখা হয়েছে এবং আমরা নিরুপায় বলেই। একটি বেয়াড়া বা অমনোযোগী ছাত্রকে আমরা গালমন্দ করি, কিন্তু তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারি না। এটা মানুষের উদ্ভাবিত শিক্ষার সীমাবদ্ধতা। শিক্ষাচিন্তকরা নানা ধরনের শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবন করেছেন, তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালিয়েছেন, সবই আমাদের জানা, কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ কঠিন। জীবন একটি সংগ্রাম, সেখানে ভাল ছাত্র হওয়াই যথেষ্ট নয়, অথচ আমরা এই একমুখিনতায় আবিষ্ট, তাই বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক সেরা ছাত্রছাত্রী জড়ো করি, প্রতিভার বৈচিত্র্যকে প্রশ্রয় দিই না, কিংবা দিতে পারি না। তাই শেষ পর্যন্ত সকল দায় বর্তায় শিক্ষকদের ওপর, যাদের আমরা মানুষ গড়ার কারিগর বলি। কিন্তু সীমাবদ্ধ দুর্বল অবকাঠামো নিয়ে, নিজের আর্থিক অসচ্ছলতার বোঝা টেনে এই দায়িত্ব পালন কীভাবে সম্ভব?

আমি একটি ইংরেজি মাধ্যম কলেজে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছি যেখানে বিজ্ঞান অনুষদে কেবল প্রথম বিভাগের ছাত্ররাই ভর্তি হতে পারত। একবার পরীক্ষামূলকভাবে দ্বিতীয় বিভাগের কিছু ছাত্রকেও আমরা ভর্তি করি এবং তারা সকলেই প্রথম বিভাগে পাস করে। এটা কি আজ সম্ভব? আমাদের ছাত্র ও শিক্ষক দুটির নির্বাচনই কৃত্রিম। পরীক্ষার ভালো ফল সর্বদা যে নির্ভরযোগ্য সূচক নয় তা

www.pathagar.com

সকলেই জানেন, কিন্তু তা পরিহার করতে পারেন না, অবস্থাবৈগুণ্যে পারা যায় না। এটা অন্যায় ও অপচয়, অথচ আমরা নিরূপায়। এক বিয়ের আসরে একটি নামি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সাবেক উপাচার্যের কাছে বসার সুযোগ ঘটে। তিনি সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপের সূত্রে বলছিলেন, তার আমলে চাকরিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথমদেরই নিরঙ্কুশ অগ্রাধিকার ছিল। বলতে পারতাম তেমন ব্যক্তি যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হবেন তা তিনি কীভাবে বুঝতেন? বলিনি কিছুই, কেননা কৃত্রিমতাই আমাদের একটা বড় আশ্রয়, স্বাধীনতার সীমানা এ দেশে বড়ই সীমিত।

আমাদের মতো একটি জনবহুল উন্নয়নশীল দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আদর্শ বিদ্যালয় ও আদর্শ শিক্ষক গড়ে তোলা কঠিন, অসম্ভব বলাও অত্যুক্তি নয়। বিপ্লবোত্তর রাশিয়া দ্রুত শতাংশ গণসাক্ষরতা অর্জনে সফল হয়েছিল, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে জড়ো করে আদর্শ পরিবেশে উচ্চশিক্ষা দিয়েছিল এবং এভাবেই নির্মাণ করতে চেয়েছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবকাঠামো। পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোতে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সমান্তরালে শিক্ষাব্যবস্থারও উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু রাশিয়া কাজটি করেছিল অনুন্নয়নের পরিস্থিতিতে, একটি সভ্যতা নির্মাণের স্বপ্নের শক্তিতে। আমাদের রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদরা কি স্বপ্নের শক্তিকে গুরুত্ব দেন? ভালোবাসা ও স্বপ্ন সন্ধিবদ্ধ সত্তা, আমাদের দেশে দুটোরই বড় আকাল।

একটি দ্বন্দ্বের কূটাভাস

স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিব্যাপ্ত ও প্রগাঢ় পরিস্থিতিতে কত স্বপ্নই না দানা বাঁধে। তেমনই একটি স্বপ্ন ছিল আমাদের সকলের– মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার দ্বারোদ্ঘাটন। আমি তখন কলেজ শিক্ষক, পড়াই ইংরেজি মাধ্যমে। সেখানকার গ্রন্থাগারে প্রাণবিজ্ঞানের বিদেশি পাঠ্যবই পড়তাম আর ওগুলো আমাদের পাঠ্যক্রমের পশ্চাৎপদতার দিকে বারবার আঙুল তুলত। ভাবতাম, দেশটি স্বাধীন হলে এসব বই ও অজস্র আকরগ্রন্থ অনূদিত হবে, মাতৃভাষার সুপ্তশক্তির উচ্ছ্বয় ঘটবে, ছেলেমেয়েরা ইংরেজির সমতুল্য একটি ভাষায় পড়বে। স্বাধীনতার পর সেইসব ইংরেজি বইয়ের ধাঁচে শক্ত বাংলায় দুটি পাঠ্যবই লিখেছিলাম। না, শিক্ষার মূলস্রোতে সেগুলোর ঠাঁই হয়নি, স্থান পেয়েছে ফুটপাতে। ভাগ্যিস বিদেশে ছিলাম, হতাশ প্রকাশকদের গালমন্দ শুনতে হয়নি। মস্কোয় প্রগতি প্রকাশনে যোগ দেয়ার পর প্রথম যে-বইটি সেটি *রেসেস অব ম্যানকাইন্ড*, নৃতত্ত্বের বই, ছাত্রদের কথা মনে রেখে অনুবাদ করেছিলাম কঠিন বাংলায়। পশ্চিম বাংলার জনৈক পাঠক জানতে চান বইটি কেন দুষ্পাঠ্য ও সুধীনদত্তীয় গদ্যে অনূদিত? উত্তরে বলি – বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই হিসেবে লিখেছি। ছাত্রদের মতামত অবশ্য জানতে পারিনি, তবে দু'একজন শিক্ষক তাদের অনুমোদনের কথা জানিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

ভাব ও ভাষা সন্ধিবদ্ধ এবং ভাবই ভাষার নিয়ন্ত্রক। ভাবের অর্থাৎ জ্ঞানসম্পদের অভাব ঘটলে ভাষারও অবনতি ঘটবে আর আমাদের দেশে মাতৃভাষার বর্তমান দৈন্যদশা এজন্যই এবং তার মূলে আছে ইংরেজির সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ। আমার কাছে এখনো কিছু লেখক-ছাত্র আসে, তারা লেখেও ভাল, তবে হালকা বিষয়ে। আমি তথ্য জুগিয়ে তাদের সাহায্য করতে পারি না। বই দিতে গেলে নিতে চায় না, কেননা ওগুলো সবই ইংরেজিতে লেখা। আজ ইন্টারনেট বিশ্বের যে-জ্ঞানভাণ্ডার সবার জন্য উন্মুক্ত করেছে তা তো সবই বিদেশি ভাষায়, ছেলেমেয়েরা সুযোগ নেবে কীভাবে? পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে শুনেছি মিশ্রমাধ্যমে অর্থাৎ ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে পড়ান হয়। জানি না তাতে কতটা সুফল ফলছে। আমার মতে ইংরেজি বই পড়ার ও বোঝার দক্ষতা ছাড়া আমরা আপাতত নিরূপায়। আমাদের ভাষা জড়িয়ে গেছে রাজনীতির সঙ্গে সেই ১৯৪৮ সাল থেকেই এবং আমাদের শক্তি জুগিয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ নির্মাণে, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায়। ভাষার একটা বিমূর্ত শক্তিও আছে আর সেটা প্রথম টের পাই ১৯৬৯ সালে যখন দেখি এইচএসসি পরীক্ষায় অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই উত্তরপত্র লিখেছে বাংলায়। আমার নিজের ইংরেজি মাধ্যম কলেজেই জীববিদ্যায় দু'শোর মতো ছাত্র ছিল, অন্যান্য কলেজে আরো বেশি, তবু অবাঙালি পরীক্ষকদের দেয়ার মতো যথেষ্ট খাতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোথায় তারা পেল বাংলা পাঠ্যবই, তেমন শিক্ষক, কিছুই আমরা আঁচ করতেও পারিনি। হতে পারে আসন্ন স্বাধীনতার স্বপ্ন তাদের পথ দেখিয়েছে, শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে। অথচ এখন, স্বাধীনতার ছত্রিশ বছর পর, আমাদের শিক্ষার প্রধান ধারা অনেকটা অগোচরেই, বাংলা ও ইংরেজিতে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। জাতীয়তাবাদের কিছু নেতির দিকও আছে আর সেটা উগ্রতা ও অন্ধত্ব। আমরা শিক্ষায় ইংরেজির স্থান নিয়ে তাই বিপাকে পড়েছি। আমি দর্ঘিদিন শিক্ষকতায় নেই। অনেক বছর বিদেশে কাটিয়েছি, দেশের বর্তমান শিক্ষা পরিস্থিতির খুঁটিনাটি আমার অজানা, সুতরাং মতামত জানাতে সংকোচ বোধ করি। তবু বলতে দ্বিধা নেই, স্কুলে অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষার কোন বিকল্প নেই এবং সেই সঙ্গে দেশের বিদ্যমান আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত বাংলাভাষার একটি ধারা টিকিয়ে রাখাও প্রয়োজন। উন্নত দেশগুলোতে চাকরির সিংহভাগ থাকে মধ্য-শিক্ষিতদের দখলে, প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষকর্মী বানান হয়, নিয়োগদাতারা উচ্চ-শিক্ষিতদের এসব চাকরিতে নিরুৎসাহিত করেন। আমরাও তা করতে পারি, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজট কমবে, বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ নামের প্রতিষ্ঠানেরও প্রয়োজন ফুরাবে। মাধ্যমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় না হলে যেমন শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বাধাগ্রস্ত হয় তেমনি উচ্চশিক্ষা ইংরেজিবর্জিত হলে জ্ঞান সম্পদের অভাব ঘটে। এই দ্বন্দ্বের সমাধান আবশ্যক।

www.pathagar.com

তাই মনে করি, অনার্স ও স্নাতকোত্তর কোর্স সম্পূর্ণ ইংরেজি হওয়া আবশ্যক। তবে একাদশ শ্রেণী থেকে বাংলা মাধ্যমে স্নাতক পর্যায়ের সবাইকে নিজ নিজ বিষয়ের ইংরেজি পরিভাষা এবং ইংরেজি মাধ্যমের অনার্স ও স্নতকোত্তর কোর্সের সবাইকে অনুরূপ বাংলা পরিভাষা শিখতে হবে। মেডিকেল ও প্রযুক্তি শিক্ষায়ও এই নিয়ম বহাল থাকবে। এটা দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শাসনে থাকার জের ও বাস্তবতা। এভাবেই বাস্তবসম্মত একটা শৃঙ্খলা বিধানের পথ বিশেষজ্ঞরা উদ্ভাবন করতে পারেন। চীন ও জাপানের দৃষ্টান্ত নিরর্থক, তেমন সংঘটিত সমাজ আমাদের নেই। বিদেশি ভাষার বইয়ের বঙ্গানুবাদে আমাদের চাহিদা পূরণ হওয়ার নয়।

অনুসৃতি : একটি স্কুলের কথা

স্কুলটি আদর্শ নয় মোটেও, তবে কিছুটা অদ্ভুত বটে। এটি মস্কোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সাধারণ কর্মচারীদের ছেলেমেয়ের স্কুল। পড়াতেন মস্কোয় উচ্চ শিক্ষারত বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা। দূতাবাস ভবনের দুটি বড় কক্ষকে পার্টিশন দিয়ে চারটি শ্রেণীকক্ষ বানানো হয়েছে। সামনে চওড়া বারান্দা, শিক্ষকদের জন্য একটি ছোট বসার ঘর তথা লাইব্রেরি। এক কোণে রান্নাঘর, একটি খুব ছোট স্টোর রুম। এক সময় রাষ্ট্রদূত আমার স্ত্রীকে, যিনি দেশে অনেক দিন অধ্যাপনা করেছেন, ডেকে স্কুলের দায়িত্ব দেন। আমিও তখন ওই স্কুলের শিক্ষকতায় যোগ দেই। সব মিলিয়ে ছাত্রছাত্রী ১৪, শিক্ষক ৭। প্রধান শিক্ষিকা দর্শনের পিএইচডি, শাহজাহান আলী অর্থনৈতিক-গণিতে, বিজন সাহা পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট, বাকিরা স্নাতকোত্তর শেষে নানা বিষয়ে গবেষণারত। এমন বিদ্যালয় পৃথিবীর কোথাও কোনকালে ছিল বা আছে কিনা জানা নেই।

মস্কোর শহরকেন্দ্রে হলেও দূতাবাসের আশপাশে ছিল অঢেল খোলা জায়গা, প্রচুর গাছ-গাছালি, আরেকটি রুশী স্কুলের খেলার মাঠ, তাতে শরীরচর্চার নানা উপকরণ। টিফিনের ছুটির সময় শিক্ষকরাও ছাত্রদের সঙ্গে ফুটবল খেলতাম, মেয়েরা গাছে উঠত, স্লিপে পিছলাত কিংবা ইচ্ছামত অন্যকিছু।

ছুটি হওয়ার পর শিক্ষকরা পাশের দোকান থেকে চাল-ডাল, শাকসবজি, মাছ বা মাংস কিনে আনতেন, জঙ্গল থেকে মাঝেমধ্যে বাথুয়া ও নটেশাক, শিক্ষিকারা রাঁধতেন, ছাত্রীরাও হাত লাগাত এবং তারপর একত্রে মধ্যাহ্নভোজ। ওইসব গবেষক-শিক্ষকের জন্য ভাত-মাছের এই বাঙালিখানা ছিল একটি বড় আকর্ষণ।

দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের সবাই ছিল সাধারণ মেধার। পঠন বাংলা মাধ্যমে, বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যক্রম অনুসারে, তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত। কোনোদিন স্কুল শিক্ষকতা করিনি, তাই এটি ছিল আমার জন্য এক অচেনা নতুন জগত, অন্তত প্রায়োগিক ক্ষেত্রে। তাই নিজের বোধ ও বুদ্ধি খাটানোর

www.pathagar.com

চেষ্টা শুরু করলাম। সহায়তা জোগালেন সকলে। আমার ফ্ল্যাটে ছিল প্রচুর গাছগাছালি, নিয়ে এলাম বেশিরভাগ এখানে। সাজালাম সবগুলো জানালা, কেননা ওখানেই রোদ পড়ে বেশি। সৌভাগ্যই বলতে হবে, শীতের দেশের ঘর সাজানোর গাছাগাছালি প্রায় সবই উষ্ণমণ্ডলীয়, যেজন্য এই সংগ্রহে ছিল জবা, জুঁই, মানিপ্লান্ট, ফিলোডেনড্রন, দোপাটি, অ্যাজালিয়া, বিগোনিয়া, রক্তকরবী, পুদিনা, ইত্যাদি যাদের অনেকগুলো বাংলাদেশেও জন্মে। কিছু জলজ আগাছাও ছিল অ্যাকুয়ারিয়ামে, সেগুলোও বাংলাদেশী। অঙ্কুরোদ্গম, সালোকসংশ্লেষণে অক্সিজেন নির্গম, অণুবীক্ষণে উদ্ভিদাংশ ও শেওলা পরীক্ষা, সবই রাখলাম ছাত্রছাত্রীদের কৌতূহল বৃদ্ধির জন্য। জীবতাত্ত্বিক ও ভূতাত্ত্বিক জাদুঘর পরিক্রমাও ছিল। আমি জীববিদ্যা পড়ানোর সময় বই বড় একটা দেখতাম না। শিক্ষার্থীরা গাছ দেখে ওগুলোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ছবি আঁকত, গড়ন, পাতা ও ফুল থেকে শ্রেণীবিন্যাস শিখত।

তাছাড়া গরমের সময় আশপাশে অজস্র বনফুল ফুটলে ও পোকামাকড় জুটলে সেটা হয়ে উঠত প্রাণবিজ্ঞান শেখার একটি প্রাকৃতিক ল্যাবরেটরি। অন্যান্য শিক্ষকও তাদের গবেষণার বিষয় নিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করতেন – মহাশূন্য, মৌলকণা, মানুষের শারীরতত্ত্ব, রোগবালাই ও চিকিৎসা, কিছুই বাদ পড়ত না।

আমরা আসতাম ১০টায়। ছাত্রছাত্রীরা ৯টায় বাবার সঙ্গে অফিস টাইমে। স্কুলে শাস্তি, এমনকি বকাঝকাও নিষিদ্ধ। লাইব্রেরির বাক্সে কোনো তালা নেই। এসে দেখতাম কেউ কেউ গল্পের বই পড়ছে, ঘর পরিষ্কার করছে, গাছে জল দিচ্ছে, রেজিস্ট্রি বইয়ে লাইন টানছে কিংবা বারান্দায় রাখা চওড়া টেবিলে টেবিল-টেনিস খেলছে। মেয়েদের আমি এই খেলা শিখিয়েছিলাম এবং তাদের সঙ্গে খেলতাম, যদিও তেমন দক্ষ ছিলাম না। ছাত্রদের কাছে প্রায়ই হেরে যেতাম এবং কলেজে পড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে ভালোই জানতাম কোন খেলায় শিক্ষককে হারাতে পারলে ওদের আত্মবিশ্বাস কতটা বাড়ে এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কতোটা সহজ হয়ে ওঠে। শিক্ষাতত্ত্বে বরাবরই আমার আগ্রহ ছিল। কিছু বইপত্রও পড়েছিলাম, কিন্তু এই বিদ্যালয়েই প্রথম শিশুশিক্ষার জটিলতা সম্পর্কে আমার সম্যক ধারণা জন্মে। আমি বুঝতে শিখি ভালো ও মন্দ ছাত্র সম্পর্কে আমাদের চিরায়ত বদ্ধমূল ধারণা একটি ভ্রান্তি। দোষ ছাত্রের নয়, শিক্ষাব্যবস্থার, শিক্ষাপদ্ধতির এবং অদ্যাবধি আমাদের অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত শিক্ষাবিষয়ক আরো অনেক কিছুর।

আমি তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সব বিষয়ই পড়াতাম – বিজ্ঞান ছাড়াও বাংলা, ইংরেজি, সমাজবিদ্যা ও ভূগোল। ইংরেজির বই দেখে হতবাক। আমরা ছেলেবেলায় কী পড়তাম মনে ছিল। এই বইগুলো আমাদের দেশি পণ্ডিতদের লেখা ফাংশনাল ইংলিশ, কোন কবিতা নেই, *'হাউটু মেইক এ ঢেঁকিপাম্প, 'কিচেন গার্ডেন'* ইত্যাদি প্রবন্ধে বোঝাই। এ যেন কঙ্কাল দেখিয়ে পূর্ণাঙ্গ

www.pathagar.com

মানুষ সম্পর্কে জ্ঞানদানের চেষ্টা। আমরা এই ইংরেজি পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে *'রাডিয়ান্ট ওয়ে'* পড়াতে শুরু করি। সফলও হই। পড়ুয়াদের বইটি মনে ধরে। তাতে উল্লিখিত ফুল, পাখি ও লেখকদের ছবি জোগাড় করে তাদের দেখাতাম। কবিতাও মুখস্থ করাতাম এবং সেই সঙ্গে যথাসম্ভব শুদ্ধ উচ্চারণ। মনে পড়ে, হঠাৎ করেই দেশ থেকে একটি মেয়ে এলো স্কুলে বদলি হয়ে আসা বাবার সঙ্গে। শিক্ষাবর্ষের তখন মাঝামাঝি সময়। সে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী, দেশে পড়ত সাধারণ একটি স্কুলে। বাংলা জানে, কিন্তু ইংরেজি জ্ঞান বর্ণমালা পর্যন্ত। তাকে নিয়ে কী করা? তার কষ্ট, আমাদের কষ্ট আর সহপাঠীদের অবজ্ঞা। মেয়েটি কুঁকড়ে গেল। তার জন্য জরুরি ছিল ভালবাসা। তাই ঢেলে দিলাম আমরা। রাশিয়ার দীর্ঘ শীতে বাইরে চলাফেরা, খেলাধুলা কঠিন। মেয়েটি সেই সুযোগ নিল। অবাক হয়ে দেখলাম সে সহপাঠীদের ধরে ফেলছে এবং এক বছরের মধ্যেই ওদের পর্যায়ে পৌঁছেও গেল।

ইংরেজি ছাড়া আরো বিরক্তিকর দুটি বিষয় উল্লেখ করবো – বাংলা ব্যাকরণ ও সমাজবিদ্যা। ব্যাকরণ স্কুল পর্যায়ে যেমন জটিল তেমনি অনেকটাই নিষ্প্রয়োজন। বিষয়টি ভাষাশিক্ষায় কোনোই সহায়তা জোগায় না। ধারণাটা আমার কোন আবিষ্কার নয়, সকলেরই জানা। তবু তা চলছে এবং চলবে। এতোটাই সংস্কারাচ্ছন্ন ও রক্ষণশীল আমরা। এতে ছেলেমেয়েরা সাহিত্যের সৌন্দর্য ও রসবোধ হারিয়ে ফেলে এবং ভাষার প্রতি ক্রমেই অনীহা জন্মায়। সামাল দেয়ার জন্য তাদের কবিতার পঙ্‌ক্তি দিয়ে বাক্যরচনা শিখিয়েছি, সুন্দর সুন্দর গদ্যের লাইন মুখস্থ করতে ও লেখায় সেগুলো ব্যবহার করতে সাহায্য করেছি, রচনা লিখিয়ে সেগুলো তাদের বোধ্য ভাষায় নিজে লিখে দিয়েছি। কিছু বিচ্ছিন্ন শব্দ দিয়ে সেগুলো জোড়া লাগিয়ে প্রথমে বাক্যরচনা ও পরে প্রবন্ধ লিখিয়েছি। তারা খুব দ্রুত এসব শিখেছে, কেননা তাতে একটা ছন্দ থাকে, সৌন্দর্য ও সৃষ্টির আনন্দ থাকে। এগুলো তাদের সহজাত বোধ। আসলে এই পর্যায়ের স্কুল একটি ল্যাবরেটরি আর তার উপকরণ মানুষের মতো জটিল এক প্রাণী, তাতে যেমন ঝুঁকি আছে, তেমনি আছে নতুন আবিষ্কারের সম্ভাবনা। এজন্য অবশ্যই প্রশিক্ষণ আবশ্যক, যা আমাদের কারো ছিল না। তবে কচিকাঁচাদের প্রতি ভালোবাসা অনেকটাই সহায়তা দিয়েছিল।

কোন ছেলেমেয়েই সমাজবিদ্যা পছন্দ করতো না, পড়তে চাইত না। বড়জোর না-বুঝে মুখস্থ করত। স্কুলে মৌলবিদ্যা পড়ানো দরকার, সংশ্লেষিত বিদ্যা নয়, কেননা শেষোক্ত বিষয়টি তাদের বোধগম্য হওয়ার নয়। রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল ও ইতিহাসের এই মিশ্রণ ওদের জন্য অতিজটিল একটি বিষয়, গণিতের চেয়েও বেশি বিমূর্ত। সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের পার্থক্যশিক্ষা পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর পক্ষে কেন আবশ্যক? এগুলো কি ইতিহাস বা ভূগোলের বিকল্প হতে পারে? কিন্তু আমাদের দেশে তা-ই হয়েছে। আইডিয়াটা আমেরিকার। তারা ভারত

www.pathagar.com

ও পাকিস্তানে এটা চালু করার জন্য শিক্ষকদের তাদের দেশে প্রশিক্ষণ দেয়। কী যুক্তি দেখিয়েছিল, যারা এ টোপ গিলেছেন তারাই কেবল জানেন ও বোঝেন। আমি এটুকু বুঝি যে, ইতিহাস ও ভূগোল ছাড়া মার্কিনিদের চলতে পারে, কেননা এ দুটোই তাদের জন্য অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক বিষয়, তারা সকলেই উদ্বাস্তু। কিন্তু আমাদের ইতিহাস ও ভূগোল হাজার বছরের, এ নইলে আমাদের চলে না। ভারত অচিরেই তাদের ভুল বুঝতে পারে, পুরান পাঠ্যক্রমে ফিরে যায়, ভারতের ইতিহাস ও ভূগোলের সঙ্গে বিশ্বের ইতিহাস ও ভূগোল পাঠ আবার চালু করে, যেমনটি ব্রিটিশ আমলে আমরা পড়েছি (বিশ্ব-ইতিহাসের পরিবর্তে ইংল্যান্ডের ইতিহাস)। আমাদের পাঠ্যক্রমে পাকিস্তানি আমলেও সমাজবিদ্যা ছিল, বাংলাদেশ আমলেও আছে।

একটি ছাত্রের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শ্রেণীতে পড়ত। বেয়াড়া ধরনের, শিক্ষকদের সঙ্গে তর্ক করত, স্কুলে নানা অঘটন ঘটাত। কোন শিক্ষকই তাকে পছন্দ করতেন না। একদিন আমি কী একটা কাজে আগেভাগেই স্কুলে পৌঁছেছিলাম। দেশে বিএনপি সরকার। দেখি স্কুলের দরজায় একটি কাগজ আঁটা, তাতে লেখা 'এই পবিত্র স্থানে রাজাকারদের প্রবেশ নিষেধ'। সর্বনাশ। একটানে সেটা ছিঁড়ে ফেলে খবর নিয়ে জানলাম ওই ছেলেটিরই কাণ্ড। বকলাম, কিন্তু অনুতপ্ত হল না। সে অষ্টম শ্রেণীতে উঠে একটি 'ম্যাগাজিন' বের করে। তাতে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের লেখার উদ্ধৃতি ছিল। জানতাম ছেলেটা কর্তৃপক্ষের কুনজরে পড়বে। তাই লেখাটা বাদ দিতে বললাম। বাদও দিল এবং রাষ্ট্রদূতের অনুমোদনও পেল। কম্পিউটারে সেটি ছাপান, বিলান হল। শেষে দেখলাম অধিকাংশ সংখ্যায়ই লেখাটা আছে, বাদ গেছে কেবল রাষ্ট্রদূত ও আমিসহ বিশেষ কয়েকজনকে দেয়া কপিগুলোতে। সেই ছেলেই একদিন আমার কাছে এল একটি ব্যক্তিগত অনুরোধ নিয়ে এবং তারপর কিছু কথাবার্তা :

'স্যার আপনি *বিচিত্রা* পত্রিকার সম্পাদককে চিনেন?'

'এক সময় চিনতাম?'

'তিনি কি আপনাকে চেনেন?'

'পরিচয় দিলে চিনতেও পারেন।'

'আমার একটা লেখা ওই পত্রিকায় ছাপাতে চাই, একটু সাহায্য করবেন?'

'লেখা পড়ে দেখব, ভাল হলে চেষ্টা করব নিশ্চয়ই?'

তারপর সে একটা লেখা দেখাল। রেড-স্কয়ার ভ্রমণ সম্পর্কে একজন বিদেশি হিসেবে তার অভিজ্ঞতা। বয়স অনুসারে ভালোই। সম্পাদককে একটা চিরকুট লিখে দিলাম। সে চলে গেল। তখনো বুঝিনি কী বিপদের ঝুঁকি নিয়েছি। সপ্তাহ দুই পরেই সে খুব বিমর্ষমুখে জানাল লেখাটা বেরোয়নি। বললাম বেরুবে, তবে দেরি হবে। সে চলে গেল। কিছুদিন পর আবার একই অনুযোগ। কী করা? ক্রমে আমাকে সে

www.pathagar.com

সন্দেহ করতে শুরু করল এবং একদিন বলেই ফেলল – 'সত্যি আপনি সম্পাদককে চিনেন?' অগত্যা তাকে বুঝালাম যে, আমার লেখা বেরুতেই এক মাসের বেশি সময় লাগে, তার জন্য লাগতে পারে আরো বেশি, তিন মাস অন্তত। কালোমুখে সে চলে গেল। তারপর প্রতি বৃহস্পতিবার যখন দূতাবাসের সাপ্তাহিক মেইলব্যাগ আসতো, তাতে থাকতো দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোও, তা দেখাও ছেলেটি বাদ দিয়ে দিল। তার মুখে লেখার কথা আর শুনতাম না।

সে বছর পয়লা বৈশাখের দিন ক্লাস নিচ্ছি। ছেলেটি তখনো আসেনি। দ্বিতীয় বা তৃতীয় ঘন্টায় হঠাৎ করেই তাকে দেখলাম, হাতে একটা কাগজ। সে মেঝেতে শুয়ে পড়ে বার কয়েক গড়িয়ে আমার পায়ের কাছে পৌঁছে হাতটি তুলে তার ছাপা লেখাটি আমাকে দিল। সেদিনই এসেছে। কত কী বলল এখন আর মনে নেই, তবে এমন আনন্দিত একটি কিশোরমুখ বহুদিন দেখিনি। তারপর ধীরে ধীরে সে বদলে গেল, ভদ্র ও বিনীত হয়ে উঠল, লিখতে লাগল দেশ ছাড়া লন্ডনের বাংলা পত্রিকায়ও। অষ্টম শ্রেণী শেষ করলে দেশে তাদের ডাক পড়ল। আমাকে বাড়ির ফোন নম্বর দিয়ে গেল। কয়েক বছর পর আমার সিদ্ধেশ্বরীর বাসায় হাজির। স্টারমার্ক নিয়ে মাধ্যমিক শেষ করে ঢাকা কলেজে বিজ্ঞানে পড়ছে। তবে লেখালেখি ছেড়ে দিয়েছে, কোচিং ক্লাস করে আর সময় পায় না। ওই স্কুলের প্রায় সকল ছাত্রছাত্রীই, যতটুকু জেনেছি, ঢাকা এসে ভাল ভাল স্কুল-কলেজে ভর্তি হতে পেরেছে।

আমাদের সহকর্মী শিক্ষকরা প্রায় সকলেই এখন আমেরিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত। ড. বিজন সাহা আছেন রাশিয়ার বিখ্যাত বিজ্ঞান-নগর দুবনায় পদার্থবিদ হিসেবে। ড. শাহাজাহান আলী পড়ান আমেরিকান স্কুলে, দেখা হলে আজো অর্থনৈতিক গণিত সম্পর্কিত তাঁর ভাবনাগুলো শোনান। ভালোই আছেন সকলে। আমি আর মস্কো যাই না। তবে প্রায়ই মস্কোর স্মৃতি চোখে ভাসে, সেই সঙ্গে স্কুলটিও। কত শীতে আমরা স্বামী-স্ত্রী তুষারঢাকা পিছল পথে হাত-ধরাধরি করে স্কুলে গেছি, দুপুরে সবাই একসঙ্গে খেয়েছি, উল্লাসে মেতেছি। ছাত্রছাত্রীদের মুখগুলোও মনে পড়ে, কে কোথায় কিছুই জানি না, দেখা হলে তারা আমাকে চিনতে পারবে না, আমিও তাদের না। এটাই মানুষের ভাগ্য, জীবনের সঞ্চয় পথপ্রান্তে ফেলে যাওয়া ছাড়া মানুষের গত্যন্তর নেই। তবু একটা জিনিস জানতে ভারি ইচ্ছে হয়– এদের কেউ কি শিক্ষক হয়েছে? সাজ্জাদ, শেফালী, নীলা এমি, রানা– কেউ?

www.pathagar.com

শিক্ষাদর্শন, শ্রেণীদৃষ্টি ও বাংলাদেশের বাস্তবতা

দর্শনকে নিখাদ শ্রেণীদৃষ্টিতে দেখার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ নই। আমি সহজবুদ্ধিতে এটুক উপলব্ধি করি, দর্শনে সাধারণত শাসকশ্রেণীর অভীপ্সার সঞ্চার ঘটে খুব সূক্ষ্ম ও বিমূর্তভাবে। শাসক শ্রেণী অবশ্য মানবচিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, আপন স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়, কিন্তু সর্বদা সমর্থ হয় না। তাতে সংঘাত বাধার আশঙ্কা দেখা দেয় আর সম্ভবত সেজন্যই প্রাচীন ও মধ্যযুগের মুনি-ঋষি ও পীর-দরবেশদের মতো চিন্তকরা রাজধানী থেকে, রাজনৈকট্য থেকে দূরে থাকতে ভালবাসতেন। চিন্তনের একটি নিজস্ব কাঠাম আছে, বিবর্তন আছে, সেটাও প্রসঙ্গত ধর্তব্য।

শিক্ষার প্রায়োগিক দিকটা প্রধান, তাই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষাদর্শনও শাসক শ্রেণীর অধিকতর প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। কিন্তু এখানেও চিন্তনের স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। শিক্ষাকাঠামোর ওপর শাসক আপন ইচ্ছা প্রয়োগের সরাসরি চেষ্টা চালালে শিক্ষার বিকৃতি ঘটে, তাতে তার বিকাশ ব্যাহত এবং গোটা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাচীন স্পার্তা শিক্ষাকে পরিকল্পিত মানুষ তৈরির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, সফল হয় নি এবং তাদের গোটা সভ্যতাই যে ধ্বংস হয়ে গেল তাতে ভ্রান্ত শিক্ষানীতি অনুঘটকের কাজ করেছিল। হাল আমলে আমরা রাশিয়ায় অভিন্ন ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখি। কেউ কেউ শিক্ষাকে শ্রেণীদৃষ্টিতে দেখার যে যৌক্তিকতা উপস্থাপন করেন, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় সেভাবেই শিক্ষাব্যবস্থা গঠিত হয়েছিল। মেহনতি শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থানুকূল্যেই সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থা নির্মিত। কিন্তু জন্মলগ্নেই তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ধরা পড়ে। সোভিয়েত উইনিয়নের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী বিশ্বনন্দিত পণ্ডিত লুনাচারস্কি সঙ্গীত ও কলা বিদ্যালয়কে শ্রেণী-বিবেচনা থেকে মুক্ত রাখার দৃঢ় অবস্থান নেন এবং সেখানে পতিত উচ্চবর্গ ও মধ্যশ্রেণীর সন্তানদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেন, প্রলেতারিয়েত হওয়াকে যোগ্যতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া নাকচ করেন। কিন্তু সে দেশে লেনিন ও তার বিজ্ঞ সহকর্মীদের অনুসৃত উদার নীতি স্তালিন আমলে বর্জিত হয় এবং সেখানে কঠোর শ্রেণীশাসনের পত্তন ঘটে। বলা বাহুল্য, শিক্ষাব্যবস্থাও তদনুরূপ পুনর্গঠিত হয় এবং শিক্ষাদর্শন নিখাদ প্রলেতারীয় হয়ে ওঠে। ফলত শিক্ষকরা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হারিয়ে

www.pathagar.com

সরকারি নীতি ও তার সমাজদর্শনের প্রত্যক্ষ ক্রীড়নকে পরিণত হন। সন্দেহ নেই, সরকার শিক্ষায় অর্থযোগানে কার্পণ্য করে নি, বহু উদ্যমী শিক্ষকও নতুন আদর্শ বাস্তবায়নে প্রাণপাত করেছেন, মারারেঙ্কো ও সুখ্‌মলিনস্কির মতো মহান শিক্ষাব্রতীর উদয় ঘটেছে, নিরক্ষরতা দ্রুত নিঃশেষিত হয়েছে, বর্ণমালাহীন জাতিগুলো বর্ণমালা পেয়েছে, তাদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমের অনেক পণ্ডিতও এসব বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। কিন্তু শেষবিচারে এতো বড় উদ্যোগটি সফল হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি গভীর আশাবাদ ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তার দুর্বলতাটুকুও চিহ্নিত করতে ভুল করেন নি। আর সেটা ছিল, শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণীদৃষ্টির প্রাধান্য। এতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতা হরণ করে একরৈখিক মানুষসৃষ্টির চেষ্টা চলছিল। সোভিয়েত বিদ্যালয়ে সাহিত্য, গণিত ও পদার্থবিদ্যার মান ছিল বিশ্বে সর্বোচ্চ। কিন্তু সবই ব্যর্থ প্রমাণিত হল। এ শ্রেণীসর্বস্ব শিক্ষা মানুষের বহুমাত্রিকতা বিকাশের সহায়ক হয় নি, তারা মার্কসবাদী দর্শনের সোভিয়েত ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে এক বিষ্টব্ধ বিশ্ববীক্ষার শিকারে পরিণত হয়েছিল। এজন্য সোভিয়েতের সুশিক্ষিত জনগণ পেরেস্ত্রোইকা পর্বে আসন্ন বিপদ আঁচ করতে পারে নি, বিপদের সময় সিদ্ধান্তহীন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে এবং এখন অনেকেই মাথা খুঁড়ছে। আমার যেসব রুশ সহকর্মী একদা পণ্ডিত হিসেবে খ্যাত ছিলেন, এখন বাজার-অর্থনীতির বন্যায় খড়কুটোর মতো অসহায়ভাবে ভেসে চলেছেন, বর্তমান অবস্থার কোন সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাদের সঙ্গে কথা বললে বড়ই হতাশ হতে হয়। মনে পড়ে, পেরেস্ত্রোইকার সময় আমেরিকার সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময় শুরু হলে জনৈক মার্কিন অধ্যাপক মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকোলজিক্যাল ইকোনমিক্‌স্ নিয়ে বক্তৃতা দিতে আসেন। তিনি ইকোলজির স্বার্থে মুনাফানির্ভর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তুলনায় সমাজতন্ত্রকে অধিকতর সম্ভাবনাশীল বললে শ্রোতাদের অধিকাংশই তাঁকে সমর্থন করেন নি। সোভিয়েত ব্যবস্থা যে বাজার-অর্থনীতির প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একটি পরিপোষক সমাজব্যবস্থা নির্মাণে ব্রতী, এমন বোধ তাদের বদ্ধশিক্ষা কখনোই লালন করে নি, প্রচার করেছে পুঁজিবাদী বিশ্বের যাবতীয় নেতিবাচক দিক এবং শুধুই গেয়েছে নিজেদের সাফাই। ফলে সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থা আপন বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে থাকে এবং শেষাবধি সমকালীন বিশ্ববাস্তবতার প্রেক্ষিতে অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

শিক্ষা কোন হাতিয়ার নয়। হাতিয়ারের কোনো দর্শন থাকে না। শিক্ষা সমাজ-ব্যবস্থার একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গ, সমাজের সঙ্গেই তার বিকাশ ও বিবর্তন। তাই আমাদের জ্ঞাত তিনটি সমাজকাঠাম – সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের স্ব-স্ব তিনটি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাদর্শন দেখি। সমাজ ও শিক্ষার আন্তঃসম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও গভীর, তারা পরস্পরের পরিপূরক ও পরিপোষক।

www.pathagar.com

শিক্ষাব্যবস্থা কি আমূল নির্মাণ করা যায়? সমাজের ক্ষেত্রেও এটি একটি প্রশ্ন। আসলে সমাজ ও শিক্ষা কাঠামোর উপাদানগুলো স্বাভাবিক নিয়মে বিবর্তনের মাধ্যমে পুরনো বাস্তুভিত থেকেই জন্মায়, মানুষ সেগুলো গ্রথিত করে মাত্র। এ গ্রথনের ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল এবং সেজন্য প্রতিভা ও দূরদৃষ্টি অত্যাবশ্যক। সমাজ ও শিক্ষার প্রত্যেকটি ধরনেই বিগত যুগের কিছু না কিছু উপাদান থাকে এবং গ্রথনের ক্ষেত্রে সেগুলোর যাথার্থ্য বিচারের প্রশ্ন দেখা দেয়।

লেনিন পুঁজিতন্ত্রের কিছু কিছু উপাদান সমাজতন্ত্রে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন, গৃহযুদ্ধজনিত পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য সফল হন নি। তিনি নিখাঁদ শ্রেণীদৃষ্টিতে কখনোই আচ্ছন্ন হন নি। যতোদিন ক্ষমতায় ছিলেন, সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থায় চিরায়ত বহু মূল্যবোধ টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রপরিচালনায় বহুদলীয় ব্যবস্থা, শিল্পায়নে পুঁজিপতিদের সহযোগিতা, বিবাহ ও নৈতিকতা এবং শিক্ষাসহ বহু ক্ষেত্রেই তিনি পুঁজিতন্ত্রের ইতিবাচক উপাদানগুলো টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। সোভিয়েত ব্যবস্থা নির্বিশেষ শ্রেণীদৃষ্টি গ্রহণের ফলে গোটা সংস্কৃতির সঙ্গে তার উপাঙ্গ শিক্ষাও শেষাবধি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যে-বিজ্ঞানকে আমরা সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম সাফল্য হিসেবে দেখি, স্তালিনের তোঘলকি কর্মকাণ্ডের ফলে জীববিজ্ঞান কীভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল তা আমরা কমবেশি সকলেই জানি। পদার্থবিদরাও মরতে বসেছিলেন, বেঁচে যান প্রায় দৈববলে, পরমাণুবোমা নির্মাণে মার্কিন সাফল্যের পরিস্থিতিতে ও কুর্চাতভের উপস্থিতবুদ্ধি ও দূরদর্শিতায়। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতনের ফলে শ্রেণীশিক্ষার সৃষ্টি সেখানকার বুদ্ধিজীবীরা যতটা বিভ্রান্ত ও হতাশ, পুঁজিতান্ত্রিক দেশের মার্কসবাদীরা কিন্তু ততটা বেনয়া হয়ে পড়ে নি। এটি অপেক্ষাকৃত উদার ও নমনীয় বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থারই অবদান। পুঁজিতন্ত্র আপন স্বার্থেই একরৈখিক মানুষসৃষ্টির বিরোধী, তাই সেখানেও মার্কসবাদচর্চা সম্ভব হয়েছে এবং এমনটি অতিকল্পনা নয় যে সেখান থেকেই হয়ত একদিন নবপর্যায়ে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটবে।

ভারত উপমহাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাদর্শনের ইতিহাসেও আমরা দেখি উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৈরি শিক্ষাব্যবস্থা সমাজে আত্তীভূত হয় না এবং তা শেষাবধি সমাজকে ধসিয়ে দেয়। ইংরেজরা ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্যে আমাদের সাবেক সমাজকাঠামো ভেঙে আপন স্বার্থানুকূল একটি আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ও সেটার পরিপোষক একটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা সফল হয় নি। কেননা, তাদের তৈরি সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা দুটিই ছিল কৃত্রিম, মোটেও তাদের স্বদেশের মতো নয়। ফল হল। একটি প্রাচীন সুসভ্য জাতির বিপরীত সমাজ-ব্যবস্থার স্বাভাবিক বিবর্তন ব্যাহত ও বিকৃত হল, ইংরেজরাও দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারল না।

www.pathagar.com

ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা কি তাদের স্বার্থরক্ষা করতে পেরেছিল? পারে নি। তাদের শিক্ষাই জন্ম দিয়েছে রেনেসাঁ নামের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এবং শেষে গড়ে তুলেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনার ভিত। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনেও কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। তারাও ধর্মীয় জাতিভিত্তিক একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র গড়তে গিয়ে একটি কৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল। পরিণতির ভুক্তভোগী আমরা সকলে। বাংলাদেশের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে আগামী সমাজব্যবস্থার অনুকূল একটি শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোও অলক্ষে উদ্ভূত হয়েছে এবং কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষাকমিশন সেগুলো গ্রথনের মাধ্যমে একটি নতুন শিক্ষাব্যবস্থার কাঠাম প্রস্তুত করে। ১৯৭৫ সালের প্রতিবিপ্লব রাষ্ট্রকাঠামোর যেমন পরিবর্তন ঘটায়, তেমনি একটি নতুন শিক্ষাব্যবস্থা পত্তনেরও প্রয়াস পায়, আর উভয়ই ছিল কৃত্রিম। এসব আর কিছুই টেকে নি। এক্ষেত্রে ছাত্ররা যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল তাতে অংশত হলেও শিক্ষার আপন বিকাশের তাগিদ একটি চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। আজ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার যাবতীয় দুর্গতির মূলে আছে এদেশের স্বৈরাচারী শাসকবর্গের চিত্তবৃত্তির মজ্জাগত পশ্চাদমুখিতা ও অদূরদর্শিতাজাত বিশৃঙ্খল কর্মকাণ্ড।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষশক্তি আবার ক্ষমতাসীন। এ শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে একদিন আপন রাষ্ট্রকাঠাম ও শিক্ষাকাঠামোর উপাদানগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল যেগুলো পরবর্তীকালে গ্রথিত হলেও কার্যকর হওয়ার সময় পায় নি, এখন সেই সুযোগ উপস্থিত। আমাদের অনুন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর কোন মৌলিক পরিবর্তন অসম্ভব, কিন্তু তদনুযায়ী একটি মানবিক মুখাবয়বযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা নির্মাণ সম্ভব এবং সেটাই হবে বর্তমানের নিরিখে প্রগতিশীল তথা বৈপ্লবিক। এ শিক্ষা-ব্যবস্থার উপাদানগুলো ইতিপূর্বেই জন্মলাভ করেছে। আমাদের কর্তব্য, সেগুলোর সাহায্যে টেকসই ও কার্যকর একটি শিক্ষাব্যবস্থা নির্মাণ, যার তাত্ত্বিক ভিত্তিই বাংলাদেশের শিক্ষাদর্শন।

১৯৯৬

www.pathagar.com

শিক্ষানীতির যৎকিঞ্চিৎ

শিক্ষকতার যেটুকু অভিজ্ঞতা আমার আছে, তাতে বক্ষ্যমাণ আলোচনার একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা লেখা সম্ভব। কিন্তু তার কোন প্রয়োজন দেখি না। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯' পাঠই এ জন্য যথেষ্ট।

স্বাধীনতার পর দেশের বৈষয়িক উন্নতি কম হয়নি। কিন্তু উন্নতি তো শুধু বস্তুগত বিষয় নয়, আত্মিকও বটে এবং তা মিলিতভাবেই পরিমাপ্য। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত ক্ষেত্রে আমাদের বড় ঘাটতি আছে। আমাদের মনোজগৎ আজও ঔপনিবেশিকতার জের ও সামন্ত সংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন। আমাদের নির্বাচন আছে, সংসদ আছে, কিন্তু সমাজে ও জীবনে গণতন্ত্রের বড়ই আকাল। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ, বিভেদ ও বৈষম্য বিলয়ের আলামত কোথাও নেই। শিক্ষাব্যবস্থা এ প্রকোপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সর্বাধিক, তা আজ রুগ্‌ণ ও বিধ্বস্ত। শিক্ষার যেটুকু উন্নতি দৃশ্যমান, তা-ও ভৌতকাঠামোগত, চৈতন্যগত নয়। শিক্ষাঙ্গনের প্রাণপুরুষ শিক্ষক, দীর্ঘকাল অবহেলিত থাকায় তারাও এখন হতাশ এবং অনেকে অপসংস্কৃতিতে আক্রান্ত। বর্তমান শিক্ষানীতিতে আছে তা থেকে উদ্ধারলাভের দিকনির্দেশনা আর এজন্যই এটি একটি মহৎ জাতীয় দলিল। যেহেতু আমি শিক্ষক, শিক্ষাবিদ নই, তাই কয়েকটি মাত্র বিষয়েই আমার মতামত সীমিত থাকবে।

১. মাধ্যমিকের সাধারণ ধারায় বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় – এ শ্রেণীবিভাজন যৌক্তিক নয়। প্রবণতা ও সম্ভাব্য পেশা নির্বাচনের জন্য অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বয়স খুবই কম। তারা অভিভাবক ও বন্ধুদের দিয়ে প্রভাবিত হয়ে যে কোর্স পড়ে, তা আরোপিত ও আখেরে ক্ষতিকর। দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষাই বাঞ্ছনীয়, অন্যথা পূর্ণ মানুষের বদলে খণ্ডিত মানুষ হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনে বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল, বিরোধী পক্ষে শেষ পর্যন্ত আমি ছিলাম একা এবং 'বিজ্ঞানের যুগ' এ অকাট্য যুক্তিতে বিভাজন প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এখন কী দেখছি? উন্নত দেশ ও আমাদের দেশ – উভয় জগতেই বিজ্ঞানপাঠে ইচ্ছুক ছাত্রের সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। সিপি স্নোর 'টু কালচার' প্রসঙ্গটির মর্মকথা, কমিশনের উচ্চশিক্ষা অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষায় এর প্রয়োগ নেই আর সেটাই আশ্চর্যের।

www.pathagar.com

২. মাধ্যমিক স্তরে (ষষ্ঠ-দশম শ্রেণী) ইতিহাস ও ভূগোলের পরিবর্তে সামজবিদ্যাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আইডিয়াটি সাম্প্রতিক কালের এবং মার্কিন দেশ থেকে আহৃত। ভারতে দুই বছর পরই এটি বাতিল এবং পুনরায় ইতিহাস ও ভূগোল পঠন চালু হয়। কিন্তু পাকিস্তান সেটা অটুট রাখে, বাংলাদেশেও কোন পরিবর্তন ঘটেনি এবং কমিশনও তা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু কেন? আমরা পৃথিবী নামের একটি গ্রহের বাসিন্দা এবং সব মানুষ একটিমাত্র প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের অস্তিত্ব ও অগ্রগতি এ দুটি অভগ্ন বাস্তবতার সঙ্গে জড়িত আর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ও ভূগোল পাঠ ছাড়া এ বোধ কিশোরমনে প্রোথিত হওয়ার নয়। তাই মাধ্যমিকে বাধ্যতামূলকভাবে দেশ ও বিশ্বের ইতিহাস-ভূগোল রাখা জরুরি মনে করি। ইতিহাস তো এখন আর রাজরাজড়ার কাহিনী নয়। সামাজিক ইতিবৃত্ত, তাতে আছে সব যুগের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজবিদ্যা ও সংস্কৃতি এবং ভূগোলে রয়েছে ভূচিত্রের সঙ্গে ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, জলবায়ু, পরিবেশ, জীবজগৎ সবই। বিষয়গুলো সমাজবিদ্যা ও পরিবেশবিদ্যার চেয়ে অনেক বেশি সর্বস্পর্শী। বাংলাদেশ স্টাডিজসহ শেষোক্ত দুটি বিষয়ও ইতিহাস ও ভূগোলে সহজেই আত্তীকৃত হতে পারে। বিদেশের সব দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় নয়।

৩. উচ্চমাধ্যমিক কলেজে নবম ও দশম শ্রেণীভুক্তি এবং চার বছরের ডিগ্রিকে সাধারণ শিক্ষার শেষ ডিগ্রি ঘোষণা বহুকাল আগেই করণীয় ছিল। এ ধরনের শিক্ষাক্রম উন্নত দেশে চালু রয়েছে। কিন্তু তাদের আছে পর্যাপ্ত সহায়-সম্পদ ও শ্রেণীকক্ষে সীমিত ছাত্রসংখ্যা। আমাদের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু স্নাতকোত্তর এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি চালু থাকলে সেখানে ছাত্রের চাপ কমবে এবং গবেষণার সুযোগ বাড়বে। কিন্তু চাকরিক্ষেত্রে শিক্ষানীতিতে উল্লিখিত নীতি বাস্তবায়নের জন্য স্নাতকদের জন্য নির্দিষ্ট চাকরিতে স্নাতকোত্তরদের অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কঠোর আইন প্রয়োগ প্রয়োজন হবে। এ পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার মতো কলেজগুলোর উন্নয়নেও বিপুল অর্থব্যয় আবশ্যক। অন্যথা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ডিগ্রির মতো চারবছরের শিক্ষাকোর্সও পরিহাসে পরিণত হবে। কলেজগুলোর শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও ইংরেজি ভাষাভাষী উন্নত দেশ থেকে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের কথা ভাবা যেতে পারে। বিপ্লবোত্তর রাশিয়া ও জাপান এভাবেই সফলতা অর্জন করেছিল। শুনেছি, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরম্ভকালে এমন কিছু ভাবা হয়েছিল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বিরোধিতায় তা আর সম্ভব হয়নি।

৪. উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজি দুটি মাধ্যমই কমিশন বজায় রেখেছে। কিন্তু বাংলা মাধ্যমে কি উচ্চশিক্ষায় আন্তর্জাতিক মান অর্জন সম্ভব? পাঠ্যপুস্তক ও

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থ অনুবাদের কথা প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা হতাশাজনক। ৪০ বছরের অর্জন বারিবিন্দুবৎ। আগামী ৪০ বছরেও কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের সম্ভাবনা কম। দক্ষ অনুবাদকের প্রকট অভাব এবং জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান পরিধি এভাবে মোকাবিলা দুরূহ কাজ। শিক্ষার মাধ্যম ও মাতৃভাষা আমাদের জন্য একটি জটিল ও স্পর্শকাতর বিষয়, অথচ সমস্যাটির যৌক্তিক একটি সমাধান জরুরি।

৫. অন্যান্য

ক. উচ্চশিক্ষায় বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম দুটি থাকার দরুন উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজি মাধ্যমের টেকনিক্যাল শব্দের বাংলা এবং বাংলা মাধ্যমের জন্য ইংরেজি পরিভাষা শেখা বাধ্যতামূলক হওয়া আবশ্যক। এজন্য ৫০ নম্বর রাখা যেতে পারে। স্বাধীনতার পর উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যায় এ নিয়ম চালু হয়েছিল এবং ১০ নম্বর বরাদ্দ ছিল। কিন্তু পরে তা পরিত্যক্ত হয়।

খ. দক্ষ শিক্ষক ও গবেষক কোথাও কোনোকালে সহজলভ্য নয়। তাই প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব পর্যায়ে অবসর নেওয়ার পরও কর্মক্ষম ও আগ্রহী শিক্ষকদের শিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত রাখার একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন আবশ্যক। আরেকটি বিষয়ও দীর্ঘকাল অবহেলিত হয়ে আছে। সব দেশেই ডিগ্রিহীন কিছু পণ্ডিত থাকেন, যাঁদের জ্ঞান ও দক্ষতা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সদ্ব্যবহৃত হতে পারে এবং হয়েও থাকে। প্রসঙ্গত, ভারতের পাখিবিশারদ সালিম আলী এবং পশ্চিমবঙ্গের কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্মরণীয়। আমাদের দেশেও এমন পণ্ডিত ছিলেন ও আছেন। আমলাতান্ত্রিকতা ও রক্ষণশীলতা এ পথের প্রধান অন্তরায়। আশা করি, কমিশন বৃহৎ স্বার্থে বিষয়টি বিবেচনা করবে।

গ. উচ্চমাধ্যমিকের জীববিদ্যার পাঠ্যসূচিতে দীর্ঘকাল বিবর্তনবাদ গুরুত্বসহকারে পড়ানো হয়ে আসছিল। কয়েক বছর আগে থেকে বিবর্তনবাদের পরিবর্তে জীবপ্রযুক্তি পড়ান হচ্ছে। কেন এ পরিবর্তন, কেন তত্ত্ব থেকে প্রয়োগের এ পৃথকীকরণ? জীবপ্রযুক্তি আসলে বিবর্তনবাদেরই একটি ফলিত রূপ। প্রয়োগের সঙ্গে তত্ত্বও প্রয়োজন, তাই দুটি বিষয় এক সঙ্গে পড়ানোর নিয়মটি আশা করি কমিশনের অনুমোদন পাবে।

স্বল্পতম সময়ে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য কমিশনের সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সব কর্মীকে ধন্যবাদ।

২০০৯

www.pathagar.com

আমলাতন্ত্রের গাঁট

জাতীয় শিক্ষানীতিতে সরকারি বিদ্যালয় ও কলেজ ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট কোন সুপারিশ নেই। শুধু এরকম কথা লেখা আছে : 'ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনে অধিকতর ক্ষমতা দিয়ে আরও জোরদার করা হবে। অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী...সমন্বয়ে জনতত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হবে।' অর্থাৎ বাকিটা সরকারি সিদ্ধান্তের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে।

কয়েকদিন আগে একটি বিভাগীয় সরকারি কলেজে কিছু ছাত্রের আমন্ত্রণে এক সান্ধ্য কবিতাপাঠের আসরে গিয়েছিলাম। কবিসংখ্যা ১০-১২, শ্রোতা একা আমি। পাঠ শুরু হতেই বিদ্যুৎ চলে গেল। অদম্য তরুণরা মোবাইল ফোনসেটের আলোয় কবিতা পড়তে লাগল। কিন্তু ভ্যাপসা গরম আর মশার জন্য তিষ্টান গেল না। আমরা বাইরে এসে হাঁটতে ও কথা বলতে লাগলাম। বিশাল চত্বর, বড় বড় পুকুর, গাছগাছালির বন, দুটি ফুটবল মাঠ। একসময় এখানে শিক্ষকতা করেছি। দেখলাম, আমার লাগান গাছেরও কয়েকটি আছে। কিন্তু দুঃখ হল, আমাদের টেনিস কোর্টগুলো আর নেই, সেখানে সবজিক্ষেত। বোটানিক গার্ডেন আগাছাভরা, ফুটবল মাঠে হাঁটুসমান ঘাস।

'তোমরা খেলাধুলা করো না?' জানতে চাই।

মিহি সুরে উত্তর আসে, 'না'।

'বার্ষিকী বের হয়? সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক হয়?'

একই উত্তর – 'না।'

মনে পড়ে, পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকের কথা। শীতে টেনিসের সমারোহ আয়োজন, নিয়মিত ক্রিকেট ম্যাচ, গোটা বর্ষাজুড়ে ফুটবল। কলেজ বার্ষিকী ছাড়াও ছিল একটি বিজ্ঞানবার্ষিকী। ১৯৫৯ সালে আমরাই প্রথম বেসরকারি উদ্ভিদবিদ্যার স্নাতক কোর্স খুলি। অধ্যক্ষ ও বিজ্ঞান শিক্ষকদের ঐকান্তিক এবং অনুক্ষণ সহায়তায় দুই বছরের মধ্যেই গড়ে ওঠে চমৎকার ল্যাবরেটরি, হার্বেরিয়াম, মিউজিয়াম, বিভাগীয় গ্রন্থসংগ্রহ বোটানিক গার্ডেন, কোনোটা ন্যূনতম খরচায়, কোনোটা নিখরচায়। ১৯৬২ সালে সরকারিকরণের পর যতদিন পুরোনো শিক্ষকেরা ছিলেন, তত দিন এ পরিস্থিতি তেমন বদলায়নি।

www.pathagar.com

হাঁটতে হাঁটতে ছাত্রদের এসব কথা শোনাই এবং জিজ্ঞেস করি, 'তোমাদের আজ এ হাল কেন?' জবাব আসে, 'মোবাইল ফোন স্যার; ওটিই খেলাধুলা, সংস্কৃতি সব গিলে ফেলেছে।' ভেবেছিলাম, দলীয় ছাত্ররাজনীতির কথা শুনব, কিন্তু খবরটি সম্পূর্ণ নতুন।

সত্যিই মোবাইল কি ফোন? আংশিক সত্য হলেও সিংহভাগ সমাধা করেছে সরকারি আমলাতন্ত্র। শিক্ষকেরা আজ কলেজের সঙ্গে একাত্মবোধ হারিয়েছেন, প্রতিষ্ঠানটি তাদের কাছে পরকীয় হয়ে গেছে। অন্যান্য আমলাতন্ত্রের মতো শিক্ষা-আমলাতন্ত্র একটি নির্মুখ সত্তা। এই শহরে এলে অন্তত একবার কলেজে যাই, চত্বরে হাঁটি, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগেও গিয়ে বসি। আমার কাছে পড়েছে, এমন শিক্ষকও আগে পেতাম, এখন সবাই অচেনা। একবার দেখলাম ফুটবল মাঠের পাশে একসার গগনশিরীষ কে যেন লাগিয়েছেন, পরেরবার দেখি কয়েকটি অযত্নে এলোমেলো। জিজ্ঞেস করে জানলাম, যিনি লাগিয়েছিলেন, তিনি বদলি হয়ে গেছেন। এখন আছে মাত্র তিনটি, বড় হয়েছে, কিন্তু গোটা সারিটা ছেঁড়াখোঁড়া, সৌন্দর্যহারা। ঘটনাটি খুব ছোট, কিন্তু তাৎপর্যবহ। সরকারিকরণ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার চিরায়ত কাঠামোটি অবিন্যস্ত করে দিয়েছে, ব্যক্তি উদ্যোগের বিনাশ ঘটিয়েছে, শিক্ষকদের অদৃশ্য এক শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত করতে চাইছে। অথচ শিক্ষাকমিশন বিষয়টি এড়িয়ে গেছে, বিদ্যালয়কে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা আমলাতন্ত্রের এই গাঁট খুলতে চায়নি।

এ দায় অবশ্য পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার। তারা অসৎ উদ্দেশ্যেই উল্টোমুখী শিক্ষাসংস্কার শুরু করেছিল এবং সেজন্য শিক্ষা-এলিট সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকেই প্রথম নজর দিয়েছিল। অথচ প্রয়োজন ছিল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পেরিয়ে শেষপর্যায়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছান। এই উল্টোরথে ক্ষতি হয়েছে বিরাট, গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে, শিক্ষায় শ্রেণীভেদ ও নানা অমোচ্য জটিলতা দেখা দিয়েছে। এটাই ছিল তাদের কাম্য, যা থেকে আজও আমরা মুক্ত হতে পারিনি, বরং তাদের ফাঁদে পা দিয়ে জটিলতার পরিধি ক্রমাগত বাড়িয়েছি।

আমাদের শিক্ষক আন্দোলনের দুর্বলতা সুবিদিত। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনে কাজ করার সময় একটি নীতিগত সমস্যা নিয়ে জনৈক শিক্ষক-নেতার সঙ্গে দেখা করলে তিনি অকপটে জানান, শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তাদের ধারণা যতটা স্বচ্ছ, শিক্ষানীতি সম্পর্কে ততটাই অস্বচ্ছ। হতাশ হয়েছিলাম। তারা স্বাধীনতার পর শিক্ষা সরকারিকরণের (সরকারি আমলাতন্ত্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন, যেমন সরকারি স্কুল-কলেজ) বিরুদ্ধে জাতীয়করণের (মালিকানা রাষ্ট্রের কিন্তু ব্যবস্থাপনা স্বায়ত্তশাসিত, যেমন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়) দাবি তুলেছিলেন। অথচ শেষপর্যন্ত জয় হলো প্রথমোক্তরই।

www.pathagar.com

তা ছাড়া, আজ গোটা ছাত্রসমাজ কিছু সংখ্যক শিক্ষকের কোচিং ব্যবস্থায় জিম্মি। তারা শিক্ষকের ভাগ্যোন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষানীতি নিয়েও ভাবলে এতদিনে শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনার একটি গণতান্ত্রিক কার্যকর কাঠাম হয়তো উদ্ভাবিত হতো। শিক্ষানীতির একটি গোটা অধ্যায়ে আছে 'শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব' বিষয়ে আছে অনেক ভাল ভাল সুপারিশ। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার একটি যৌক্তিক কাঠামো ব্যতীত তা অর্জনীয় নয়। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, শিক্ষা এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে অজস্র প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শিক্ষকের পক্ষে নিজ চেষ্টায় অনেক অর্জন সম্ভব এবং অত্যল্প হলেও তা থেমে নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য শিক্ষকদের বৈষয়িক দৈন্যমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক মুক্তির উজ্জীবন আবশ্যক। শিক্ষানীতি এক্ষেত্রে কতটা কার্যকর হয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

২০০৯

www.pathagar.com

শিক্ষকের চিরায়ত দায়ভার

'A teacher...can never tell where his influence stops.'—Henry Adams (1838-1918)

দুই বঙ্গেই ছাত্র ও অভিভাবকের মধ্যে এমন ধারণা ইদানিং বদ্ধমূল যে, আজকের শিক্ষক-সমাজ, বিশেষত স্কুল ও কলেজের শিক্ষকরা আদর্শকুণ্ঠ, ব্যবসামনস্ক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এক ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত। আজ একজন ছাত্রের শিক্ষাসাফল্য অনেকটাই পুঁজিনির্ভর, যেখানে যত বেশি লগ্নি, সাফল্যের মাত্রা সেখানে তত বেশি। বিষয় অনুযায়ী অভিজ্ঞ প্রাইভেট শিক্ষক নিয়োগের সক্ষমতার নিরিখেই এখন নির্ধারিত ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার ফলাফল। ব্যতিক্রম ঘটে, তবে কালেভদ্রে, কদাচিৎ। অভিভাবকরা, বিশেষত যারা সচ্ছল নন, তারা দুঃখ করেন, স্বকালের শিক্ষকদের ফলাও প্রশংসা করেন যারা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অনুবর্তন' উপন্যাসের নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের মধ্যেও লোভের কাছে আত্মসমর্পিত হন নি এবং সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পণ্ডিতমশায়' গল্পের নায়কের মতো সিনিক হলেও দারুণ শিক্ষাভিমানী ছিলেন। আজাকল প্রায়ই শোনা যায়, কোন কোন শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনির দৌলতে ঢাকার অভিজাত এলাকায় মহার্ঘ ফ্ল্যাট কিনেছেন, কারও আছে সোফারসহ শীতাতপশীল মোটরগাড়ি। বিশেষ বিষেশ স্কুলে ভর্তির দুর্লভ সুযোগ লাভের জন্য অনুদান লাগে নগদ ২০-২৫ হাজার টাকা। সেসব বিদ্যায়তনে পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন প্রতিযোগতিায় বিদ্যোৎসাহী প্রার্থীরা খরচ করেন পার্লামেন্টে ইলেক্শনের সমপরিমাণ অর্থ। সবই শোনাকথা। সহজবোধ্য যে, ব্যাপক জনসমাজে কিছু শিক্ষকের সাম্প্রতিক আর্থিক সচ্ছলতার যে ধারণাটি বিদ্যমান সেখানে শিক্ষকদের আত্মিক অধোগতিও সমযাত্রায় পরিব্যাপ্ত ও নিবিড়। অবশ্য বিগত শিক্ষক আন্দোলনের সময় ঢাকার প্রেসক্লাবের সামনে দেশের দূরদূরান্ত থেকে আগত বিপুল সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকার মরণপণ অবস্থান ধর্মঘটের ছবি দেখার পর অভিভাবক মহলের পূর্বোক্ত ধারণায় কিছুটা রদবদল ঘটা সম্ভব মনে করি। অতঃপর এ বাস্তবতা তাদের দৃষ্টি এড়াবে না যে, শিক্ষকসমাজে বিদ্যমান ডারউইনী জীবনসংগ্রামে জয়ী বা যোগ্যতমের সংখ্যা খুবই নগণ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ ধরনের জীবনসংগ্রাম ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম চালিকাশক্তি হলেও সর্বত্র

www.pathagar.com

সমমাত্রায় তার সক্রিয়তা ওই সমাজের জন্যও মোটেও ইতিবাচক নয়, বরং শিক্ষা ও সংস্কৃতির মতো নাজুক ক্ষেত্রসমূহের জন্য ক্ষতিকর ও অবক্ষয়ী। ডারউইন স্বয়ং মানবসমাজে অস্তিত্বের সংগ্রামের বিবর্তনমুখিনতা স্বীকার করেন নি। অধিকন্তু জীবজগতের বিবর্তনে সংগ্রামের সমান্তরালে সহযোগিতার ইতিবাচক ভূমিকাটি গৌণ হলেও বিবর্তনবাদে অস্বীকৃত নয়।

একালের শিক্ষকদের সঙ্গে আগেকার শিক্ষকদের ফারাক কতটা, সেজন্য একটিমাত্র দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। আজকাল পরীক্ষার হল থেকে নকলবাজ ছাত্রের সঙ্গে তাদের সহায়তার অপরাধে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কর্মরত শিক্ষকও বহিষ্কৃত হন। এমনটি ব্রিটিশ শাসনের সময় কেন পাকিস্তান আমলেও অকল্পনীয় ছিল। লক্ষণীয়, শিক্ষকসমাজের এ অধ্যোগতিকে আসলে অস্তিত্বের তীব্র সংগ্রামের ফল বলা যায়, যা শিক্ষকের নৈতিকতাকে গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করে। ধনতান্ত্রিক সমাজ প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার মধ্যে বিকশিত হলেও সেখানে এক ধরনের নৈতিকতা (নিয়ম) অপরিহার্য, অন্যথা তার অগ্রগতিতে বিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী। প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার ক্ষেত্র ও ধরনগুলো শনাক্তকরণ উন্নয়নের জন্য খুবই জরুরি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ব্যবসায়ী সংস্থার প্রতিযোগিতায় নামালে এবং শিক্ষকরা তার অংশীদারের স্তরে নামলে পুনরুক্তি সত্ত্বেও বলা যায়, প্রতিযোগিতাসর্বস্ব ধনতান্ত্রিক সমাজের জন্যও তা কল্যাণকর হয় না। এটাই বাঞ্ছনীয় যে, রাষ্ট্র ও সমাজ শিক্ষকদের জন্য এমন একটা বিশেষ অবস্থান নিশ্চিত করবে যেখানে প্রতিযোগিতার ধরনটি কোনোক্রমেই বাজারসুলভ হবে না। গোটা ব্যাপারটা একাধারে জটিল ও নাজুক বিধায় এটি ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য রাষ্ট্র ও শিক্ষকের সহযোগিতার একটি কার্যকর ধরন উদ্ভাবন প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের পরিস্থিতি ভিন্নতর। দু'পক্ষই আপসহীন। শিক্ষকরা তাদের বৈষয়িক উন্নতির মধ্যেই মূলত শিক্ষাসমস্যার সমাধান দেখেন আর রাষ্ট্র অর্থনৈতিক কব্জা প্রয়োগে তাদেরকে বশংবদে পরিণত করতে চায়। আমাদের রাজনৈতিক দলনেতাদের মানসিকতা ও সচেতনতার স্তর, আমলাতন্ত্রের চরিত্রগত ক্ষমতাস্পৃহা, ব্যাপক জনসাধারণের দারিদ্র্য ও অশিক্ষার পাকচক্রে যেখানে গোটা উন্নয়নই বন্দী, সেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যতিক্রম অত্যাশা বৈকি। আমরা সকলেই, গোটা জাতিই ইচ্ছা-অনিচ্ছা নির্বিশেষে যেন-বা এক অধোগামী প্রবাহে খড়কুটোর মতোই অসহায়ভাবে ভাসমান, যাকে অনেক সময় ইতিহাস নির্ধারিত নিয়তি ভাবাও যায়। তবু বলব, বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রধান অংশ হিসেবে শিক্ষকসমাজের সেখানে সম্ভাবনাও দেখি না। তাদের কেউ হতাশায় নিমজ্জিত ও নিষ্ক্রিয়, কেউ-বা দলীয় রাজনীতির ক্রীড়নকে পরিণত। অথচ শিক্ষকসমাজের দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থাকা ও তাদের উর্ধ্বে রাখা দুটোই প্রগতির জন্য আবশ্যক। আমাদের শিক্ষকসমাজের বর্তমান আত্মিক দুরবস্থা অবশ্যই কোন

www.pathagar.com

আকস্মিক ঘটনা নয়, তার একটা ইতিহাস আছে এবং সেটা অনির্ণেয়ও নয়। ঔপনিবেশিকতাই আমাদের শিক্ষার কাঠাম ও শিক্ষকের মানকিতার ওপর সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং এখন আমরা তার জের টেনে চলেছি। ১৯৪৭ সালে সাবেক পূর্বপাকিস্তান যে-শিক্ষা ববস্থার উত্তরাধিকার পেয়েছিল সেটা কাঠামোগতভাবে বিগত শতবর্ষের শিক্ষার অংশ হলেও তাতে একটা বড় ঘাটতি ছিল আর সেটা মূলত ভাবগত, আদর্শিক। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের যে অভিঘাত উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ধারণ করেছিল, শিক্ষকদের সিংহভাগ তাতে যেভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাদের মনে স্বাধীন দেশের শিক্ষার যে-স্বপ্ন জন্মলাভ করেছিল, শিক্ষাবিদরা শিক্ষা নিয়ে যতো ভাবনাচিন্তা করেছিলেন সেগুলোর কোনোটাই পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থায় বর্তায় নি। পাকিস্তান সৃষ্টির চালিকাশক্তি ছিল ধর্ম, সেখানে আধুনিক রাষ্ট্রের বহুমাত্রিক পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তাভাবনার তেমন অবকাশ ছিল না। ফলত বড় আকারের একটা শূন্যতা নিয়ে পাকিস্তান যাত্রা শুরু করেছিল, যা কোনোদিনই আর ঘোচে নি।

পাকিস্তান আমলে পূর্ব-পাকিস্তানে যে ধরনের ঔপনিবেশিকতা কায়েম হয়েছিল তা ছিল ব্রিটিশ শাসন থেকে বহুগুণ নিকৃষ্ট, প্রকট ফিউডাল চরিত্রের আর এতে আমাদের জন্য ইতিবাচক কিছুই ছিল না। সেই শাসকরা এতটাই অন্ধ ছিলেন যে তাদের চোখে পাকিস্তানের ভাষাগত, সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যগুলোর গুরুত্বও ধরা পড়ে নি। এ শাসন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যেসব কুপ্রভাব ফেলেছিল তন্মধ্যে সর্বাধিক মারাত্মক ছিল শিক্ষার আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে এক ধরনের শ্রেণীগত বিভাজন এবং ফলত জন্ম নেয় শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষকদের অ্যালিনেশন বা পরকীয়তারোধ। দুঃখের বিষয়, বাঙালি শিক্ষাপ্রশাসকরাও এই লিগেসির বিশ্বস্ত বাহকে পরিণত হন যেজন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিকেন্দ্রিকতা ও শিক্ষকের ক্ষমতায়নের বিষয়টি কখনই প্রশ্রয় পায় নি আর হাতশাগ্রস্ত শিক্ষকরাও আন্দোলন করেছেন প্রধানত আর্থিক সুবিধা আদায়ের জন্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের জন্য, শিক্ষার বিকেন্দ্রীয়করণ ও শিক্ষকের ক্ষমতায়নের জন্য নয়। অধিকন্তু শিক্ষাব্যবস্থার, শিক্ষানীতির পরিবর্তনের দিকেও তারা তেমন দৃষ্টি দেননি কোনদিন।

আমরা সবাই জানি, মাধ্যমিক শিক্ষাই আসলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ড, অথচ শিক্ষার এ স্তারটি আজও সর্বাধিক অবহেলিত। সারাদেশে অপরিকল্পিত উচ্চশিক্ষার যে ব্যাপক বিস্তার ঘটছে তা অনেকাংশে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির বিনিময়েই, কিন্তু দেশের শিক্ষিত সমাজ তাতেই মদদ দিচ্ছেন এবং শিক্ষকসমাজও এসম্পর্কে নিশ্চুপ। মাধ্যমিক শিক্ষরা কেন তাদের ছাত্রছাত্রীদের মেধাবিচারের অধিকারী নন, অর্থাৎ তাদের নেওয়া পরীক্ষাগুলোয় তাদের ভূমিকা শেষপর্যন্ত কেন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে, এর পরিবর্তন শিক্ষকরা চান বলে মনে হয় না, অথচ এটি

www.pathagar.com

তাদের ক্ষমতায়নের একটি প্রধান অবলম্বন। আমরা পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোই অনুসরণ করছি আর সেটাই স্বাভাবিক। সোভিয়েত রাশিয়ায় মাধ্যমিক স্তরে কোন পাবলিক পরীক্ষা ছিল না, শিক্ষকরাই স্কুলে পরীক্ষা নিতেন, সার্টিফিকেট দিতেন। আমার মনে হয় না তাতে ছাত্ররা সুশিক্ষা পায় নি, অথচ সেই দেশে নকলের রেওয়াজ অনুপস্থিত নয়, শিক্ষকমাত্রেই ঈশ্বরপুত্রও নন। আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ্য, পশ্চিমের উন্নত বিশ্বে শিক্ষকদের বেতন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম।

আমাদের শিক্ষার এখন চরম দুর্দিন, শিক্ষকের ক্ষমতায়নের বিষয়টিও প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে উঠেছে, অথচ স্বাধীনতার পর তা কতই-না সহজ ছিল। আমরা আসলে পাকিস্তানের ঐপনিবেশিক শাসনের লিগেসি আজও বহন করে চলেছি, খেসারতও দিচ্ছি। ইদানিং দলীয় রাজনীতি শিক্ষাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে, একটি দানবীয় আগ্রাসী পরজীবীর মতো শিক্ষার প্রাণশক্তি শুষে খাচ্ছে।

শিক্ষক কেন, সকল পেশাজীবীরই ভালোভাবে কাজ করার মতো বৈষয়িক সচ্ছলতা প্রয়োজন। কিন্তু সেটাই একমাত্র উদ্দীপক নয়, শিক্ষার মতো আদর্শঘন সৃজনশীল পেশার ক্ষেত্রে তো নয়ই। অনেক শিক্ষকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন না কোন রাজনৈতিক দল বা মতাদর্শের শরিক এবং তার পার্টি ক্ষমতাসীন হওয়ার মধ্যেই শিক্ষাসমস্যার সমাধান দেখেন। নাগরিক হিসেবে শিক্ষকের রাজনৈতিক অধিকারের যাথার্থ্য প্রশ্নাতীত। কিন্তু শিক্ষক আন্দোলনকে অবশ্যই রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখার যৌক্তকতা আছে। কেননা, শিক্ষা নিজ বৈশিষ্ট্যের জন্যই সরকার বা রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে একীভূত হতে পারে না। শিক্ষা একটি পূর্ণাঙ্গ 'তন্ত্র'। শিক্ষার স্বাভাবিক বিকাশের জন্য রাষ্ট্র থেকে, দলীয় রাজনীতি থেকে তার বিচ্ছিন্নতা আবশ্যক। নিজের কথাই বলি। দেশে শিক্ষকতার সময় সর্বদাই মনে মনে একটি ক্ষোভ লালন করেছি যে আমি পুঁজির দাস হিসেবেই কাজ করছি, স্বাধীন শিক্ষক হিসেবে নয়। কেননা, গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই আসলে পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখার, তার বিকাশ ঘটানোর একটি উপাঙ্গ মাত্র, যা শোষণের পরোক্ষ অনুষঙ্গ ও পুঁজিবাদের দোসর। শিক্ষা ও শিক্ষকের মুক্তি শুধু সমাজতন্ত্রেই সম্ভব। কিন্তু সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে (সোভিয়েত ইউনিয়নে কোনোদিনই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি, বর্তমানে বহুল প্রচারিত এ ধারণাটি কিন্তু একটি ক্ষিপ্র-সাধারণীকরণ, যা আমাদের ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের দিকেই ঠেলে) দুই দশক বসবাস থেকে জানি, রাষ্ট্র শিক্ষাকে কুক্ষিগত করার দরুন সেখানে সত্যিকার শিক্ষিত স্বাধীন মানুষ কমই তৈরি হয়েছে। শিক্ষকরা ক্ষমতাসীন দলের কর্মসূচির আদলেই ছাত্রছাত্রীদের গড়তে বাধ্য হয়েছেন এবং ফলত সংকটকালে রাষ্ট্র ব্যাপক জনসাধারণের সমর্থন পায় নি। তারা অসহায় দর্শক হয়েই ছিল এবং এককালের প্রবল পরাক্রমশীল সোভিয়েত রাষ্ট্র

www.pathagar.com

তাসের ঘরের মতোই ধ্বসে পড়ল আপনা থেকে, কোন গণআন্দোলন ছাড়াই। সেই দেশের মানুষের মধ্যে বর্তমানে নৈতিকতার যে দুর্ভিক্ষ তাও বহুলাংশে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতার জন্যই। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া সফরের সময় সেই যাত্রাকে তীর্থদর্শনের সামিল বলে উল্লেখ করলেও শিক্ষার এসব ত্রুটি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। সোভিয়েত শিক্ষাবিদরা এ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন এমন কথা ভাবার কোন হেতু নেই। সেই দেশ মাকারেঙ্কো ও শুকমলিন্স্কির মতো বহু শিক্ষাবিদদের জন্ম দিয়েছে, কিন্তু তাঁরা ছিলেন সমাজতন্ত্রাচ্ছন্ন কিংবা একান্তই অসহায়। বলা বাহুল্য, শিক্ষার স্বাতন্ত্র্যহীনতা ও রাষ্ট্রের উপাঙ্গে তার পর্যাবসানের জন্যই এ পরিণতি। আমাদের শিক্ষক আন্দোলনের নেতৃবর্গ এ সম্পর্কে কতোটা সচেতন জানি না, কিন্তু তাদের আন্দোলনে শিক্ষাভাবনা যে প্রকটভাবে অনুপস্থিত সেটা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি। আমাদের শিক্ষকরা প্রশিক্ষণকালে শিক্ষাতত্ত্বের পাঠ নেন, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগের চেষ্টা করেন না। একটি ধনতান্ত্রিক (গণতান্ত্রিক) রাষ্ট্র হিসেবে সমাজতন্ত্রের তুলনায় (যা আজ আমাদের অনেক শিক্ষকেরই আদর্শ) এখানে শিক্ষকের স্বাধীনতা বেশি। কিন্তু আমরা এ স্বাধীনতাটুকুর সুযোগ নিতে চাই শুধুই বৈষয়িক স্বার্থ আদায়ে, শিক্ষা-উন্নয়নে নয়। কিন্ডারগার্টেন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নানা কিসিমের বিদ্যায়তন গড়ে উঠেছে। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশের লক্ষ্য যতটা অর্থোপার্জন ততটা শিক্ষা-উন্নয়ন নয়। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেও কিন্তু শিক্ষকতার পেশার নানা সমস্যা আছে, তারাও জীবিকার মানোন্নয়নের জন্য আন্দোলন করেন, কিন্তু আপন কর্তব্যে ফাঁকি দেন না। সেই শিক্ষকরা সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন, বইপত্রও লেখেন, নতুন নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবনের প্রয়াস পান। আমাদের ক্ষেত্রে এমনটি কমই দেখা যায়। আমাদের জাতিগত মেধার দৈন্য আছে একথা স্বীকার্য নয়। নইলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে একজন আরজ আলী মাতব্বরের উদ্ভব ঘটে কীভাবে? গোটা দেশ আজ এক নৈরাজ্যিক অনিশ্চয়তাময় ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মজ্জাগত ধর্ম ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্বে লিপ্ত। আমরা তো জানি, যে দলই ক্ষমতাসীন হোক জনগণের সঙ্গে শিক্ষকের ভাগ্যেরও কোন মৌলিক হেরফের ঘটবে না আর পরিবর্তন কিছু ঘটলেও, তা হবে একান্তই প্রসাধনমূলক। এটাই ঐতিহাসিক বাস্তবাবস্থা। এ নিষ্ঠুর ধাবমান প্রক্রিয়ার কথা মনে রেখেই শিক্ষকদের সুবিধাবাদ ও কূপমণ্ডুকতা থেকে মুক্ত সুদূরপ্রসারী প্রয়োগযোগ্য একটি কর্মনীতি উদ্ভাবন করতে হবে, যেকোন মূল্যে শিক্ষাদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ভাবী প্রজন্মের কাছে এজন্য তারা দায়বদ্ধ।

১৯৯৪

www.pathagar.com

এ কেবল ফুটাপাত্রে

১৯৬২ সালের ঘটনা। বরিশালের আমার এক বন্ধুর স্কুলে গিয়েছিলাম। দূর মফস্বলের স্কুল। দু'বছর হল তারা বিজ্ঞান বিভাগ খুলেছেন। তিনি বিজ্ঞানভবন দেখালেন। সুন্দর সাজানো ঘর। মাঝখানে প্রশস্ত টেবিল। কাঁচের আলমারিতে যন্ত্রপাতি। চার্ট, মডেল ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল মনে হল না। বন্ধু দুঃখ করে বললেন বিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু অযথা। তার চোখে হতাশার গ্লানি : 'গতবার ছিল বিজ্ঞান বিভাগে সাতজন ছাত্র, এবার মাত্র পাঁচজন।' তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললাম, 'আগামী বছর নিশ্চয়ই অনেক বেশি ছাত্র পাবেন। বিজ্ঞানের যুগ। সবাই বিজ্ঞান পড়তে চায়।' কিন্তু বন্ধু এ আশ্বাসে উদ্দীপ্ত হলেন না। আজ দশ বছর এ লাইনে আছেন। হতাশা এ পেশার নিয়তি। শিক্ষা সামগ্রিকভাবে এবং বিজ্ঞান বিশেষভাবে এদেশে অবহেলিত।

গাঁয়ের পথ ধরে দু'জনে চলেছি। শরতের আশ্চর্য দিন। শিশির-ধোয়া পাতার স্বচ্ছ সবুজে বিকীর্ণ রোদের জ্যোৎস্নায় বহু দূর হেঁটে থামলাম এক ডোবার ধারে। টলটলে পানির ভেতর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শেওলা, নানা জাতের জলজ গাছপালা, মাছ ব্যাঙ পোকা, যেন সযত্নে সাজানো একটি অ্যাকুয়ারিয়াম। মনে পড়ল, শহরে এ জিনিস দুষ্প্রাপ্য। ক্লাসে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ বোঝানোর পক্ষে এমন সুন্দর একটি উদাহরণের কৃত্রিম অনুকরণ অসম্ভব। অথচ আমার বন্ধুর মতো আমিও জানি এখানে এ পরিবেশে বস্তুটির সদ্ব্যবহার অসম্ভব। এ অপচয় নিয়তিকল্প। আমাদের সমাজে তথা শিক্ষায় বিজ্ঞান কোনদিই যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করে নি। এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও বর্তমান সংস্কৃতিকে বিজ্ঞানবিরোধী বলাটা অতিশয়োক্তি কি? প্রাচীনকাল সম্পর্কে একথা প্রায় সব দেশের পক্ষেই প্রাসঙ্গিক। প্রয়োজনের তাগিদে প্রযুক্তিবিদ্যার আশ্রয়ে যেটুকু বিজ্ঞান একদা গ্রিস মিসর আরব ও ভারতে বিকশিত হয়েছিল, বর্তমান বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়। এ দুয়ের মধ্যে দীর্ঘ অন্ধকার মধ্যযুগ রয়েছে এবং কল্পনার আশ্রয় ছাড়া তা অতিক্রম অসম্ভব। প্রাচীন বিজ্ঞান মানুষের প্রয়োজন, অনুসন্ধিৎসা ও সহনীয় সমাজ ব্যবস্থার মিলিত অবদান। অতঃপর প্রায় সব দেশেরই ইতিহাস অভিন্ন। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, রাজন্যবর্গের

www.pathagar.com

রোষদৃষ্টি, যাজক গোষ্ঠীর উষ্মা ও সর্বোপরি অনগ্রসর কৃষি-অর্থনীতির কবলে প্রাচীন বিজ্ঞানের বিলুপ্তির কালক্রম দেশভেদে ভিন্ন হলেও বিলয়ের ধরন সর্বত্রই অভিন্ন।

আধুনিক বিজ্ঞান ইউরোপের আত্মজ : শিল্পবিপ্লবের প্রচণ্ড প্লাবনে ধ্বস্ত কুসংস্কার ও ধর্মাধিপত্য অবসানে তার পুনর্জন্ম, বিকাশ ও বৃদ্ধি। উৎপাদন পদ্ধতির প্রযুক্তিবিদ্যা নির্ভরতার জন্যই বিজ্ঞানের প্রসার। পুঁথিপত্র ও গবেষণাগারের সীমিত পরিসরে নয়, বিজ্ঞান সেখানে জনসাধারণের ভাবনা এবং মননেরও অংশ। এমন একাত্মতার কারণ এই যে, বিজ্ঞানের স্থাবর প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে ছিল কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, স্বৈরাচার থেকে মুক্তির আশ্বাসও। ইউরোপে বিজ্ঞান সমাজবিপ্লবের অনুষঙ্গ তথা তার ফসল। কিন্তু আমাদের দেশে বিজ্ঞানের অবস্থান ও ভূমিকার স্বরূপ ভিন্নতর। আমাদের উৎপাদনের ব্যাপক অংশে এবং চিন্তার বহুদূর গভীরে মধ্যযুগ আজও প্রকট। এখানে কোন যথার্থ শিল্পবিপ্লব কিংবা সমমানের অন্য কোন ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে নি। ইংরেজ আমলে শিক্ষার সৌখিন অনুষঙ্গ হিসেবে এদেশে আমদানিকৃত বিজ্ঞান আজও বিদ্যায়তন ও গবেষণাগারের নিয়ন্ত্রিত গণ্ডি পেরিয়ে উন্মুক্ত জলহাওয়ায় মুক্তি পায় নি। তার অভিযোজন এখনো অসম্পূর্ণ। বিজ্ঞানের অবয়ব আমাদের দেশে মরুদ্যানের সবুজের মতোই সীমিত ও সংকীর্ণ এবং ব্যাপক ঊষরতার বেষ্টনীতে ত্রস্ত। যতদিন এ মরুতে উর্বরতার প্রবল আবেগ সঞ্চারিত না হবে ততদিন আমার বন্ধুর স্কুলের কাঠের আলমারিতে আটকান যন্ত্রপাতির মতো বিজ্ঞানও বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবে না। বলা বাহুল্য, এজন্য যতোই অর্থ ও শক্তি ব্যয় হোক, অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না। তাই আমাদের বিজ্ঞানীদের জন্য শুধু শিক্ষা ও গবেষণাই নয়, সমাজচিন্তায়ও মনোনিবেশ আবশ্যক। বিজ্ঞানের সার্বিক বিকাশ কার্যত প্রাগ্রসর অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ। অনগ্রসর অর্থনীতির দেশে বিজ্ঞানীর দায়িত্ব তাই বহুমুখী। শুধু সত্যের অনুসন্ধানই নয়, সত্যের প্রতিষ্ঠাও তার কর্তব্য। বিজ্ঞানের অপব্যবহার প্রতিরোধে সংঘবদ্ধ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী সমাজের কার্যকলাপ তাদের সামাজিক চেতনা ও দায়িত্বেরই সাক্ষ্যবহ। আমাদের বিজ্ঞানী-সমাজে এ সচেতনতার অভাব লক্ষণীয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা যতটা সমাজ-সচেতন, একই সামাজিক অবস্থান সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা তাদের এ দায়িত্ব সম্পর্কে ততটাই নিস্পৃহ। এর কারণ কি বিজ্ঞানীদের তুলনামূলক অধিকতর আর্থিক নিরাপত্তা? বলা বাহুল্য, এটি কোনোক্রমেই দীর্ঘস্থায়ী হবার নয়। তাছাড়া সৃজনশীল শিল্পীর মতো সৃষ্টিধর্মী বিজ্ঞানীর কাছে আর্থিক লাভালাভ মুখ্য নয়, সত্যের সন্ধান ও প্রতিষ্ঠাই তার ব্রত। বিজ্ঞানের ঐতিহ্য ও সার্বিক বিকাশের জন্য বিজ্ঞানীর পক্ষে এ অবশ্যপালনীয় ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এ দায় এড়িয়ে চলা

www.pathagar.com

অনুচিত। অনুন্নত দেশে বিজ্ঞানের প্রসার বস্তুত উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ, একটি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও দেশগঠনে সকল শ্রেণীর আত্মনিয়োগের ওপরই নির্ভরশীল। যতদিন এ পর্যায়ে উল্লেখ্য অগ্রগতি সাধিত না হবে ততদিন আমাদের বিজ্ঞান ফুটাপাত্রে পানি ঢেলে তৃষ্ণা মেটাবার ব্যর্থ দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পাবে না। যতই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ুক, যতই বিশাল-অবয়বের গবেষণাগার নির্মিত হোক, বিদেশি ডিগ্রিধারীরা হাজারে হাজারে দেশে ফিরুন, এই বদ্ধাবস্থার অবসান ব্যতীত বিজ্ঞানের গুহাবাস কোনদিনই শেষ হবার নয়।

১৯৮০

www.pathagar.com

বরিশালে একদিন

বরিশালের এক বিদগ্ধজন ও মনস্বী শিক্ষক তাঁর নয়-দশজন ছাত্রীর সামনে আমাকে বসিয়ে দিয়ে বললেন, ওদের কিছু বলুন। আমি অভিভূত ও উৎফুল্ল, কতদিন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। শিক্ষকতা ছেড়ে বিদেশে চাকরিতে থাকাকালে বারবার স্বপ্নে দেখেছি, ক্লাস নিতে গিয়ে শ্রেণীকক্ষ খুঁজে পাচ্ছি না কিংবা পেলেও সেটা শূন্য। কিন্তু কী বলা যায় এদের? সবাই দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী, অনিশ্চিত উচ্চশিক্ষার আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুকদের সংকট বড়ই দুর্ভাগ্যজনক। কেননা, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল মেধাবিচারের কোন নিখুঁত বা নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নয়। একবার আমরা নটর ডেম কলেজের রেওয়াজ ভেঙে পরীক্ষামূলকভাবে দ্বিতীয় বিভাগপ্রাপ্ত কিছু ছাত্রকে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করি এবং তারা সবাই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। আমাদের দেশের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের অনেকেই শিক্ষার সর্বস্তরে প্রথম শ্রেণী না পেয়েও নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। আইনস্টাইন বা রবীন্দ্রনাথের কথা বাদই দিলাম। লাডলী মোহন মিত্রের মতো একজন সাধারণ অধ্যাপকের কথা এক্ষেত্রে আরও প্রাসঙ্গিক, যিনি স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণী পেয়েও উচ্চ মাধ্যমিক রসায়নবিদ্যার একটি বই লিখে এতটাই খ্যাতি লাভ করেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অধ্যাপনায় আমন্ত্রণ জানায় এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

কিন্তু এসব কথা এদের শোনানো নিরর্থক। সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ শুরু। আমি ১৯৫৪ সালে প্রথম বরিশাল আসি এবং শহরের নিসর্গশোভা দেখে মুগ্ধ হই। সে কথাই শোনাই এবং তারা অবাক হয়। স্টিমারঘাট থেকে সাগরদি পর্যন্ত সুরকির মনভোলানো রাঙামাটির পথ, দুই পাশে পাম আর ঝাউয়ের সারি, চোখের সামনে কীর্তনখোলা নদী, বেলস পার্কের লাগোয়া আরএসএন কোম্পানির বাগানঘেরা আবাসন ইত্যাদি। তারা এসব কিছুই দেখেনি। সেকালে বরিশালবাসী নিজ শহরেই থাকতে ভালোবাসত, জরুরি কাজ ছাড়া ঢাকায় যেত না। এখন সময় ও পরিস্থিতি পালটেছে। রাজধানীর কুহকী টানে সবাই ভূতগ্রস্ত। রাজনীতিকেরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী, তাই জেলা-উপজেলার শহরগুলো অবহেলিত, নৈরাজ্যিক নির্মাণে সৌন্দর্যহীন, জরুরি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং অনেকটা সেজন্যও ঢাকার এই অস্বাস্থ্যকর মেদস্ফীতি।

www.pathagar.com

নগর পরিকল্পনার কথা তাদের বলি এবং এটিও যে একটি পাঠ্যবিষয়, তাদের তা বোঝাই – শুনে তারা অবাক হয়। বুয়েটে পদার্থবিদ্যা ও কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ব্রিডিং ও জেনিটিকসে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ সম্ভব সেটাও তাদের অজানা। পড়ার মতো কত কত বিষয় আছে। কোথায় কী পড়া যায় মফস্বলের ছাত্রছাত্রীরা এ সম্পর্কে অনেকটাই অজ্ঞ। শিক্ষকেরা কিছুই বলেন না, কোন স্বপ্নও তাদের দেখান না। এ শিক্ষার্থীরা যেটুকু জানে সবই মোটা দাগের। আমি নিজেও এই অজ্ঞতার শিকার। অনার্স সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় স্নাতক পর্যায়ে পাস কোর্স পড়েছি কলকাতার সিটি কলেজে ১৯৫০ সালে। বরিশালের কৃতী সন্তানদের সম্পর্কেও তারা বিস্তারিত জানে না। অশ্বিনীকুমার, ফজলুল হক, বড়জোর মনোরমা মাসিমা। ব্রজমোহন কলেজের বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ শান্তিসুধা ঘোষও অচেনা। অরুণা আসফ আলী যে বরিশালের মেয়ে এই তথ্য তাদের জানার কথা নয়। কলকাতার গড়ের মাঠে তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। মস্কোয় আমাদের বাসায়ও গেছেন, তাঁর কীর্তিকথা-গল্পকথা তাদের শোনাই। তারা কেবলই অবাক হয়। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন, আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কেও তাদের কোনো ধারণা শূন্য। থাকার কোন হেতু নেই। কেননা, স্কুলের পাঠ্যক্রম থেকে অনেকদিন বাধ্যতামূলক ইতিহাস ও ভূগোল পাঠ উঠে গেছে। বিকল্প হিসেবে তারা পড়েছে সমাজবিদ্যা, যা বস্তুত অনেক বিদ্যার এক জগাখিচুড়ি – তাতে বিভ্রান্তি বাড়তে পারে, জ্ঞান বাড়ে না। আমরা পাঠশালায় মানচিত্র এঁকেছি – প্রথমে নিজ গ্রামের, পরে ক্রমান্বয়ে থানা, মহকুমা ও প্রদেশের, উচ্চ-বিদ্যালয়ে দেশ ও পৃথিবীর। স্থানীয় ইতিহাস অবশ্য পড়ান হতো না (পড়ান উচিত), পড়েছি ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডের ইতিহাস। এভাবে ছেলেবেলায়ই পৃথিবীর ভূগোল ও ইতিহাস সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মেছে। মানুষ যে একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং তারা একই গ্রহের বাসিন্দা ইতিহাস ও ভূগোল পাঠ ছাড়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই বিশ্ববোধ তাহলে কিশোরমনে কীভাবে জন্মাবে? আমাদের শিক্ষা পরিকল্পকেরা এসব ভাবেন বলে মনে হয় না।

আমার জ্যেষ্ঠ বন্ধু বরিশালের নিসর্গী এম আহমেদের কথাও ছাত্রীদের জিজ্ঞেস করি। কেউ তাঁকে চেনে না, অথচ প্রয়াত হয়েছেন মাত্র ২৫ বছর আগে। দুর্লভ গাছপালা ও পাখপাখালিতে ভরা তাঁর বাড়িটি ছিল আমাদের গুরুগৃহতুল্য। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম জয়েন্ট আমাজন লিলির বীজ থেকে চারা জন্মান। বরিশালের অনেক পুকুর এবং ঢাকার বলধা উদ্যান ও রমনা লেকে সেগুলো লাগান। তাঁর কাছ থেকেই অর্কিড ও ক্যাকটাস চিনতে শিখি। এককালে তাঁকে নিয়ে টিভিতেও অনুষ্ঠান হয়েছে। এই মেয়েরা 'আমাজন লিলি' চেনে না, নামও শোনেনি কোনো দিন। অথচ বিদেশে শিশুপাঠ্য বইয়েও এই লিলির ছবি আছে, প্রায় সবাই

www.pathagar.com

অন্তত নামে চেনে। যাহোক, এসব কথা শুনে তারা ফকিরবাড়ি রোডে এম আহমেদের বাড়িতে একবার যাওয়ার আগ্রহ দেখায়।

আমার শিক্ষকতাকালে উচ্চমাধ্যমিকের জীববিদ্যা কোর্সে ডারউইন ও বিবর্তনবাদ অবশ্যপাঠ্য ছিল। অতীব আগ্রহসহকারে পড়াতাম। কেননা, বিবর্তনবিদ্যা শুধু বিজ্ঞান নয়, একটি দর্শনও, যা বিভিন্ন জ্ঞানশাখায়, এমনকি সাহিত্যেও আত্তীকৃত হয়েছে। কয়েক বছর থেকে স্কুল-কলেজ পর্যায়ে এটি পড়ান হয় না, পরিবর্তে এসেছে জীবপ্রযুক্তি। অথচ এও যে ডারউইনের বিবর্তনবাদেরই সম্প্রসারণ, প্রায়োগিক ফল – এটা কি পাঠ্যবিষয় প্রণেতারা জানেন না, নাকি তারা প্রয়োগকে তত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছেন? ইচ্ছা ছিল বিষয়টি মেয়েদের বোঝাই, কিন্তু তাদের আর সময় নেই, আছে ক্লাস ও কোচিং। অগত্যা ওদের বিদায় দিয়ে ভারাক্রান্ত মনে বাড়ি ফিরি।

২০১১

www.pathagar.com

রত্ন ও রত্নগর্ভা

পাকিস্তানি আমলে উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আমলারা 'রত্ন' এবং তাঁদের জননীরা 'রত্নগর্ভা'র সনদ পেতেন, অন্য পেশার কেউ ও তাদের গর্ভধারিণীরা নন। সেকালে মহকুমা বা জেলার প্রশাসকেরাও ছিলেন রাজতুল্য প্রতাপশালী, সব সম্মান ছিল তাঁদের প্রাপ্য, আর লেখক, শিল্পী, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন সমাজের তলানির মতো, অপাঙ্‌ক্তেয়ও বলা যায়। মা-বাবারা সন্তান সিএসপি হোক এমন স্বপ্ন দেখতেন, তবে এজন্য উঠেপড়ে লাগার সুযোগ তাদের ছিল না। অনেক ছেলেমেয়ে মানুষ করতে হিমশিম খেতেন, শিক্ষাদীক্ষার পুরোটাই ছেড়ে দিতেন শিক্ষকদের হাতে আর শিক্ষকেরাও নিজ শক্তি ও কর্মসময়ের পুরোটাই দিতেন নিজ নিজ বিদ্যায়তনে। সেই সমাজ ছিল কিছুটা স্থবির, অর্থের ছড়াছড়ি ছিল না, হঠাৎ বড়লোক হওয়া তো নয়ই। স্বাধীনতার পর পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, বহুমুখী সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, বিত্ত ও ব্যবস্থাপনার (বা অব্যবস্থাপনার) পরিমাণ ও পরিসর বেড়েছে, প্রতিযোগিতা তুঙ্গে উঠেছে, তাতে আলোড়িত হচ্ছে গোটা সমাজ, বিশেষত মধ্যবিত্ত, কেননা সেখানেই থাকে মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পুঁজির বেশির ভাগ। শিশুদের মধ্যে যে-প্রতিযোগিতা নিয়ে অধ্যাপক মেহতাব খানম উদ্বিগ্ন (*প্রথম আলো*, ৮ মে, *আমরা রত্ন চিনতে ভুল করছি না তো*), তা আসলে উপর্যুক্ত বাস্তবতার বিস্তারমাত্র, যার রাশ টানা আমাদের সাধ্যাতীত। এই পরিস্থিতিতে 'রত্ন' ও 'রত্নগর্ভা'র স্থানবদল ঘটবেই।

শিশুর ওপর অধিক চাপ প্রয়োগ ও তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিমনস্ক করে গড়ে তোলার কসরত আজ মধ্যবিত্ত সমাজের একক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। মমতাময়ী মা ও দিদিমারা শিশুদের (সাধারণত একটি) পড়াশোনায় সাহায্য করেন, ছবি আঁকান, গল্প পড়ে শোনান, খেলাধুলায়ও উৎসাহ জোগান, কিন্তু শিশু পরীক্ষায় একটু খারাপ করলেই তারা ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন, 'তোমার ওই বন্ধুটা তোমার চেয়ে বেশি নম্বর পেল, আর তুমি...।' শিশুটির মুখ তখন হঠাৎ কালো হয়ে ওঠে, সে কুঁকড়ে যায়, নিঃশব্দে কাঁদে। অজ্ঞানতাপ্রসূত এই নির্মমতা কতটা বিধ্বংসী, তা তুলে ধরার জন্য মেহতাব খানমকে অশেষ ধন্যবাদ।

অনেক দিন শিক্ষকতা ছেড়েছি, তবু মাঝেমধ্যে ছাত্রছাত্রীদের কিছু বলার জন্য ডাক পড়ে। কিন্তু লক্ষ করেছি, বক্তৃতা শেষে আজকাল তারা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করে না, এমনকি প্ররোচনা সত্ত্বেও। ভালো নম্বর পাওয়ার একক চেষ্টা এবং আনুষঙ্গিক, পারিবারিক ও বিদ্যালয়িক চাপ এই নিস্পৃহতার একটা কারণ হতে পারে।

শিশু একটি সম্পূর্ণ মানুষ, আত্মবিকাশের একটি নিজস্ব মডেল নিয়েই জন্মে, অভিভাবকের আচরণে সে প্রতিক্রিয়া জানায়, যার নিহিতার্থ তারা বুঝতে পারেন না বা ভুল বোঝেন। তেমন কিছু কথা আছে আতোয়াঁ সাঁ-এক্সুপেরির লেখা *দ্য লিটল প্রিন্স* বইতে। এটি হল ভিনগ্রহবাসী এক রাজপুত্রের সঙ্গে লেখকের বন্ধুত্ব ও বিচ্ছেদের কথা। বইটি আমি সর্বদা কাছে রাখি, তাতে বেঁচে থাকার উদ্দীপনা সঞ্চারের অনুঘটক রয়েছে। বইটি ছোটদের বড়দের সকলের। কয়েকটি বঙ্গানুবাদও আছে। তা থেকে ছেঁড়োখোঁড়া সমান্য কিছু :

'আমার বয়স যখন ছ' বছর, তখন বনজঙ্গল বিষয়ক একটা বইতে... একটি ছবি দেখেলিাম–বিশাল অজগর একটি জন্তুকে গিলে খাচ্ছে। তারপর থেকেই জঙ্গলে দুঃসাহসিক অভিযান নিয়ে গভীর ভাবনাচিন্তা শুরু করি এবং একটি ছবি আঁকি। আমার এই শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্ম বড়দের দেখাই... তাঁরা এটিকে টুপির ছবি বলেন।...ছবিটি মোটেও টুপির নয়, ওটা ছিল অজগরের পেটের ভেতর একটা হাতি। ওরা বুঝতে না পারায় আরেকটি ছবি আঁকি... তারা উপদেশ দিলেন...আঁকাটাকা বন্ধ করে ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক ও ব্যাকরণে মন দাও। ফলে ছবি আঁকার মন আর আঁকিয়ে হওয়ার স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিতে হল।...ছবি আঁকার ব্যর্থতা আমাকে হতাশ করে দিল। বড়রা কোন কিছুই বুঝতে পারে না, আর তাদের বোঝানোর ব্যাপারটা ছোটদের জন্য বড়ই বিরক্তিকর। ...তারপরই উড়োজাহাজ চালাতে শিখি...কবুল করতেই হবে যে ভূগোলের জ্ঞান খুব কাজে এসেছিল।...বড়দের সঙ্গে অনেক মেলামেশা করেছি, জেনেছি ও শিখেছি, তবু তাদের ব্যাপারে আমার ধারণা খুব একটা বদলায়নি। ...তাদের মধ্যে সবচেয়ে সমঝদারদের আমার প্রথম ছবিটি দেখাতাম। সবাই বলতেন – ওটা টুপির ছবি। তারপরও কি ওদের সঙ্গে প্রাচীন বনভূমি, নক্ষত্ররাজি ও সৌরমণ্ডল নিয়ে কোন আলাপ সম্ভব?... বড়রা সংখ্যার হিসাবটা খুব ভালবাসেন। নতুন কোন বন্ধুর কথা বললে, তারা জিজ্ঞেস করবেন না – তার কণ্ঠস্বর কেমন, কোন কোন খেলা ওর পছন্দ, সে প্রজাপতি সংগ্রহ করে কি না; বরং বলবেন – ওর বয়স কত, কয়টি ভাইবোন, শরীরের ওজন কত, ওর বাবার টাকাকড়ি কতটা। এসব ফালতু প্রশ্নের জবাবেই তারা খুশি...। তুমি যেই ওদের বলবে, আমি একটা সুন্দর বাড়ি দেখেছি – গোলাপি ইট দিয়ে তৈরি, জানালায় জিরানিয়াম ফুল আর ছাদের ওপর পায়রার ঝাঁক; তাতে তাঁরা বাড়িটা সম্পর্কে কোন ধারণাই করতে পারবেন না। তোমাকে বলতেই হবে, ওটা বানাতে খরচ হয়েছে এক লাখ ২৪ হাজার টাকা, আর অমনিই

www.pathagar.com

শুনবে–আহা, কী সুন্দর বাড়িটি! বুঝুন, এবার।...প্রায় ছয় বছর হলো বন্ধুটি আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। তার একটা বর্ণনা দিতে পারলে অবশ্য তাকে ভুলে যাওয়া চলবে না। কোনো বন্ধুকে ভুলে যাওয়া খুব কষ্টের ব্যাপার। সবার তো মনের মতো বন্ধু জোটে না। আমার বন্ধুকে ভুলে গেলে তো আমি বড়দের মতো হয়ে যাব, যারা সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই ভাল বুঝতে পারে না।...আরেকটি কথা,...আমার বন্ধুটি কোনোদিনই আমাকে কিছুই ভালভাবে বুঝিয়ে বলেনি, হয়ত ভেবেছিল আমি ওরই মতো। আমি তো জনতামই না কাঠের বাক্সের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা একটা ভেড়া কীভাবে দেখা যেতে পারে। আমিও তো কিছুটা ওই বড়দের মতো। আমাকেও তো বড় হয়ে উঠতে হয়েছে।

প্রতিযোগিতাকীর্ণ এই পৃথিবীতে শিশুকে তার জন্মগত নীলনকশার আদল ও সভ্যতার চাহিদা মিশিয়ে মানুষ করা আদৌ সম্ভব কি না কেউ জানে না। এসব নিয়ে প্রভূত তত্ত্ব ও প্রয়োগের চেষ্টা আছে। আমরা সম্ভবত এসবের ধারে-কাছে কোথাও নেই।

২০০৮

www.pathagar.com

নিষিদ্ধ কথা, অসভ্য কথা

আনোয়ারা সৈয়দ হক লিখিত 'তুমি এখন বড় হচ্ছো' পড়তে পড়তে স্বগ্রামের একটি ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের বাস সিলেটের পূর্বাঞ্চলে, পাহাড়ি এলাকা, বড় সর্পসংকুল। বাড়ির পেছনের বাঁশবাগানে জাতসাপদের মৌরসী আস্তানা। দিন-দুপুরে দিব্যি ছুটতো উঠান পেরিয়ে, লোকজন গ্রাহ্য করত না। আমরা কেউটে গোখরাকে বলি আলদ, সম্ভবত আরবি বা ফার্সি শব্দ। এক আলদ ঢুকে পড়ে গাঁয়ের একটি ঘরে, দোলনায় এক শিশু, মা পুকুরে। ফিরে এসে দেখেন, দোলনার ডাণ্ডা পেঁচিয়ে শিশুটির ওপর মাথা উঁচিয়ে ওটি দুলছে। মুহূর্তের বিহ্বলতা কাটিয়ে ঝটিতে তিনি সাপের গলা সাপ্টে ধরেন, আছড়ে আছড়ে মেরেও ফেলেন। গর্ভধারিণীরই কেবল এমন দুঃসাহস থাকে। আনোয়ারা হক জননী বলেই সন্তানসম একটি প্রজন্মের জন্য সহজাত মাতৃস্নেহবশত এমন দুঃসাহসের ঝুঁকি নিয়েছেন, সর্পময় ভয়ঙ্কর এক ট্যাবুর গলা টিপে ধরে এদের বাঁচাতে চেয়েছেন। তিনি ধন্যবাদার্হ, আমরা কৃতজ্ঞ।

মানুষ 'হোমো স্যাপিয়েন্স' অর্থাৎ জ্ঞানী জীব, কিন্তু জন্তুও বটে। 'Ontogeny repeats phylogeny' নামের অমোঘ নিয়মটির আওতাধীন দেহ ও মন উভয়ই, পশুত্ব থেকে মানবত্ব, অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানার্জনে তাকে অনেকগুলো স্তর উত্তীর্ণ হতে হয়, আর এতে সর্বাধিক বিপদসঙ্কুল পর্যায়টি উঠতি বয়স, শেষ-কৈশোর, যেখানে যথার্থ মানুষ হওয়ার (বা না-হওয়ার) ভিতটি স্থিত, যখন কেবলই আলো-আঁধারিতে বিচরণ, পদে পদে খানা-খন্দ, যৌনতার কাম থেকে প্রেমে উত্তরণের কাল, সৌন্দর্যবোধ উন্মেষেরও, একটি শারীরবৃত্তীয় বিপ্লবের মুহূর্ত। আমাদের মা প্রায়শই একটি প্রাচীন প্রবচন শুনাতেন 'মান ও হুঁশ যার আছে সে-ই মানুষ'। কিন্তু এ দুটি গুণ অর্জন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে না, গড়ে-ওঠে নির্দিষ্ট সামাজিক পারিবারিক পরিবেশে, ধর্ম ও নৈতিকতার প্রভাবে, গুরুজনের সতর্ক তত্ত্বাবধানে, আমাদের নিয়ন্ত্রণাতীত বংশানুসৃতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের নিরিখেও। এসব অসংখ্য উপাত্তের জটিল মিথস্ক্রিয়ার ফলেই সমাজে থাকে সন্তসম মানুষ, নররূপী পশু ও মধ্যবর্তী অসংখ্য রকমফের। স্বতঃস্ফূর্ততার বদলে পরিকল্পিতভাবে পূর্ণাঙ্গ বিকশিত মানুষ তৈরির জন্যই তো শিক্ষাব্যবস্থা নামের বিশাল প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভব। অবশ্য তার ক্ষমতা, আমরা ভালোই জানি, কতোটা সীমাবদ্ধ।

www.pathagar.com

আপন আত্মবিকাশের দীর্ঘ ও বিচিত্র বর্ণালীলেখটি খুঁজলে দেখি তাতে সুস্পষ্ট চিহ্নিত আছে সেসব মুহূর্ত যখন অবোধ অবাধ্য পশুশিশুর মতো ফাঁদে আটকে যেতে যেতে যেন দৈবক্রমেই বেঁচে গেছি। আমাদের দেশের নব্বই ভাগ মানুষ যে গ্রামের বাসিন্দা সেখানে বড় হওয়ার সুবাদে ওই পরিস্থিতি ভালোই জানি। শহরের শিক্ষিত ও সচ্ছল লোকদের পরিবেশ (একমাত্র সংগঠিত বেশ্যালয় ছাড়া) গ্রামের চেয়ে অবশ্যই বহুগুণ উন্নত। গ্রামীণ জীবনে যৌনপ্রলোভন পর্যাপ্ত, সুযোগও সহজলভ্য, যৌনরোগের প্রকোপ অত্যধিক, বাক্যলাপ ও আচার-আচরণে রাখা- ঢাকের শিক্ষা ও সংস্কৃতি কোনটাই নেই, শ্লীল-অশ্লীলের ভেদরেখা অল্পই, ছোট-বড় বাছবিচার কম। সেখানে একটি শিশুর এ জাতীয় অকালপক্বতা ও বিনষ্টির সম্ভাবনা অত্যধিক। শহুরে পরিবেশও আদর্শ নয়। উঠতি বয়সে যৌনজীবন সম্পর্কে অজ্ঞতা নানা বিকৃতির উদ্ভব ঘটায়, যার খেসারত নগণ্য বলা যায় না। প্রয়োজন ভারসাম্যের, যা আজও অজানাই রয়ে গেছে। আমাদের প্রজন্মে আমরা অনেকে এ সংকটকাল পেরিয়েছি গল্প-উপন্যাস পড়ে, বীরপূজার সুবাদে, প্রথমে স্কুল-শিক্ষক (যাদের যৌনতাহীন দেবতুল্য ভাবতাম), পরে বিবেকানন্দ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্রের আদর্শে। কালটি ছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের, তাতে আবার সম্পৃক্ত ছিল ব্রহ্ম-চর্যের মাহাত্ম্য। নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভগ্নিভাব লালনে শরৎসাহিত্য খুই ফলপ্রসূ। 'পথের দাবি' আমাদের সম্মোহিত রেখেছিল দীর্ঘকাল। দেয়ালে লিখে রেখেছিলাম 'তুমি তো আমাদের মতো সোজা মানুষ নও। তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়েছ, তাই দেশের খেয়াতরী তোমায় বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়।' সব্যসাচীর প্রতি অপূর্বর এ শ্রদ্ধাঞ্জলি জননেতাদের প্রতি আমাদের আসক্তি বাড়িয়েছিল নিঃসন্দেহে, অধিকন্তু আমরা সেখানে পেয়েছিলাম ভারতীকে। প্রথমে ভালোবেসেছি বোন হিসেবে, যৌবনে তারই আদল খুঁজেছি প্রেমিকায়। আমার কোন কোন বন্ধু ওই নামটিই রাখেন প্রথম কন্যার। আমাদের ও বিশ্বসাহিত্যে এমন বই আছে ভুরিভুরি, তবে কিশোর-কিশোরীদের সেগুলো পড়ার সুযোগ এখন কম আর সেটাই দুঃখের। এক সময় আবুল হাসনাতের 'যৌনবিজ্ঞান' পড়ি, ছিল অগ্রজের গ্রন্থসংগ্রহে, অবশ্যই লুকিয়ে, তবে উপকৃত হয়েছি বলা যাবে না। বইটি বড়দের জন্য। 'তুমি এখন বড় হচ্ছো' তখন পেলে বড় ভাল হত। এ ধরনের বই অবশ্য সেই সময় বাংলায় ছিল না আর থাকলেও বড়রা সাগ্রহে আমাদের হাতে তুলে দিতেন না, আজো দেবেন কিনা সন্দেহ। উঠতি বয়সে যৌনশিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে শিক্ষাবিদরা এখনো অভিন্নমত নন। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো একটি দেশেও স্কুলে যৌনশিক্ষা চালু হয়েছিল আশির দশকের শুরুতে। ইতিপূর্বে বিতর্ক ছিল বহু বছর। ভারতে এ নিয়ে ইদানিং চিন্তা-ভাবনা চলছে। আমাদের দেশের

www.pathagar.com

শিক্ষাবিদরা বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন কিনা জানি না, তবে এমন প্রচেষ্টা যে বিশেষ মহলের প্রবল বাধার সম্মুখীন হবে, তা নিশ্চিত।

ষাটের দশকের গোড়ার দিকের কথা। একটি কলেজে পড়াই। ছুটির দিনে ল্যাবরেটরিতে নিজের কিছু কাজ করি। স্টাফ-রুম বন্ধ থাকে, অগত্যা ব্যবহার করি ছাত্রদের টয়লেট। সেখানে দেয়ালে লেখা থাকত নানা অশ্লীল কটুকাটব্য, অধিকাংশই নারীঘটিত, তাতে আবার নানা ফোড়ন। অন্যতর কিছু লেখাও দেখেছি, অসহায় আকুতিভরা : 'স্বপ্নদোষের দাওয়াই জানেন ভাই?', 'ধ্বজভঙ্গ সারে কখনো?' এবং করুণতর 'চিরপুরুষত্বহীনের ভবিষ্যৎ কী?' ইত্যাদি। তাতে কোন মন্তব্য বা সুপারিশ নেই, অর্থাৎ সঠিক উত্তর তাদের অজানা। কে এদের সাহায্য করবে? অভিভাবককে বলা চলে না, চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার রেওয়াজ নেই, বন্ধুদের বলে অযথা লজ্জা পাওয়া – কী করুণ পরিস্থিতি! আর মেয়েদের অবস্থা? জানার কোন উপায় ছিল না। আমি উদ্ভিদবিদ্যার শিক্ষক, মেয়েদের কলেজেও পড়িয়েছি। শৈবালবর্গের 'স্পাইরগিরা' ও ছত্রাক গোত্রের 'মিউকর' – এদের জীবনচক্রে একটি যৌনপর্যায়ও আছে, তারা নারী-পুরুষে বিভক্ত, মিলনের ধরনটি বহুলাংশে মনুষ্যকল্প। শ্রেণীকক্ষে বোর্ডে ছবি আঁকতে হত, ছেলেদের উচ্ছিত উত্তেজনার বিকিরণ টের পেতাম, কিন্তু মেয়েদের দেখতাম সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন, যেন উদ্ভিদ কাণ্ডের রকমফের বা পাতার কার্যকলাপের মতো একটি সাদামাটা বিষয়। সন্দেহ হত, তবে কি এ বয়সেও জীবনের এ দিকটি সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ? দুশ্চিন্তাও হত। সহজপ্রবৃত্তি ও নীতিবাক্যের কিছু সম্বল নিয়ে তারা অচিরেই পুরুষ-প্রধান একটি সমাজের শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রবেশ করবে। উচ্চতর বিদ্যায়তন, অফিস বা সংসার, যেখানে পদে পদে কত বিপদ ও লাঞ্ছনা অপেক্ষিত, যার প্রায় কিছুই তারা জানে না। সেই সময় 'তুমি এখন বড় হচ্ছো' থাকলে অবশ্যই ছেলেদের পড়তে বলতাম। কিন্তু মেয়েদের? সচেতন প্রগতিশীল কোন সহকর্মী অধ্যাপিকার সাহায্য নিতে হত।

কিন্তু ষাটের দশক পেরিয়ে গেছে অনেক দিন। অত্যাধুনিক যোগাযোগ-প্রকৌশলের সুবাদে পশ্চিমা বিনোদন অজস্র ভালো-মন্দ নিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়েছে অকস্মাৎ, বাছাইয়ের বড় একটা সুযোগ রাখেনি। ছবির কথা বাদই দিলাম, জনপ্রিয় ধুন্ধুমার গানের ক্লিপিংগুলোই কি কম ভয়ঙ্কর? এগুলো আমাদের উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ের সংবেদী মন থেকে প্রেমের অপূর্ব স্বপ্নটুকু কেড়ে নেবে, পূর্বরাগের বর্ণাঢ্য বিস্তার মুছে ফেলবে, তাদের অকালপক্ব করে তুলবে এবং শুধু এটুকুই নয়, অজ্ঞতার সুযোগে তাদের বিধ্বস্ত করেও দিতে পারে। এ মুহূর্তে 'তুমি এখন বড় হচ্ছো' ধরনের বইয়ের প্রয়োজন, বলা বাহুল্য, খুবই জরুরি ছিল। আনোয়ারা হকের উপস্থাপনার কৌশলটিও বড়ই মনোহারী। প্রসঙ্গত কলকাতার

www.pathagar.com

সিটি কলেজের আমার শিক্ষক ডা. রাসগৌর ঘোষাল মহাশয়ের কথা মনে পড়ে। পড়াতেন শারীরবিদ্যা। যেমন বাচনভঙ্গি, তেমনি অনবদ্য উপমা ও রূপকল্প প্রয়োগের দক্ষতা। তাঁর ভাষায় 'ঋতুস্রাব হল জরায়ুর একটি প্রক্ষোভ, যেন সে কারও অপেক্ষায় ঘর সাজিয়ে, খাবার সাজিয়ে বসেছিল, কিন্তু তার কাঙ্ক্ষিত সেই নিষিক্ত ডিম্বকটি শেষপর্যন্ত পৌছাল না, তাতে দুঃখ-হতাশায় সে সবকিছু ভেঙ্গে, ছিঁড়ে-খুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল।' আনোয়ারা হক এভাবেই তাঁর পাঠকদের শুনিয়েছেন কিছু নিষিদ্ধ কথা, অসভ্য কথা। তাই নির্দ্বিধায় বলতে পারি, 'তুমি এখন বড় হচ্ছো' বয়ঃসন্ধিকালের দেহমনের বিজ্ঞানই শুধু নয়, একটি মহৎ সাহিত্যও।

বইটির শিক্ষা কি উঠতি প্রজন্মের জন্য কেবলই সুফল বয়ে আনবে, আদৌ কোনো ক্ষতি ঘটাবে না? সঠিক উত্তর আমি জানি না, তবে এটুকু অবশ্যই বলতে পারি, এভাবে কম ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে বড় ক্ষতি এড়ান যাবে, যা গোটা চিকিৎসাবিদ্যার ভিত্তি। অধিকাংশ ওষুধই অল্পবিস্তর বিষ, অনাক্রম্যতার টিকাতেও থাকে রোগজীবাণুর নির্যাস। বিষেই বিষ ক্ষয়, তবে তার সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে। রোগবালাইকীর্ণ পৃথিবীতে এ ছাড়া নান্যপন্থা। বইটির বহুল প্রচার কাম্য।

১৯৯৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

স্মরণ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আছো অন্তরে

(জহুরুল হক, ১৯২২-১৯৯৮)

অধ্যাপক জহুরুল হক নীরবেই বিদায় নিলেন। তিনি দীর্ঘদিন থেকেই আমার মনোসঙ্গী, পরবাসেও তাতে ছেদ পড়েনি, অথচ শেষ দেখাটাই হল না। আজ নিজকে বড়ই অপরাধী মনে হয়। প্রথম পরিচয় ষাটের দশকের মাঝামাঝি এক বিজ্ঞান সমিতির সুবাদে। বুয়েটের আবাসিক এলাকার বাড়িতেই মিটিং বসত। কতো উজ্জ্বল আলোচনা, কতো পরিকল্পনা ও প্রকল্প। শেষে ভূরিভোজ। ফিরতাম অনুপ্রাণিত হয়ে, প্রতিবারই সমৃদ্ধতর হয়ে। এই চলেছে অনেক বছর। আমার লেখালেখির পেছনে তার একটা বড় অবদান ছিল। আমার দৃষ্টি-সীমানা তাঁর প্রভাবেই প্রসারিত হয়েছে অনেকখানি। বয়োজ্যেষ্ঠ ও শ্রদ্ধেয়, তবু আচরণে বন্ধুসম, যেন আমিও তার সমান বোদ্ধা এবং আমার মতামত ও মন্তব্য যথেস্ট গুরুত্ববহ। দুই-সংস্কৃতির বিভক্ত ভুবনে স্বচ্ছন্দচর এই অধ্যাপকই আমাকে বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার মধ্যকার দুর্গম সেতুবন্ধে চলাচলের কৌশলটি শেখান। সকল শিক্ষার্থীরই অন্তত একজন সদ্‌গুরুর প্রয়োজন থাকে, আর জহুরুল হক ছিলেন তেমনই একজন মানুষ।

যে-দিন আমার হাতে তাঁর অনূদিত আতোয়াঁ সা-এক্সপেরির 'ছোট্ট এক রাজকুমার' বইটি তুলে দেন সেদিন বুঝতে পারিনি কী অমূল্যধন পেয়েছি। অতঃপর 'আলোকে মোর চক্ষুদুটি, মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি/হৃদ্‌গগনে পবন হলো সৌরভেতে মন্থর। এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হলো রঞ্জিত।' এই অনুভূতি বুঝানো আমার সাধ্যাতীত। এই একটি ঘটনার জন্য আমি তাঁর কাছে চিরঋণী। তখন থেকেই বইটি আমার নিত্যসঙ্গী এবং এখন মৃত্যুচিন্তাতাড়িত হলে পড়ি।

এক্সুপেরির জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সমান আগ্রহ ছিল আমাদের দু'জনের। ইংল্যান্ডের দোকানগুলোতে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তেমন কোন বই পাই নি। শেষে এক্সুপেরির বইগুলোর রুশী অনুবাদের লেখক-পরিচিতি থেকে টুকিটাকি তথ্য নিয়ে একটা লেখা দাঁড় করাই এবং সেটি দেশের একটি সাহিত্য-সাময়িকীতে বেরোয়। লিখেছিলাম 'বলতে দ্বিধা নেই, আমার পরম সৌভাগ্য যে মধ্য-যৌবনে হলেও শেষ পর্যন্ত জহুরুল হকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি তার

www.pathagar.com

অনূদিত *ছোট্ট এক রাজকুমার* আমার হাতে তুলে দিয়ে, এখন জানি, আংশিক হলেও আমাকে 'পোষ' মানিয়েছেন, কেননা এই দূরদেশে এতদিন পরও প্রায়ই তার কথা মনে পড়ে এবং যখন ভাবি, ছোটখাটো আপাতদৃষ্টিতে দুর্বল এই মানুষটি একাত্তরের হায়না-কবলিত বাংলাদেশে এক মিথ্যা বিবৃতিতে সই না-দিয়ে নৃশংস মৃত্যুর যে-ঝুঁকি নিয়েছিলেন তাতে ওই ছোট্ট রাজকুমারের কিছুটা প্ররোচনা ছিল, তখন তার সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনা অদম্য হয়ে ওঠে।'

রুশ-দেশে এক্সুপেরি খুবই জনপ্রিয়। স্কুলের নিচু-ক্লাসের ছেলেমেয়েরাও 'মালিস্কি প্রিন্স' অর্থাৎ ছোট রাজকুমারকে ভালোই চেনে। একাধিকবার বইটির আবৃত্তি ও ব্যালে অনুষ্ঠানে গেছি এবং দেশে এলে অধ্যাপক জহুরুল হকের কাছে সেগুলোর অনুপুঙ্খ বর্ননা দিয়েছি। মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন। তাঁর জন্য ওডিও ভিডিও ক্যাসেট সংগ্রহের চেষ্টায়ও সফল হই নি। এখন দুঃখ হয়, ততটা গুরুত্ব দিয়ে খুঁজি নি। গত বছর রুম টিভিতে এক্সুপেরির জীবনী নিয়ে একটি ছবি ('হিজ লাস্ট মিশন) দেখেছিলাম। অপূর্ব। বিকল বিমান নিয়ে মরুভূমিতে নামা (ছোট্ট রাজকুমার কাহিনীর পটভূমি), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শত্রুকবলিত স্বদেশের আকাশে বিপজ্জনক উড্ডয়ন ('ফ্লাইট ওভার অ্যারাস'), এক বৃষ্টিমুখর দিনে প্যারিসে এক মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং অতঃপর প্রেম ও বিচ্ছেদ, শেষ উড্ডয়নের আগে নিয়মিত ডাক্তারি পরীক্ষার সময়কার নাটকীয় ঘটনা এবং নিখোঁজ হওয়ার বিষণ্নতম দৃশ্য, সবই ছিল। বারবার তখন জহুরুল হকের কথা মনে পড়েছে।

তিনি জনবোধ্য বিজ্ঞানে তেমন উৎসাহী ছিলেন বলে আমার মনে হয় নি। 'আগুনের কি গুণ' এ ধারার একমাত্র রচনা। আকৃষ্ট ছিলেন বিজ্ঞানের ইতিহাস, দর্শন ও সমাজতত্ত্বের দিকে। আমাদের জন্য বড় ব্যতিক্রমী। স্বাধীনতার পর তাঁর উদ্যোগেই বুয়েটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাসপাঠ চালু হয়। পাঠ্যক্রম তাঁরই তৈরি। কিন্তু বছর দুই পর ছাত্রদের 'অনাগ্রহের' অছিলায় সেই পাঠ বন্ধ হয়ে যায়। এ নিয়ে দুঃখ করতেন। রাচেল কার্সনের 'দ্য সি অ্যারাউন্ড অ্যাস' বইটি খুবই প্রিয় ছিল। সম্ভবত অনুবাদও করেন। আরোগ্যাতীত রোমান্টিক বলেই এক্সুপেরি বা কার্সনের সঙ্গে নিজেকে এতটা জড়িয়েছিলেন। এই ধরনের বিজ্ঞানীদের যুগ শেষ হয়ে আসছে। উন্নয়নের বড় বড় উল্লম্ফনের গভীর ফাঁক-ফোকরে হারিয়ে যাচ্ছে তাঁদের ব্যাপ্ত বীক্ষণ, সাংশ্লেষিক অভিগম। সংস্কৃতির এ এক বড় সংকট। জহুরুল হকের মতো চিন্তকদের তাই ভোলা যাবে না। তারা থাকবেন আমাদের বোধের ভুবনে, অন্তরের অন্তরে।

www.pathagar.com

ঊষর জমিনের হলধর

(আল-মুতী শরফুদ্দিন, ১৯৩০-১৯৯৮)

আল-মুতী শরফুদ্দীনকে এমন অভিধার আদলে অংশত হলেও শনাক্ত করা যায়। তাঁর যৌবনের স্বদেশ, সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান সৃজনশীলতার শুধু পরোক্ষ প্রতিপক্ষই নয়, ছিল প্রত্যক্ষ বিনষ্টাও। জনকল্যাণকর লেবাসে বিসরিত বিজাতীয় একটি অ্যান্টিজেন এই ভূখণ্ডশরীরে যে ঊষরতা ছড়ায় তাতে মুক্তচিন্তার বিবাশ ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রহত হয়েছে আর মুতীর অনেক বন্ধু অতঃপর দেশত্যাগ ও পশ্চিমে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি নিজে জেলে গেছেন এবং কেউ কেউ সমাজে খাপ খাইয়ে আত্মবিকৃতি ঘটাতে বাধ্য হয়েছেন। পাকিস্তান ছিল সাধারণভাবে বাঙালির ও বিশেষভাবে বুদ্ধিজীবীদের জন্য এক ভয়ঙ্কর বস্তু যার পরিণতি একাত্তরের গণহত্যা ও বুদ্ধিজীবী হত্যা।

পরবর্তীকালে আল-মুতী প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে যে বিজ্ঞান-লেখক হয়েছেন সেটা ওই পরিস্থিতির জন্যই ঘটেছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। নইলে তিনি কবি বা গল্পকারও হতে পারতেন। সামাজিক চাপ অনেক সময় সৃজনশীলতার পথ বদলে দেয়, সুযোগ থাকলে মানুষ বিপদের ঝুঁকি এড়িয়ে ভিন্ন ধারায় চলে এবং প্রতিষ্ঠাও জুটে যায়। এই কৌশলগত অভিগম মোটেই নিন্দার্হ নয়। আল-মুতী আত্মজীবনী লেখেন নি। সবই অনুমান, তবে এমনটি ঘটলেও পস্তানোর কিছু নেই। তিনি আমাদের জনপ্রিয় বিজ্ঞান-সাহিত্যের পথিকৃৎ হয়েছেন এবং নিঃসন্দেহে অবদানটি খুবই মূল্যবান, এমনকি বৈপ্লবিক রাজনৈতিক ভাবাদর্শের বিচারেও। সমাজবিপ্লবের জন্য যুক্তিবাদের প্রচার অত্যাবশ্যক এবং আল-মুতী সেই জরুরি কর্তব্যটি পালন করেছেন। তিনি নতুন প্রজন্মের হাতে বিজ্ঞানচিন্তার হাতিয়ার তুলে দিয়ে একজন বিপ্লবীর সমান কর্তব্য পালন করেছেন। তাঁকে নির্দ্বিধায় আমরা ঊষর জমিনের হলধর বলতে পারি। বহুমুখী প্রতিভাধর আল-মুতী শরফুদ্দীনের বিচরণক্ষেত্র এতটাই বিস্তৃত ছিল যে, প্রায়ই ভিন্নতর পেশার লোকসকলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটত এবং আশ্চর্য অমায়িকতার জাদুমন্ত্রে নিমেষেই তাদের বশ করতে পারতেন। এভাবে আমিও বশীভূত হয়ে পড়ি, যদিও কবে কখন সেই দিনক্ষণ আর মনে নেই। এই তো কয়েক মাস আগে তার সদ্যপ্রকাশিত দুটি বই দিতে নিজে

www.pathagar.com

আমাদের বাড়ি আসেন, আমরা কেউ ছিলাম না বলে ঝট করে চলে যান নি, কাজের ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে তবেই গেছেন এবং সে আজও জিজ্ঞেস করে ওই অদ্ভুত লেখকটি আবার কবে আসবেন।

আমি ১৯৭৪ সালে মস্কোর প্রগতি প্রকাশন নামের অনুবাদ সংস্থায় যখন যোগ দেই আল-মুতী শরফুদ্দীন ও হাসান হাফিজুর রহমান তখন মস্কোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা। তাঁরা দুজই থাকতেন কমসোমল্স্কায়া মেট্রো-স্টেশনের লাগোয়া এক বহুতল বাড়ির পাশাপাশি ফ্লাটে। আমি, খালেদ চৌধুরী ও হায়াৎ মামুদ একই সংস্থায় সহকর্মী। দেশের জন্য প্রবল নস্টালজিয়াগ্রস্ত এই তিন বাঙালির কর্মে মন ছিল না, প্রায়ই যেতাম উচাটন কমাতে দুতাবাসে বা ওদের বাড়ি। সেইসব দিনের কথা ভোলার নয়। প্রবল তুষারপাতও আমাদের ঠেকাতে পারত না। মুতী-সাহেব বা হাসানের বাড়ি গেলে তাদের দু'পরিবারের সবাই একত্র হতেন, চলত তুমুল আড্ডা, নানাবিধ মুখরোচক রান্নাবান্না ও শেষে ভূরিভোজ। মুতী হাঁটতে ভালোবাসতেন, প্রায়ই আমাদের সঙ্গে আসতেন মেট্রোস্টেশন পর্যন্ত। একদিনের একটি ঘটনা আজও মনে পড়ে। আমি আর মুতী হাঁটছি। নানা প্রসঙ্গ, আলোচনায় শেষে এল সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল একটি বেফাঁস মন্তব্য। বলছিলাম সমাজতন্ত্রের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তিনি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বড়ই বিষণ্ন স্বরে বললেন, 'সত্যি বলছেন?' আমি অপ্রস্তুত। ঘটনাটি আমাকে অনেকদিন ভাবিয়েছে। এখনও ভাবায়। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা আমরা জানি। পার্টির সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার কথাও অজানা নয়। কিন্তু নিশ্চিতই আদর্শটি মনে মনে লালন করে চলেছিলেন, নইলে আমার মন্তব্যে এতটা আহত হতেন না। যে একবার সকল মানুষের সমতার আদর্শ ও সমতাভিত্তিক একটি সমাজের স্বপ্ন দেখেছে সে কখনই সেটা বিস্মৃত হয় না। আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয়। বামপন্থী রাজনীতিকরা রেনিগেটদের কখনই ক্ষমা করেন না। কিন্তু আল-মুতী ছিলেন বিরল ব্যতিক্রম। প্রাক্তন কমরেডদের মুখে কখনই তাঁর কোন নিন্দা শুনি নি।

বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জের যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তারই বিস্তার ঘটেছিল পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সহায়তার চুক্তিতে। এক্ষেত্রে শিক্ষার একটা বড় ভূমিকা ছিল এবং সেখানে আবদুল্লাহ আল-মুতীর নির্বাচন ছিল সব বিবেচনায় আদর্শ। বলা যেতে পারে, এই প্রথম তিনি আপন আদর্শ ও প্রতিভার সার্থক প্রয়োগের সর্বোত্তম সুযোগটি পান। এটাই ছিল সম্ভবত তাঁর জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়, নইলে পাকিস্তান আমলে কিংবা স্বাধীন দেশে সামরিক স্বৈরশাসনে সর্বদাই তাঁকে কাজ করতে হয়েছে বৈরী পরিবেশে।

www.pathagar.com

সেরা ছাত্র-ছাত্রীরাই তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়তে যেত। অল্পবয়সী এই তরুণ-তরুণীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে নানা জটিলতার মুখোমুখি হত। দেশগড়ার দূরন্ত স্বপ্ন ও আশু বাস্তবতার মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধত, আদর্শগত দলাদলিও ছিল আর এসবই সামাল দিতে হত শিক্ষা-অ্যাটাসে হিসেবে আল-মুতী সাহেবকে।

তিনি ছিলেন একাধারে তাদের শিক্ষক, অভিভাবক ও বন্ধু। প্রথম শিক্ষা-অ্যাটাসে হিসেবে এই জটিল দায়িত্ব পালনের সুবাদে সেই সময় দূতাবাসের যে কর্মকৌশল প্রস্তুত হয়েছিল সেটা ছিল তাঁরই কীর্তি যা তিনি চলে আসার পরও কার্যকর থেকেছে। দেশে ফিরে পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহে কাজ করেছেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বহু দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সর্বত্রই মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। জটিল টানাপোড়েনের মধ্যে নীতিতে অবিচল থেকে কর্মপরিচালনা ও সাফল্যলাভ কতটা কঠিন, তাত্ত্বিক সমালোচকরা সেটা বুঝবেন না। তাই আল-মুতী একেবারে অজাতশত্রু ছিলেন বলা যাবে না। ছিদ্রান্বেষণ ও পরনিন্দা যে বাঙালি চরিত্রে কতটা দৃঢ়বদ্ধ ভুক্তভোগী মাত্রেই তা জানেন। রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষও সেই লাঞ্ছনা এড়াতে পারেন নি।

আটষট্টি বছরে তার মৃত্যুটি অকালমৃত্যুই মনে হয়। কর্মশক্তি ও সৃজনশীলতার তুঙ্গাবস্থায় এমন মৃত্যু সমাজের জন্য একটা বড় ক্ষতি, বিশেষত যেখানে সত্যিকার দক্ষ মানুষের প্রকট অভাব আর হাতুড়েদের প্রবল আধিপত্য। গত ২১ ফেব্রুয়ারির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালার একটি আলোচনা সভায় তিনি ছিলেন সভাপতি, আমি আলোচক। শ্রোতার উপস্থিতি যথারীতি হাস্যকর। আমি উৎসাহ হারিয়ে ফেলি। কিন্তু মুতী-সাহেব অদম্য, যা বলার সবই বললেন এবং সেই ঈর্ষণীয় বাচনে। এই যে তার শেষ অনুষ্ঠান সেটা তখন দুঃস্বপ্নাতীত ছিল।

প্রকৃতিতে শূন্যাবস্থার অবকাশ নেই। মানুষের সমাজেও নেই। কিন্তু দুয়ের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য আছে। সমাজে এমন কিছু মানুষ থাকেন যাদের তৈরি বাস্তবাবস্থায় কিছু নতুনত্বের জন্য তারা কখনই আর প্রতিস্থাপিত হন না। আবদুল্লাহ আল-মুতী তেমনই একজন মানুষ, যাকে তাঁর অপূরণীয় অবদানের জন্য আমাদের ইতিহাস সযত্নে সংরক্ষণ করবে।

www.pathagar.com

চোখ জুড়ে আছে

(নূরুল আমীন, ১৯৪৪-১৯৮৭)

আমার পিতৃকুলের দীর্ঘায়ুর বিবরণ ও নিজের অনুরূপ বাসনার কথা শুনে অগ্রজপ্রতিম জনৈক প্রাজ্ঞ বন্ধু সর্বজনের আকাঙ্ক্ষিত এই ব্যাপারটিকে সখেদে এক করুণ ট্রাজেডি বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাঁর মতে, দীর্ঘায়ু ব্যক্তির জীবন কনিষ্ঠ স্বজন ও বন্ধুদের অকালমৃত্যুর আঘাতে আঘাতে এক সময় ভীষ্মের শরশয্যায় পরিণত হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বক্তব্যটির নিষ্ঠুর সত্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। ইতিমধ্যেই একাধিক বন্ধুর অকালপ্রয়াণে আমি শরাহত এবং অতিসম্প্রতি আরেকটি বিঁধেছে শক্তিশেলের মতো – অনুজপ্রতিম বন্ধু, এককালের সহকর্মী নূরুল আমিনের অভাবিত আকস্মিক মৃত্যু।

নূরুল আমিনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ সম্ভবত নটরডেম কলেজে। ১৯৬২ সালে সামরিক শাসনবিরোধী গণবিক্ষোভের সময় কিছুকাল শ্রীঘরবাসের পর আমি এই কলেজে আশ্রয় পাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে মোনায়েম খানের উপস্থিতি ভণ্ডুল করার আন্দোলনের অন্যতম শরিক, জগন্নাথ হলের তৎকালীন ভি.পি. পরিতোষ দাস কারাবাসের কলঙ্ক সত্ত্বেও এখানেই কাজ পেয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যারর বিতাড়িত অধ্যাপক সেরাগিও এখানে এসে জুটেছিলেন। কিন্তু নূরুল আমিনের এসব কোন ঝামেলা ছিল না। তবু সে এখানে এসেছিল কেন? রসায়নে প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত কোন মুসলিম তরুণের পক্ষে সেকালে একটি ভাল চাকরি সংগ্রহ কোন সমস্যা ছিল না। পরিতোষের সহপাঠী ও বন্ধু হিসেবে, কিছুটা তার প্রভাবেই হয়ত এই কলেজের নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে সে আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। বি. এম. কলেজের আমার প্রাক্তন ছাত্র পরিতোষের সূত্রেই নূরুল আমিনে সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

আমিনরা পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহারের সাবেক বাসিন্দা। ওখানেই প্রাথমিক পড়াশোনা। পিতা ছিলেন স্থানীয় কংগ্রেসকর্মী। দেশীয় রাজ্য হিসেবে কুচবিহারের বিশেষ অবস্থান এবং কোচদের জাতিসত্তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দরুন মুসলিম-বিদ্বেষমুক্ত এক দুর্লভ পরিবেশে আমিনরা দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন। তাই নূরুল আমিনের পক্ষে অসাম্প্রদায়িক, উদার ও গণতন্ত্রমনা হওয়া কোন ব্যতিক্রম নয়।

www.pathagar.com

কিন্তু তার সঙ্গে বন্ধুত্বের এটিই মুখ্য হেতু নয়। তার প্রাণখোলা হাসি, উচ্ছল স্বভাবের নিচে সদাবহতা ছিল এক দুঃখস্রোত, এক অঝোর বিষণ্নতা – জন্মভূমি থেকে বিচ্ছেদের বেদনা। তার শৈশবস্মৃতিতে দৃঢ়বদ্ধ অবিলাসী, সাদাসিধে জীবনের মূল্যবোধের সঙ্গে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানী মধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংঘাত বাধত, তাকে নিয়ত পরাজিত ও জর্জরিত হতে দেখতাম। সাজান ড্রয়িংরুম, ট্রলি ঠেলে আনা চা-নাস্তার আয়োজন তার কাছে নিদারুণ পীড়াদায়ক ঠেকত। কৈশোরে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে ভেতরের শোবার ঘরের বিছানায় সটান শুয়ে পড়ে চা-মুড়ি খাওয়ার অপার স্বস্তির গল্প বহুবার তার কাছে শুনেছি।

আমি পুরনো যুগের মানুষ বলে এসব কথা আমার ভালো লাগত। তার হোণ্ডার পেচনে চেপে আমরা চলে যেতাম দূরদুরান্তর – শহরতলির কোন মাঠে, বিল বা নদীর পারে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এলেও গল্প শেষ হত না। বিস্তর পড়াশোনা ছিল তার, লেখার হাত ছিল। কণ্ঠস্বরও বৈশিষ্ট্যধর। তবু কোনোটাই তেমন ব্যবহার করে নি।

নটরডেম কলেজে আমিনের চাকরি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। শিক্ষকতায় অশেষ নিষ্ঠা ও উৎসাহ এবং ঈর্ষণীয় সাফল্য সত্ত্বেও খুব সহজবোধ্য কারণেই শুভানুধ্যায়ীরা বেসরকারি কলেজের ভবিষ্যৎহীন একটি পেশায় তাকে দেখতে চান নি। তারা আমিনের জন্য একটি ভাল সরকারি চাকরি জোটান – প্যাটেন্ট বিভাগের রসায়ন-বিদ। কলেজের দোতলায় রসায়ন ল্যাবরেটরি পেরিয়ে শ্রেণীকক্ষে যাওয়ার সময় তার বসার জায়গাটা শূন্য দেখে দুঃখ হত। অযৌক্তিক নির্বোধ ভাবাবেগ। চমৎকার রেজাল্ট নিয়ে এখানে পচে-মরা অবশ্যই নিরর্থক। ক্রমে সবই সয়ে গিয়েছিল। কলেজে আমিনের চঞ্চল ছুটোছুটি, শ্রেণীকক্ষে উচ্ছল কণ্ঠ, কিছুই আর মনে পড়ত না। এসবই ষাটের দশকের ঘটনা।

তখন গ্রীষ্মের ছুটি। আমি ছুটির দিনেও কলেজে আসি। সামান্য একটি গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। একদিন দুপুরে বিশ্রামের জন্য স্টাফরুমে ঢুকে দেখি আমিন সোফায় ঘুমুচ্ছে। অবাক কাণ্ড। তবে কি পুনর্মুষিক ভব? পেশাগত সততা ও নিষ্ঠার জন্য মোনায়েম খানের আমলে লাঞ্ছিত এককালীন ডিপিআই ফজলুর রহমান শিক্ষকতার পেশাকে যে বিশেষণ দিতে ভালোবাসতেন, তারই পুনরাবৃত্তি করে বললাম–'ইটার্নাল পোভার্টিতে ফিরলে?'

পরে গোটা ব্যাপারটা জানা গেল। নতুন চাকরি অসহ্য হয়ে উঠেছে। নির্মাণকার্যে ব্যবহার্য সিমেন্ট, কংক্রিট, লোহালক্কড় ইত্যাদির নির্দিষ্ট মানের ব্যাপারে তাঁর অনভিজ্ঞতা প্রসূত মাত্রাতিরিক্ত কড়াকড়ির জন্য অফিসের বড়ই আপত্তি। বড় বড় আমলার ফোন, ঠিকাদারদের নানা অফার, ঢাকা ক্লাবে ঢালাও দাওয়াত ইত্যাদিতে অতিষ্ঠ আমিন এখানে 'আণ্ডারগ্রাউণ্ডে' আছে। অধ্যক্ষের সৌজন্যে

www.pathagar.com

স্টাফরুমের চাবিটি করতলগত, লাগোয়া হোটেল আল হেলালে মধ্যাহ্নভোজ, বিকেলে কলেজের মাঠে আরামবাগের ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলা, কোনো বন্ধুর বাড়িতে রাত্রিবাস ও পরদিন প্রত্যূষে নির্জন কলেজে ফেরা– চমৎকার ব্যবস্থা।

আমিনের 'আত্মগোপন' ব্যর্থ হয় নি। শভানুধ্যায়ীরা হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং আমিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার একটি চাকরি জুটিয়ে নেয়। কিন্তু এখানেও সেই অস্বাচ্ছন্দ্য। সে তার দূর স্বদেশভূমির পূর্বোক্ত জীবনযাত্রার আদর্শই শুধু নয়, শিক্ষাদর্শের একটি প্রতিভাসও বয়ে এনেছিল। হতে পারে এ সবই অলীক, হারান কৈশোরের বিবর্ধিত কল্পনামাত্র, তবু এগুলোই ছিল তার কাছে বিচারের মাপকাঠি এবং সম্ভবত অনভিযোজনার হেতুও।

রসায়ন বিভাগের সার্বিক পরিস্থিতি, শিক্ষকদের দলাদলি, সংকীর্ণ রাজনৈতিক কোন্দল ও সর্বোপরি গবেষণায় তাদের অনীহা ইত্যাদি তার নিদারুণ বিতৃষ্ণার কারণ হয়ে উঠেছিল। তাই সময় পেলেই সে নটরডেম কলেজে ছুটে আসত, আমাদের সঙ্গে গল্প করে সারাদিন কাঠিয়ে দিত, যেন এখানেই ছিল তার হারান জগতের প্রত্নকাঠাম।

একদা সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের গবেষণা কর্মকাণ্ডের একটি বিশেষ কালপর্বের (১৯৫১-১৯৬৫) খতিয়ান তৈরির কাজ শুরু করেছিল, ওই সময়কার গবেষণা আবহের মূল্যায়ন করতে চেয়েছিল। বলা বাহুল্য, ফলাফল ছিল নেতিবাচক, হতাশাব্যঞ্জক। খুব সীমিত সংখ্যক শিক্ষকের উল্লেখযোগ্য কাজ ছাড়া বিপুল সংখ্যাগুরু অংশটিই ছিল নিস্পৃহ, শিক্ষকতার দায়সারা নিত্যকর্মে রত।

শেষের দিকে আমিন এই হতাশা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছিল, জনৈক শিক্ষকের অধীনে পি-এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য গবেষণা শুরু করেছিল। মাঝখানে কিছুদিন পশ্চিম জার্মানিতেও ছিল। আমি তখন মস্কোয়। চিঠিপত্রে আমাদের যোগাযোগ ছিল এবং সে সময়ই জানতে পারি যে আমিন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছে। আমি অবাক হই নি, বরং এমনটিই আশা করেছিলাম। কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ ও কর্মকাণ্ড তার মতো একজন মানুষের যাবতীয় মানসিক দ্বন্দ্ব উত্তরণের পক্ষে সহায়ক হতে পারত।

একাশি সালের শুরুতে ছুটিতে দেশে ফিরলে আমিন এক রকম জোর করেই আমাকে তার কলাবাগানের নতুন বাসায় নিয়ে গিয়েছিল। জানতাম সে বিয়ে করেছে। ঘটকালিতে অনিমা বৌদির (অনিমা সিংহ) ভূমিকাও অজানা ছিল না। পৌঁছে দেখলাম গৃহিণীহীন গৃহ। তিনি পিত্রালয়ে। বিবাহোত্তর জীবনের সামান্য বাড়তি টুকিটাকি ছাড়া আমিনের সংসার আগের মতোই নিরাভরণ। চোখে পড়ল খাটের পাশের ড্রেসিং টেবিলের হাতলে রাখা অনেকগুলো চুড়ি, যেন গৃহিণী তার দুটি কল্যাণহস্ত স্বামীর কাছে বাঁধা রেখে পিত্রালয়ে যাওয়ায় অনুমতি পেয়েছেন।

www.pathagar.com

চুরাশি সালে আবার দেখা। আমিন তখন শহীদুল্লাহ্ হলের হাউস-টিউটর। গ্রীষ্মকাল। হলের চত্বরে অঢেল খোঁজাখুঁজির পর আস্তানাটি আবিষ্কৃত হলে জানা গেল সে ডিপার্টমেন্টে, স্ত্রীও কর্মস্থলে। অগত্যা কার্জন হলের দিকে ফিরলাম। আমি ঢাকা হলের ছাত্র। একদা আমরা এই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলাম। এখন রবাহুত। বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই ইতিমধ্যে প্রয়াত, কেউ কেউ দেশান্তরী। এমন পরিবেশে মন স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

আমিনের কাছে যখন পৌঁছলাম তখন উত্তাপ আর ক্লান্তিতে অবসন্ন। সে টেবিলে বসে কী লিখছিল। আমাকে দেখে অবাক হলেও উল্লসিত হল না। এমনটি অভাবিত। তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। এরই মধ্যে জীবন কি তার কাছে দুর্ভার হয়ে উঠেছিল? ভেবেছি, এ সাময়িক। এমনটি হামেশাই ঘটে। কিন্তু এই যে শেষ দেখা স্বপ্নেও ভাবিনি। কনিষ্ঠের অকালমৃত্যুতে বয়স্ক বন্ধুদের জন্য বড় ধরনের আঘাত আসে, বাঁচার আনন্দ উনো হয়, বার্ধক্যের গতিবেগ বাড়ে। নূরুল আমিনহীন ঢাকা শহর আমার কাছে দীর্ঘদিন বিষণ্নতম নিসর্গ হয়ে থাকবে।

১৯৮৮

www.pathagar.com

কী ফুল ঝরিল

(আহমদ হোসেন চৌধুরী, ১৯৪৬-১৯৭৫)

ফিলোডেনড্রন তার প্রিয় ছিল। প্রিয় ছিল চাঁপা, নাগেশ্বরও। কিন্তু ভাড়াটে বাড়ির সীমিত অঙ্গনে এদের ঠাঁই হবার নয়, তাই ঘরে নিলেন প্রথমাকেই। আমাকে জিজ্ঞেস করতেন — কী ওর ভালো লাগে : ছায়া না রোদ, শিশির না শুষ্কতা? বহুবার বলেছেন তার ওখানে যেতে। ফিলোডেনড্রনের লতা নাকি ঘরে আশ্চর্য শোভা ছড়িয়েছিল। কেন যেন যাওয়া হয় নি। যাওয়া আর হবে না। মনিপুরী পাড়ার সাজান সংসার এখন ছত্রখান। সুহৃদ সহযাত্রী আহমদ হোসেন আর বেঁচে নেই।

এখানে এই বিদেশে বসে বারবার তার কথা মনে পড়ে। সুশ্রী তরুণ। বয়স ত্রিশও হয় নি। চমৎকার বেডমিন্টন খেলতেন। পড়তে পড়াতে ভালোবাসতেন। রেস্তোরাঁয় বসে আমরা গল্প করতাম। আমি, আহাজার, অমূল্য। কিন্তু অন্যদের বিল পরিশোধ করার উপায় ছিল না। ফুটপাতে বই খুঁজতেন। বিজ্ঞানের বই বিশেষ পছন্দ ছিল। মনে পড়ে, হলিফ্যামিলি হাসপাতালে যখন শয্যাশায়ী, দেখলাম বই পড়ছেন। লাইফ সিরিজের এভ্যলিউশন। আমার বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন 'অ্যাড্‌জ্যাক্ট ছাড়া আর কিছুই এ সময় পড়তে ভাল লাগে না।' মনে পড়ল শুধু রসায়নই নয়, তিনি গণিতও পড়ান। তারই কাছে শুনেছি, ছাত্রজীবনে অনেকবার পড়াশোনায় ছেদ পড়েছে। চাকরি করেছেন, কিন্তু শিক্ষকতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। জীবনের শুরু থেকেই শিক্ষকতায় আত্মোৎসর্গিত ছিলেন। কোনদিন তার মুখে এ নিয়ে অনুযোগ শুনি নি। একালে এমনটি আশ্চর্য। আশ্চর্য বৈকি।

আমরা আমাদের কর্মস্থল ঢাকার সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজে বাগান করেছিলাম। চাঁপা, নাগেশ্বর, কৃষ্ণচূড়া আর কদম। চাঁপাগাছে যেদিন ফুল ফুটল, তিনিই প্রথম দেখলেন এবং তখনই স্মৃতির উচ্ছ্বয়ে প্রত্যাগত তার হারান কৈশোর : চাটগাঁর এক দূর গাঁয়ে সবে ভোর, শিশুদের কলকণ্ঠ আর চাঁপাবনে বসন্তের মাতাল হাওয়া। বললেন, 'শহরতলির শালবনের ধারে আমার একটু জায়গা আছে, চলুন না একদিন সেখানে, ক'টি চাঁপাগাছ লাগাই।'

শুনেছি কলেজের চাঁপাগাছ আর বেঁচে নেই। বাগানও বন্যায় তছনছ। মৃত্যুর কী অশুভ সন্নিপাত! তবু জানি শুকান বাগানে আবার ফুল ফুটবে, বাতাস ভরে উঠবে

www.pathagar.com

মধুগন্ধে, কিন্তু আহমদ হোসেনকে কি ততদিন আমরা মনে রাখব? আমরা এক ঊষরকালের বাসিন্দা। স্মৃতিচিহ্নে বুদ্বুদের আয়ু। সৎ শান্ত সহজ জীবনে অপচিতির প্রকোপ। তবু এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা এই যুগব্যাধির প্রবল পরাক্রমের মুখেও অনাক্রম্য। তারা সংখ্যালঘু। তারা চমকপ্রদ নন এবং আত্মঘোষণায় অনীহ, বিনীত কতব্যনিষ্ঠ ও অন্তরালবর্তী আর তাঁদের সংখ্যানুপাতেই নির্ণীত সমাজের স্বাস্থ্য ও সম্ভাবনা। আহমদ হোসেন তাঁদেরই অন্তর্গত। তাঁকে ভুলে থাকা যায় না।

www.pathagar.com

অঝোর অশ্রুজলে

নূরুল হুদা (১৯৪৯-২০০০)

একজন শিক্ষকের পক্ষে প্রয়াত ছাত্রের স্মৃতিচারণ একজন পিতার সদ্যমৃত সন্তান সম্পর্কে কিছু বলার মতোই মর্মান্তিক, অথচ তা অবাস্তবও নয়। এমন দুর্দৈবও ঘটে। প্রকৃতির নিয়ম অমোঘ ও নিষ্ঠুর এবং বিজ্ঞানের অজস্র উজ্জ্বল সাফল্য আজও এক্ষেত্রে মানুষের নিশ্চিত ভরসাস্থল হতে পারে নি। বাবা যখন মারা গেলেন আমার বয়স তখন তেরো বা চৌদ্দ। অনেকদিন আমি একটি উদ্ভট কল্পনায় আচ্ছন্ন ছিলাম, মনে হত তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কোন নির্জন পথে কিংবা অন্য কোথাও। এখনও ভাবি, কৈশোরের এই ইলিউশন থেকে কি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছি? নূরুল আমীন কিংবা নূরুল হুদার সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে না ভাবতে পারি না।

অথচ হুদার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। এই ধরনের বিস্মৃতি শিক্ষকজীবনের এক করুণ বাস্তবতা। ছাত্ররা কোন কোন শিক্ষকের সঙ্গে এক ধরনের প্রেমে পড়ে, তাঁকে আরাধ্য বানায় অথচ কোনদিন মুখ ফুটে সেকথাটা বলে না, সেই শিক্ষকেরা যথাসময়ে ধরাধাম ত্যাগ করেও ছাত্রের স্মৃতিতে শ্রেণীকক্ষে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে থাকেন। আমার ক্ষেত্রে এটি ঘটেছে, আমার ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকবে। কয়েক বছর আগে শিক্ষকদের এক সভায় আমার এক ছাত্রের সঙ্গে দেখা। শ্মশ্রুমণ্ডিত এই প্রৌঢ়কে চেনা আমার সাধ্যাতীত। সে আবার অনুষ্ঠানেরও সভাপতি। কথা প্রসঙ্গে বলল আমি কীভাবে পাঠ দিতাম, বোর্ডে লিখতাম, ল্যাবরেটরিতে হাত ধরে তাদের ডিসেকসন শিখাতাম এবং সে নাকি দীর্ঘকাল তেমনটি অনুকরণের চেষ্টা করছে, কিন্তু সফল হয় নি। এটি আসলে প্রাচ্যদেশীয় মানসিকতা, কেননা আমারও অভিন্ন অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমি আমার শিক্ষকদের, বিশেষত এইচ. মুখার্জি (উদ্ভিদবিদ্যা) বা রাসগৌর ঘোষালকে (মনুষ্য-শারীরতত্ত্ব) অনুকরণ করতে চেয়েছি, পারি নি। মনে হয়েছে তাঁদের পদপ্রান্তে বসার যোগ্যতাও আমার নেই।

শিক্ষকের একটি সামান্য কথা, একটি তুচ্ছ আচরণ নাকি শিক্ষার্থীদের কখনও এতটাই প্রভাবিত করে যে তিনি নিজে তা কল্পনাও করতে পারেন না। সেদিন রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে এক মহিলা, আমার প্রাক্তন ছাত্রী, পরিচয় দিয়ে জানালেন আমি নাকি তাঁর খাতায় অটোগ্রাফ দিয়ে লিখেছিলাম-'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালবাসিলাম, সে কখনও করে না বঞ্চনা' এবং তিনি সংসারের কণ্টকিত পথে

www.pathagar.com

রক্তাক্ত পায়ে তা মান্য করার চেষ্টা করে চলেছেন। বহুকাল শিক্ষকতা ছেড়েছি, বিদেশে কেটেছে অনেক বছর, কিন্তু অনুক্ষণ সেই মুহূর্তটির কথা ভেবে রোমাঞ্চিত হয়েছি — যখন দেশে ফিরে আবার আমার কলেজের শ্রেণীকক্ষে দাঁড়িয়ে বলব '১৯৭৪ সালের ১০ আগস্ট যে বক্তৃতাটি অসম্পূর্ণ রেখ চলে গিয়েছিলাম আজ সেখান থেকেই আবার শুরু করছি।'

১৯৯৫ সালের দিকে আমি যখন মস্কো থেকে দেশে ফিরেছি তখনই হুদার একটি চিঠি পাই। কাগজে আমার লেখালেখি থেকেই সম্ভবত আমার দেশে ফেরার কথা ভেবে থাকবে, কিংবা হতে পারে তার সহকর্মী পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক শাহীন আখতারের (রাশিয়ায় পড়াশোনার সুবাদে আমাদের ঘনিষ্ঠ) কাছে শুনেছে। সে জানতে চেয়েছিল আফ্রিকান টিউলিপ (রুদ্রপলাশ) ফুলে যে পিঁপড়েরা আটকে থেকে মারা যায় আমি সে সম্পর্কে কিছু জানি কি না। অনেক কষ্টে তার চেহারা কল্পনা করার চেষ্ট করি, সফল হই না। অনেক ছাত্রছাত্রী, যাদের সঙ্গে অধিক অন্তরঙ্গতা ছিল তারা অনেকেই ইতিমধ্যে আমার স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে গেছে, তাদের নামও ভুলে গেছি, তবু কারও কারও অস্তিত্বটা প্রবল হয়েই আছে। হুদার চিঠি পড়ে আমি অভিভূত ও আনন্দিত হই এই ভেবে যে এমন বিমুখ পরিবেশে আমার একটি ছাত্র আজও এই ধরনের অনুসন্ধিৎসা লালন করছে। এভাবেই যোগাযোগ নবপর্যায়ে। দ্বিতীয় চিঠিটি লিখেছিল সিলেট থেকে, কিছু বুনো গাছপালা শনাক্তি বিষয়ে। ততদিনে অবশ্য জেনে গেছি যে কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা করছে। তারপর এশিয়াটিক সোসাইটির বাংলাপিডিয়া প্রকল্পে কাজ করার সময় হুদার লেখা কিছু নিবন্ধ দেখার সুযোগ পাই। ছাত্রের লেখা অনুবাদ করার সময় এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করি যেন নিজ লগ্নির লভ্যাংশ গুনছি।

হুদার সঙ্গে শেষ দেখা ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে যখন আবুল মোমেনের আমন্ত্রণে চট্টগ্রামের ফুলকি বিদ্যায়তনে শিক্ষকদের প্রকৃতিপাঠ বিষয়ক একটি কর্মশালায় যোগ দিতে গিয়েছিলাম। শাহীন আখতার, বেনজির আহমদ ও নূরুল হুদা একদিন ধরে নিয়ে গেল তাদের ফ্লাটে। দীর্ঘ আলাপ, নানা পরিকল্পনা ও ভবিষ্যতের নিবিড় যোগাযোগের প্রতিশ্রুতিসহ ঢাকায় ফিরি। কিছুদিন পরই সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা – একটি ঘাতক বাস তাকে পিষ্ঠ করেছে। ফোনে আমাকে খবরটি জানান হয়েছিল। কিন্তু অন্ত্যেষ্টিতে যাওয়ার মতো শারীরিক ও মানসিক বল কোনটাই তখন আর অবশিষ্ট ছিল না।

শান্ত বিনম্র বিনয়ী নূরুল হুদা, অনুমান করি, শিক্ষক হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের অফুরান শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়ে থাকবে। তাঁর গবেষণাস্পৃহা নিশ্চিত অনেককে উদ্বুদ্ধ করেছে। একজন শিক্ষক এভাবেই বেঁচে থাকেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে যে ক্ষতি হল সেটা অপূরণীয়। এদেশে যা দুর্লভ আমরা তেমন একজন উদ্বোধক শিক্ষক ও গবেষককে হারালাম।

www.pathagar.com

স্যারকে হার্দ ভালোবাসায়

(১৯২৪-২০০২)

আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, বাংলাদেশ উদ্ভিদ-জরিপ উদ্যোগ ও জাতীয় হার্বেরিয়ামের স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক সালার খান (১৯২৪-২০০২) গত ৩০ সেপ্টেম্বর লোকান্তরিত হয়েছেন। আমি সর্বদাই ভেবেছি, তিনি শতায়ু হবেন। প্রকৃতিবিদ ও নিসর্গীরা এমনিতেই দীর্ঘজীবী হন আর সালার খান স্যারকে দেখলে মনে হতো বয়স তার কাছে হার মেনেছে। মারা গেলেন কর্কটরোগে খুব কম সময়ে। তাই এই মৃত্যুকে অকালমৃত্যুই বলব, কেননা কর্কট তো রোগের বদলে এক আকস্মিক দুর্ঘটনারই শামিল। মর্মাহত হয়ে লক্ষ করেছি, আমাদের সংবাদপত্রগুলোতে তাঁর মৃত্যুসংবাদ যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি, ছাপা হয়েছে অনেকটা দায়সারাভাবে। স্পষ্টতই এটা বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের বিশেষ এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। বিজ্ঞানকে আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি, কিন্তু কোন চমকপ্রদ আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের শরিক না হলে বিজ্ঞানীরা আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা পান না। এটা একটা বৈশ্বিক বাস্তবতাও। কিন্তু সলার খান তো নির্বিশেষ নীরব গবেষকদের দলভুক্ত ছিলেন না, তাঁর কর্মকাণ্ডের একটা সামাজিক দিকও ছিল। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় হার্বেরিয়ামের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বোটানিক গার্ডেন সম্পর্কে আমাদের সবারই আগ্রহ ও উৎসাহ আছে, কেননা তাতে বিনোদনের একটা মাত্রা রয়েছে, আছে অবশ্য জ্ঞানের বিষয়ও, তবে মুখ্য প্রথমটিই। বিজ্ঞানকে আমরা আজও যতটা গুরুত্ব দেই তা প্রধানত প্রায়োগিক প্রয়োজনের তাগিদে, জ্ঞানের বিষয় হিসেবে নয়। বিজ্ঞান এখানো আমাদের সামাজিক বিপাককর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে ওঠে নি আর সেজন্য সমাজদেহে আত্তীভূতও হতে পারে নি। হার্বেরিয়াম হল উদ্ভিদ প্রজাতির শুষ্ক নমুনার সংগ্রহ, তাতে কারই-বা আগ্রহ থাকবে। পাকিস্তান সরকার সেটা আঁচ করেই সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের জন্য ঢাকায় বোটানিক গার্ডেন বানিয়েছিল, হার্বেরিয়াম প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে। অথচ কে না জানে হার্বেরিয়ামহীন বোটানিক গার্ডেন নিউক্লিয়াসহীন কোষের মতোই শূন্যগর্ভ। তবু হার্বেরিয়াম গড়ে তুলতে সালার খানকে যে এতটা বেগ পেতে হয়েছে, এতটা সময় দিতে হয়েছে, তাকে আমাদের বিজ্ঞানচেতনার দৈন্য ছাড়া আর কীই-বা বলা যাবে।

www.pathagar.com

শুনেছি সচিবালয়ের আমলাদের হার্বেরিয়াম বস্তুটি কী তা বোঝানোর জন্য তিনি সর্বদাই ব্যাগে কিছু 'হার্বেরিয়াম শিট' রাখতেন। আমাদের মতো দেশে বিজ্ঞানীদের কতোই না দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

সালার খান মাদ্রাজের মানুষ, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসি (১৯৪৭), এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি (১৯৬২)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যোগ দেন ১৯৫০ সালে। ডক্টরেট করতে তাঁর এত বছর লাগল এজন্য যে, তৎকালে পূর্ব-পাকিস্তানিদের সরকারি বৃত্তি নিয়ে বিদেশে শিক্ষালাভ সহজ ছিল না, তাই অনেকেই এজন্য অ্যাসিস্টেনশিপ নিতে বাধ্য হতেন। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হই ১৯৫৬ সালে, সালার খান স্যার তখন প্রভাষক। অত্যন্ত অমায়িক বিধায় ঘনিষ্ঠতা হতে সময় লাগেনি, পড়াতেন টেক্সোনমি। গোড়ার দিকে নাকি স্থানীয় গাছপালা তেমন চিনতেন না, বলতেন অনেক কিছুই শিখেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক গার্ডেনের মালীদের কাছ থেকে। ঐকান্তিকতা, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সুবাদে ডক্টরেট করার আগেই বাংলার সপুষ্পক উদ্ভিদ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। আমাদের সহপাঠী নেহাল হোসেন আওরঙ্গজেব তার প্রথম গবেষক-ছাত্র (থিসিস গ্রুপে), কাজ করেছিল ঢাকার অ্যাকান্থেসি (বাসকগোত্র) নিয়ে। গবেষণাপত্রটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্ট্যাডিজে প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে আর এটিই ছিল সালার খান ও নেহাল হোসেনের প্রথম বিজ্ঞান নিবন্ধ। নেহাল হোসেনসহ তাঁর অনেক ছাত্রই পরে যশস্বী শিক্ষক, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-কর্মকর্তা হয়েছেন।

১৯৫৮ সালে আমি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে যোগ দিলে সেখানে প্রথম উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতক পর্যায়ে পাসকোর্স খোলা হয়। বিএম কলেজ ও পরে ঢাকার নটরডেম কলেজে হার্বেরিয়াম তৈরিতে প্রফেসর সালার খান আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ঢাকার সুদর্শন পথতরুর ইতিবৃত্ত 'শ্যামলী নিসর্গ' (১৯৬৩-৬৫) লেখার সময়ও তার অকুণ্ঠ সহায়তা পেয়েছি। মনে পড়ে, বর্তমান দোয়েল চত্বরের টেবেবুইয়া (*Tabebuia triphylla*) গাছটি শনাক্ত করতে তাঁকে অনেক বইপত্র ঘাঁটতে হয়েছিল। গাছটি সম্ভবত ঢাকার একমাত্র প্রজাতি, এখন আর নেই। সুনামগঞ্জের বিলাঞ্চল থেকে আনা আমার সংগ্রহে একটি দুষ্পাপ্য প্রজাতি (*Ludwiga sepens*) পেয়ে দারুণ খুশি হয়েছিলেন। আমাকে সর্বদাই এই ধরনের গাছপালা সংগ্রহে উৎসাহিত করতেন। মস্কো চলে না গেলে (১৯৭৪) হয়ত আমি তাঁর 'বোটানিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ' প্রকল্পে কাজ করতাম।

সালার খান বাংলাদেশের সপুষ্পক উদ্ভিদ সম্ভার নিয়ে আমৃত্যু কাজ করে আমাদের জন্য এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁকে বাংলাদেশের এই বর্গের উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাসতত্ত্বের পিতৃপুরুষও বলা যায়। তাঁর বহু গবেষণাপত্রের মধ্যে আছে নতুন প্রজাতি ও ভ্যারাইটি সম্পর্কিত ১৯ ও অন্যান্য

www.pathagar.com

বিষয়ক দেড়শতাধিক মৌলিক নিবন্ধ। তিনি ছিলেন ইউফোর্বিয়া (মনসাসিজ) ও অ্যারিস্টলোকিয়া (হংসলতা) বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ এবং লিনিয়ান সোসাইটি ও আইইউসিএন সহ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সমিতির সম্মানিত ফেলো *Aquatic Angiosperms of Bangladesh* (1987) ও *Genctic Resources of Bangladesh* (1992) গ্রন্থদ্বয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তাঁর সম্পাদিক *Flora a Bangladesh* গ্রন্থলহরীর ৪৭ খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি *Handbook on the Flora of Bangladesh* ও *Trees of Dhaka* বইদুটি শেষ করে যেতে পারেন নি। আশা করি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় হার্বেরিয়ামে কর্মরত তাঁর সুযোগ্য উত্তরসুরিরা কাজগুলো সম্পূর্ণ করবেন।

শুরুতেই বলেছিলাম বিজ্ঞানীরা নিজ কাজের বিশেষ চারিত্রের দরুন প্রায় সর্বদাই সমাজের অন্তরাবর্তী থাকেন। উন্নত দেশে ব্যাপারটি ততটা নেতিবাচক এজন্য নয় যে, সেখানে বিজ্ঞানী সমাজের পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত এবং সামাজিক সচেতনতাও অনেক বেশি ব্যাপক ও নিবিড়। কিন্তু আমাদের দেশের পরিস্থিতি স্পষ্টতই ভিন্নতর। বিজ্ঞান আমাদের সমাজে সেভাবে আত্তীভূত না হওয়ায় বিজ্ঞানীরা এখানে অনেকটাই অ্যালিনেটেড আর সেটা বিজ্ঞান ও সমাজ উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। তাই সালার খানের মতো নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানসাধকরা যাতে স্মৃতিচ্যুত না হন সেজন্য আমাদের সবারই সচেতন ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। অবশ্য ইতিমধ্যেই তেমন শুভসূচনা ঘটেছে, তাঁর জীবদ্দশায়ই উদ্ভিদবিদরা চট্টগ্রামের একটি নতুন বাঁশপ্রজাতির নামকরণ করেছেন *Bambusa salarkhanii.*

www.pathagar.com

অধ্যাপক ইসলাম : বন্ধু ও শিক্ষক
(১৯২৮-২০০৬)

এমনটি কখনও ঘটে, কোন আকস্মিক প্রাপ্তি জীবনের গোটা গতিপথটাই বদলে দেয়। প্রখ্যাত উদ্ভিদবিদ ডালটন হুকারের পিতা জ্যাকসন হুকার ছিলেন পতঙ্গ ও বিহঙ্গে আকৃষ্ট, হঠাৎ করেই পেলেন নতুন প্রজাতির একটি মস– *বুক্সবুমিয়া অ্যাফিলা* আর সেটাই তাকে বানাল উদ্ভিদবিদ, হলেন এই শাস্ত্রের নামী অধ্যাপক। অনেকদিন পড়ালেন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মস নিয়ে লিখলেন কয়েকখণ্ড বইও। এতোটাই নাম করলেন যে ডাক পড়ল লন্ডনে কিউ উদ্যান গড়তে, বিশ্বখ্যাতি জুটল ওই উদ্যানের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে। অধ্যাপক এ. কে. এম. নূরুল ইসলামের শৈবালবিদ হওয়ার পেছনে কি এমন কোন ঘটনা ছিল? আজ তা আর জানার উপায় নেই। শৈবাল গবেষণায় বার্ধক্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই আত্মজীবনী রচনা শুরু করেও শেষ পর্যন্ত এগোননি। তবে এ ব্যাপারে সামান্য তথ্য আছে তাঁর সম্পাদিত *Two conturies of plant studies in Bangladesh and Adjacent Regions* গ্রন্থে : 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা অনুষদের তৎকালীন (১৯৫১-৫৪) অধ্যক্ষ গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদারের জোরাল উপদেশে ইসলাম (অর্থাৎ নূরুল ইসলাম) ১৯৫২ সালে শৈবাল সমীক্ষাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। বলা যায়, গিরিজাপ্রসন্নই এক্ষেত্রে তাঁর জীবনের এই গতিপথের নির্ধারক ছিলেন এবং বলা বাহুল্য, তিনি কোনই ভুল করেননি। ইসলাম এ পথেই একদিন বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। ইসলাম ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা বিভাগে প্রভাষক নিযুক্ত হন এবং তাঁর প্রথম গবেষণা-নিবন্ধ (*Some Subaerial Green Algae from East Pakistan*) একটি বিদেশি বিজ্ঞান সাময়িকীতে বেরয় ১৯৬০ সালে, মাঝখানে তিন বছর কাটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ-ডি গবেষণায়, অর্থাৎ মধ্যবর্তী পাঁচ বছর যায় শৈবাল সমীক্ষার প্রস্তুতিতে। এ সময় নিবন্ধ রচনার মতো কোনো শৈবাল এদেশে খুঁজে পাননি তা বিশ্বাস্য নয়। আসলে একজন টেক্সোনমিস্ট বা শ্রেণীবিন্যাসবিদ আপন বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেই যেমন অতিসতর্ক হন, তিনিও ছিলেন তাই আর সেটাই ছিল তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি। পরবর্তীকালে যারা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন তারা সকলেই তা লক্ষ করেছেন। এক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি, প্রায় এক যুগ।

www.pathagar.com

অধ্যাপক ইসলামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ১৯৫৫ সালে। গিয়েছিলেন উচ্চ-মাধ্যমিক জীববিদ্যার প্রাকটিক্যাল পরীক্ষায় এক্সটারনাল হয়ে আর আমি সেখানে ডেমনেস্ট্রেটর। ক'দিন একত্রে কাটে। প্রতি সন্ধ্যায় বেড়াতে যেতাম বেল্‌স পার্কে, গল্প হতো এবং এভাবেই ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। পরের বছর তাঁর বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর প্রথম পর্বের ক্লাসে আমাকে দেখে অবাক হন। সহপাঠীদের তুলনায় আমি বয়স্কতর। সবকিছু মিলিয়ে অধ্যাপক ইসলামের সঙ্গে এক অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। না-বন্ধু, না-ছাত্র কিংবা দুটোরই মিশেল। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও কোনোদিন 'তুমি' বলেননি আর সেটাই অটুট রেখেছিলেন আজীবন। ১৯৭৫ সালে তিনি আমেরিকায় না গেলে এমএসসি'র দ্বিতীয় পর্বে তাঁর তত্ত্বাবধানেই আমি শৈবাল নিয়ে কাজ করতাম। তবে সেই ভবিতব্য এড়ান যায়নি। ১৯৫৮ সালে এমএসসি শেষ করে আমি আবার বরিশালে ফিরি আগের কলেজে, কাজ করি ১৯৬২ পর্যন্ত, তারপর ঢাকায় এসে যোগ দিই নটরডেম কলেজে। ইতিমধ্যে নানা বিষয়ে গবেষণার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৬৪ সালে অধ্যাপক ইসলামের শরণাপন্ন হই, তিনি সাদরে আমাকে গ্রহণ করেন এবং দেশের জলমগ্ন চাক্ষুষ শৈবাল ক্যারোফাইটা নিয়ে কাজ করতে বলেন। এই কাজ চলেছিল ১৯৭৪ সালের আগস্টে, আমার মস্কো যাওয়ার পূর্বাবধি। এ সময় তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ ঘটে। বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনে বিভিন্ন সময়ে তিনি বড়ই কষ্টভোগ করতেন। অধ্যাপক ইসলামকে অনুপ্রেরণা যোগানোর আশায় আমার প্রথম বই *জীবনের শেষ নেই* তাঁকে উৎসর্গ করি। উৎসর্গপত্রে ছিল তাঁর চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লাগসই একটি পঙ্‌ক্তি – *কত না আজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু রয়ে গেল অগোচরে।* কিন্তু বৃথা। বইটি বেরয় ১৯৭৯ সালে যখন তাঁর সাহায্যের আর কোন প্রয়োজন ছিল না, ততোদিনে নিজেই প্রফেসর, বিভাগের দায়দায়িত্বের ভার অনেকটাই তাঁর হাতে। কাজ করতাম নটেরডেম কলেজে ফাদার টিমের ল্যাবে, ছুটির দিনে প্রসেফর ইসলামের বাসায়, সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি খাওয়া-দাওয়া ওখানেই। আদর্শ এক গুরুগৃহ, যেমন কর্তা তেমনই গিন্নি। এই চলছে বছরের পর বছর। মনে পড়ত উনিশ-শতকী ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানচর্চার কথা, শিক্ষকরা ছাত্রদের শুধু জ্ঞানই নয়, অতি মূল্যবান সঙ্গও দিতেন, ছাত্ররা শিক্ষক-পরিবারের স্বজন হয়ে উঠত। অধ্যাপক ইসলাম সেভাবেই এ-যুগেও আমেরিকায় তাঁর থিসিস তত্ত্বাবধায়ক বিশ্বখ্যাত শৈবালবিদ অধ্যাপক প্রেস্‌কটের পরিবারের আপনজন হয়ে ওঠেন। বিদায়বেলায় প্রেসকটগিন্নি কেঁদেকেটে অস্থির, কেবলই বলছেন, 'চলেই যদি যাবে তবে এসেছিলে কেন?' বিমানবন্দরে যাননি ইসলামের চলে যাওয়া দেখা অসহ্য লাগবে

www.pathagar.com

বলে। স্যার তাঁর কিছু কবিতার পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলোর একটি সংকলন ছাপিয়ে তাঁকে উপহার হিসেবে ফেরৎ পাঠান।

আমাদের যৌথ-গবেষণার প্রথম নিবন্ধ (*The Characeae of East Pakistan 1 Chara and Lycnothalmus*) বেরয় এশিয়াটিক সোসাইটির বিজ্ঞান জার্নালে ১৯৬৮ সালে। ১৯৭৪ সালে আমি মস্কো চলে যাই, 'প্রগতি প্রকাশন' সংস্থায় অনুবাদক হিসেবে। যাওয়ার আগে সংগৃহীত সব নমুনা এবং সেগুলোর অসম্পূর্ণ বর্ণনা ও আঁকা কিছু ছবি স্যারের কাছে রেখে যাই। ভাবিনি কোনোদিন প্রকাশিত হবে। অথচ সেই অসম্ভবও সম্ভব হল আশাতীত দ্রুত। ১৯৭৬ সালে মস্কোয় আমার ঠিকানায় পৌছলো একটি মোটা খাম। খুলে দেখি আমাদের যৌথ কাজের দ্বিতীয় পর্ব (*The characeae of Bangladesh* ll, The genus *Nitella*), বেরিয়েছে আবারও এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ বিজ্ঞান জার্নালে। সেই আনন্দ বর্ণনাতীত। তারপর বহু প্রবন্ধ ও বই লিখেছি, আনন্দলাভ ঘটেছে; কিন্তু কোনোটিই এর সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই ঋণ কি পরিশোধ্য? জীবনের উপান্তে পৌছে ওই গবেষণাপত্রগুলো দেখলে স্মৃতিভারাক্রান্ত হই, মনে পড়ে সংগ্রহকালীন কতো বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা, অপূর্ব সব নিসর্গশোভার কথা এবং সেইসঙ্গে অধ্যাপক ইসলামকেও। তিনি নাই আজও বিশ্বাস হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে ১৯৯২ সালে চাকরি হারাই, কিছুদিন মস্কোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস স্কুলে শিক্ষকতা করি এবং শেষে ১৯৯৫ সালে দেশে ফিরি। ক্যারোফাইটার অসম্পূর্ণ কাজটি শেষ করার তাগিদ অনুভব করি। সেই সময় রংপুর, দিনাজপুর ও সুন্দরবন সংগ্রহ থেকে বাদ পড়েছিল। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ছিল প্রতিকূল, গ্রিনকার্ডের আশায় প্রতি বছর মস্কো থাকতে হতো কয়েক মাস। অধ্যাপক ইসলাম তখন উত্তরাবাসী, দেখা হত ডিপার্টমেন্টে, সেইসঙ্গে গল্প ও নানা পরিকল্পনা, নিয়ে যেতেন বিভিন্ন বিজ্ঞানসভায়, তখনও তিনি যুবকের মতোই উদ্যমী ও কর্মঠ। আমাদের বোটানিক গার্ডেনের বেহাল অবস্থার প্রতি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে একটি দৈনিকের সাহিত্যপাতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বোটানিক গার্ডেন এবং সেগুলোর কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নিলে অধ্যাপক ইসলামও একটি প্রবন্ধ লেখেন। বাংলাও খুব ভাল লিখতেন। স্কুলজীবনে স্থানীয় এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতায় কবিতার জন্য পুরস্কৃত হন। সেই প্রশংসাপত্র আমাকে একবার দেখান, তাতে স্বনামখ্যাত বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর ছিল। মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় বৃক্ষ ও পরিবেশ সংখ্যায় একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। বাংলা একাডেমী একসময় তার লেখা বাংলাদেশের গাছগাছালি নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেছিল। তাছাড়াও ছিলেন বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ৫-খণ্ডের 'বিজ্ঞান বিশ্বকোষ' গ্রন্থমালার জীববিদ্যা অংশের সম্পাদক। কাজটি এদেশে কত

www.pathagar.com

কঠিন ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না। আমার লেখা *হিমালয়ের উদ্ভিদরাজ্যে ড্যালটন হুকার* (২০০৪), ছিল হুকারের *হিমালয়ান জার্নাল* বইটির সংক্ষিপ্ত পুনর্কথন। এটি পড়ে অধ্যাপক ইসলাম বাংলাদেশ জাতীয় হার্বেরিয়ামে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন, নিজেই শ্রোতাসমাগমের জন্য প্রচার চালান, ফলত হার্বেরিয়ামের হলঘরে তিলধারণের ঠাঁই ছিল না। সভায় সমন্বয়কারীর দায়িত্বও পালন করেন। সবকিছু দেখে আমার মনে হচ্ছিল উনি বাংলাদেশের মানুষ নন, টাইমমেশিনের কারসাজিতে উনিশ শতকের ইংল্যান্ডের দলছুট এক বিজ্ঞানী কিছু সময়ের জন্য এখানে হাজির হয়েছেন। এইসঙ্গে এও মনে পড়ে বিভাগীয় প্রধানের আরও অপ্রিয়ভাজন হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষা করে এই মানুষটিই ১৯৬৪ সালে রোজ-কামলা মাস্টার রোলের মালীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হওয়ার ব্যবস্থা পাকা করেন এবং ১৯৭০ সালে বিভাগীয় রেওয়াজ ভেঙে দু'জন মহিলা শিক্ষকের নিয়োগ দেন। একজন নির্বিবাদী নিবিষ্ট বিজ্ঞান-গবেষকের এমন ঝুঁকি গ্রহণের দুঃসাহস তাঁকে আমাদের সামনে একটি অনুকরণীয় মডেল হিসেবেই দাঁড় করায়।

অধ্যাপক ইসলাম উদ্যানপ্রেমীও ছিলেন, গাছপালা লাগাতে ভালোবাসতেন আর সেজন্য এদেশে অনিবার্য যে দুঃখ তাও ভোগ করেছেন। উদয়ন বিদ্যালয়ের লাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় তাদের ফ্ল্যাটবাড়ির নিচের খালি জায়গায় তিনি একটি বাগান করেন – মাঝখানে লন, চারপাশে গাছগাছালি। আমিও তার সঙ্গে তাতে কোন কোন দিন পানি ছিটিয়েছি। একবার বিদেশ থেকে ফিরে দেখেন বাগানটি আর নেই, ওখানে ফুটবলের মাঠ, আছে সাক্ষী হয়ে এক কিনারে দুটি নাগেশ্বর গাছ। বড়ই আঘাত পান মনে। আমাকে মস্কোয় এক দীর্ঘ চিঠিতে সেই বেদনার কথা জানান। অবসরজীবনের আশ্রয় হিসেবে উত্তরায় জসিম উদ্দিন সড়কে একটি ছোট বাড়ি বানান, জড়িয়ে পড়েন নতুন আবাসিক এলাকার বৃক্ষায়নকর্মে, অনেকগুলো গাছ লাগান আর সবগুলোই শেষে কাটা পড়ে উন্নয়নের কুড়ালে। প্রায় বৃক্ষহীন কার্জন হল চত্বরকেও বৃক্ষময় করে তুলেছিলেন, সেগুলো অবশ্য কাটা হয়নি, ছাঁটা হয়েছে, তাতে যে ধরনের উদ্যানশোভার কথা ভেবেছিলেন তা আর হয়ে ওঠেনি।

বিজ্ঞানী হিসেবে অধ্যাপক ইসলামের মূল্যায়ন থেকে বিরত থাকলাম, অনুপুঙ্খ তথ্যাদি রয়েছে তাঁর জীবনপঞ্জিতে। কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে – কী কাজে লাগে শৈবাল! শুনে অবাক হয়েছি, কেননা তারাও বিজ্ঞানী। বলেছি – শুদ্ধ গণিত বা তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার মতো কাজে না-লাগলেই ক্ষতি কি? বিজ্ঞানের কাজে না লাগার মতো বিষয় নিয়েও তো অনেক বিজ্ঞানী জীবনপাত করছেন। অধ্যাপক ইসলামের মৃত্যুর পর অদ্যাবধি কাগজে তাঁর

www.pathagar.com

সম্পর্কে কোন লেখা চোখে পড়েনি। আমাদের দেশে ক্লাসিক ধারার বিজ্ঞানীরা আজও অপাঙ্‌ক্তেয়, হোন তিনি বিজ্ঞান একাডেমির ফেলো, রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত, কিংবা জাতীয় অধ্যাপক।

বছর দুই আগে ডিপার্টমেন্টে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ক্লাসে চলেছেন। তখনও জাতীয় অধ্যাপক হননি, অনারারি প্রফেসর হিসেবে টিকে আছেন নিজ কর্মস্থলে, অনেকটা কোণঠাসা হয়ে। বললাম – 'অসুস্থ শরীরে ক্লাস নিতে ছুটছেন কেন?'

হেসে জবাব দিয়েছিলেন– 'এভাবেই কবরে যেতে চাই যে।' গেলেনও তাই। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই বিদায় নিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের দেশে জীববিজ্ঞানের একটি যুগের পরিসমাপ্তি ঘটল যখন বিজ্ঞানী ছিলেন বিষয়চিন্তাবিমুখ এবং আবিষ্কারের নেশায় আপন কর্মে নির্বিশেষ নিমজ্জিত, অধিনায়ক ও সাধকতুল্য। শৈবালের একটি গণ এবং দুই শতাধিক নতুন প্রজাতি ও ভ্যারাইটির আবিষ্কারক এই বিজ্ঞানীর শূন্যস্থান কি অচিরে পূর্ণ হবে? হবে না, যতোদিন এদেশে শিল্পসমৃদ্ধ একটি সুস্থিত ও সচ্ছল সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত না হবে, যা আধুনিক বিজ্ঞানী-প্রজন্ম সৃষ্টির এক জরুরি পূর্বশর্ত।

www.pathagar.com

মীজান, ক্ষমা করো

(১৯৩১-২০১১)

বাংলা বিশ্বকোষ রচনার স্বপ্ন ছিল তাঁর। আমাদের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়া প্রকাশিত হয়েছে ২০০৩ সালে। এই স্বপ্নের জন্মও অনেক আগে, স্বপ্নপূরণে সময় লাগে। মীজানের স্বপ্নটি আমি জানি, আরও আগের। মানবজীবনে স্বপ্ন থাকবেই, পূরণ দৈবাৎ। কোন কোন স্বপ্নপূরণ আবার শেষমুহূর্তে অর্থহীন হয়েও পড়ে। অভিধানপ্রণেতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে আসে। তাঁর জীবনী নিয়ে নির্মিত একটি চলচ্চিত্রের শেষদৃশ্য অনেকটা এরূপ : কুঁড়েঘরে জীর্ণ শয্যায় শুয়ে আছেন এক বৃদ্ধ, পাশে দাঁড়িয়ে বিধবা পুত্রবধূ। ঘরে আরও দুজন লোক, পুরোহিতের মতো সাজ, একজনের হাতে তাম্রথালি, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রির প্রশংসাপত্র, কিছু অর্থ, পাতা ও ফুল। অন্যজন বাংলাভাষায় এই বৃদ্ধের মূল্যবান অবদানের বয়ান উগ্‌রে চলেছেন অবিরাম। একসময় যাঁর উদ্দেশে এই স্বস্ত্যয়ন তিনি থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'বৌমা ওদের যেতে বলো, ওরা কী বলছে নিজেরাও জানে না।'

এমন ঘটনার কথা আমাদের দেশে ঘটেছে বলে শুনিনি। এভাবে সম্মানিত হওয়ার মতো দু-একজন আমাদের দেশেও অবশ্য ছিলেন। আমাদের সারস্বত সমাজ কোনোদিন মীজানুর রহমানের খোঁজ করেনি, যাঁর ওজন, আমি নিশ্চিত, কেবল স্বর্ণমানেই পরিমাপ্য।

মীজানের সঙ্গে যে-বয়সে আমার বন্ধুত্ব হল, তা ব্যতিক্রমী বটে। কীভাবে এটা সম্ভব? কৈশোরে গল্প-উপন্যাসের যেসব চরিত্র আমাকে মুগ্ধ করেছিল, হয়ত সেখানে কোথাও এমন একটি আর্কিটাইপ ছিল। রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটি (এবার ফিরাও মোরে) ওই সময় স্কুলে নিয়মিত আবৃত্তি করতে হতো সেখানেও এমন উপাদানের খোঁজ আছে : *সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শতকর্মে রত/তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো/মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ন তরুচ্ছায়ে/দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে/সারাদিন বাজাইলি বাঁশি।*

মীজান আমাকে এতোটাই অবিষ্ট করেছিলেন যে মস্কোয় থাকাকালে স্মৃতিকাতরতার মুহূর্তগুলোতে মাঝেমধ্যে তাঁকেও দেখতাম – রোগাপটকা একটি

www.pathagar.com

মানুষ শহরের পথে হেঁটে চলেছেন, হাওয়ায় উড়ছে সাদা চুল, ধ্বস্ত ও ক্লান্ত, মুখটি বিষণ্ন, হয়ত গিয়েছিলেন বাণিজ্যিক এলাকায় বিজ্ঞাপনের খোঁজে, জোটেনি কিছুই, উল্টো শুনতে হয়েছে নানা কটুকথা।

মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকার *বৃক্ষসংখ্যা* পরিকল্পনায় আমারও সামান্য ভূমিকা ছিল। তাঁকে কিছু লেখকের খোঁজ দিয়েছিলাম। লেখাসংগ্রহে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন প্রকৃতিপ্রেমীদের একটা গোটা জগৎ, বাদ পড়েন না শ্যামলী রমনার স্থপতি আর এল প্রাউডলকও, অনেকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন নিবিড় সখ্যে, খুঁজে পান উচ্ছিত আনন্দের আরেকটি উৎস, অন্তত কিছুদিনের জন্য নিসর্গ হয়ে ওঠে তাঁর ধ্যানজ্ঞান, তাই অনিবার্যভাবেই আসে *পক্ষীসংখ্যা*। কত রকমের লেখাই না সংগ্রহ করলেন এই অদম্য সম্পাদক, ভাবলে অবাক হতে হয়। মীজান কি সি পি স্নোর লেখা *টু কালচার* পড়েছিলেন? না পড়লেও বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সুষম সংশ্লেষ ঘটাতে তাঁর কোনোই অসুবিধা হয়নি। সর্বজ্ঞ ছাড়া কে পারে এমন কাজ করতে।

তাঁর পত্রিকার 'পক্ষীসংখ্যা' পড়ার স্মৃতি কোনোদিন ভোলার নয়। মস্কোয় বাহকসঙ্গে পাঠানো সংখ্যাটি 'কসমস' হোটেল থেকে উদ্ধার করে পাতালরেলের ভেদনখা স্টেশনে ঢুকি সন্ধ্যায়। এসব স্টেশন প্রাসাদ কক্ষতুল্য, ক্রিস্টাল বাতির আলোয় ঝলমলে। নিরালা এককোণে একটি আসন দখল করে পড়তে বসি। ট্রেনের কানফাটা আওয়াজও একসময় আর কানে পৌঁছায় না। আমি ডুবে যাই আরেক ভুবনে, স্বদেশের নিসর্গে শুরু হয় এক অদ্ভুত বিচরণ, পাখির কলকাকলি শুনি, হাওয়ায় দোলখাওয়া পাতার মর্মর ভেসে আসে, জননীর সুরেলা কণ্ঠের আবৃত্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, *কাঁঠালগাছে দেখছি দুটি হলদে পাখির ছানা/মায়ের মুখে খাচ্ছে আধার নাড়িয়ে দুটি ডানা।* কতক্ষণ এভাবে কাটে খেয়াল নেই। একসময় দেখি স্টেশন প্রায় ফাঁকা। সেদিন বাড়ি ফিরি অনেক রাতে স্বপ্নচালিতের মতো। মীজান পরে আরও কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা বের করেন। 'নদী সংখ্যা' ছিল অভিন্ন ধারাবাহিকতার ফল, কিন্তু দুই খণ্ডের 'গণিত সংখ্যা' বড়ই ব্যতিক্রমী। আমি চিরকালের গণিতভীতু, মীজানও ওই শাস্ত্রের মানুষ নন, তবু কীভাবে এই অসাধ্য সাধন হল, তা আজও আমার কাছে এক প্রহেলিকা হয়ে আছে।

শেষপর্যন্ত মীজানের দীর্ঘলালিত স্বপ্ন, বিশ্বকোষ রচনার সুযোগ আসে। ১০ খণ্ডের পরিকল্পনাও শেষ করেন। আমাকেও জড়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা আর হয়নি। আমি তখন এশিয়াটিক সোসাইটির বাংলাপিডিয়া প্রকল্পে কাজ করছিলাম। জানাশোনা কিছু লোক জুটিয়ে দিয়েছিলাম, তাতে কাজ ভালোই চলছিল। কিন্তু মীজান জানতেন না ভেতরে ভেতরে তিনি কতটা ক্লান্ত। উদম্য উৎসাহে অবশিষ্ট প্রাণশক্তি নিঙড়ে তাই ঢালতে লাগলেন আপন অভীষ্টে। কাজ এগোল, তবে বিষম ফল ফলতে দেরি হল না। বারবার অসুস্থ হতে লাগলেন। চিকিৎসার জন্য যেতে

www.pathagar.com

হল কলকাতায়। ফিরলেন কিছুটা সুস্থ হয়ে। আবার শুরু করলেন দিনভর-রাতভর কাজ। এভাবেই শেষ হল প্রথম খণ্ড। কিন্তু মুদ্রিত বইটি দেখার তর সইল না। হঠাৎ করেই চিরবিদায় নিলেন স্বপ্নতাড়িত এই মানুষটি। ভেবে অবাক হই, মাত্র এক বছরের মধ্যে আমার কলমে মীজানের স্মৃতিচারণ কতটা শীর্ণ ও ক্ষীণ হয়ে এসেছে! *এবার বুঝি ভোলার বেলা হলো*। হাসান হাফিজুর রহমানকেও আমরা ভুলে গেছি। মীজান, আমাদের ক্ষমা করো।

** মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক মীজানুর রহমান ২০০৬ সনের ২৬ জুন ৭৫ বছর বয়সে প্রয়াত হন।*

www.pathagar.com

অধ্যাপকের স্মরণসভা

(১৯৩১-২০১১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী অধ্যাপক, পক্ষী ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের পুরোধা, প্রকৃতিবিদ জাকের হোসেনের মৃত্যুসংবাদ কাগজে দেখেছি, তাঁকে নিয়ে কোনো আলোচনা চোখে পড়েনি। সংস্কৃতিজগতে বিজ্ঞানের অবস্থান অন্তরালবর্তী, সেখানে চমক ঘটে দৈবাৎ, বিষয়গুলোও দুর্বোধ্য, তাই সংবাদমাধ্যমের আগ্রহ তাতে কম এবং এই পারক্য বৈশ্বিক। গত ১৫ অক্টোবর বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত স্মরণসভায় কোনো সাংবাদিক ছিলেন না, শ্রোতার উপস্থিতিও নগণ্য, কিন্তু জাকের হোসেনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও দীর্ঘদিনের বন্ধুরা সভাগৃহের এই শূন্যতা অগ্রাহ্য করে দীর্ঘ বক্তৃতা করেছেন, আবেগাপ্লুত হয়ে কেউ কেউ কেঁদেও ফেলেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালে (১৯৫৬-৫৮) এই অধ্যাপকের কথা আলোচিত হতে শুনেছি – পরণে হাফপ্যান্ট, মাথায় টুপি, গলায় ঝোলানো ক্যামেরা, হাতে বাইনোকুলার নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান ঢাকা শহরে, দেশের দূর-দূরান্তর। এ ধরনের ছন্নছাড়া অধ্যাপক আমাদের শিক্ষাঙ্গনে, সমাজে নতুন, সেজন্যই এই কৌতুকী বাকচর্চা। পূর্ববঙ্গে পাখি দেখা তখনো চালু হয়নি। বন্যপ্রাণীর খোঁজখবর অনেক পরবর্তী ঘটনা। অধ্যাপক হোসেন অক্সফোর্ডে গবেষণা করেছেন, ইংল্যান্ড ও দূরদেশে সংগ্রহ ও সন্ধান অভিযানে গেছেন, নিসর্গীস্বভাব অর্জন করেছেন, তাই দেশে ফিরে আমাদের সামাজিক রক্ষণশীলতা আর মান্য করেননি।

কলেজে শিক্ষকতা ও দীর্ঘ বিদেশবাসের দরুন তাঁর সঙ্গে আলোচনা ও মতবিনিময়ের কোনো সুযোগ আমার ছিল না। আমাদের দুজনের ছাত্র, পরে বন্য প্রাণীবিশারদ রেজা খানের সঙ্গে দীর্ঘ ঘনিষ্ঠতার সূত্রে জাকের হোসেন সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে পেরেছি। তাঁর কিছু কিছু লেখাও পড়েছি এবং সভা-সমিতিতে আমাদের একাধিকবার দেখাও হয়েছে। মৃত্যুর অল্প দিন আগে আমাদের শেষ দেখা প্রথম আলোর প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের আলোচনা সভায়। ৮০ বছর বয়সেও তাঁকে অদম্য মনে হয়েছে, আলাপে তরুণদের সমকক্ষ, অনেকক্ষণ বক্তৃতাও করলেন। সমমতাদর্শী ও সহযাত্রীদের পারস্পরিক বন্ধন অদৃশ্য সূত্রেই ঘটে। জাকের হোসেনকে সর্বদাই আপনজন মনে হয়েছে, যেন আমরা অনেক দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা আসলে প্রায় সমবয়স্ক।

জাকের হোসেন যখন প্রকৃতিচর্চায় ব্রতী হয়েছেন, বাংলাদেশের নিসর্গ পরিস্থিতি তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন। লোকসংখ্যা পাঁচ কোটি, বনভূমি, জলাভূমি অটুট, নদীগুলো

www.pathagar.com

স্বচ্ছসলিলা, কলকারখানার সংখ্যা নগন্য, পরিব্যাপ্ত পরিবহন অনুপস্থিত, ঢাকা শহর তেজগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত। একাত্তরের পর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে উন্নয়ন শুরু হলে মাত্র ৩০ বছরে ভূ-প্রাকৃতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং আমাদের পরিবেশ-সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। অথচ পঞ্চাশের শেষার্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার ক্লাসে ইকোলজি পড়েছি, ইকোলজিক্যাল ক্রাইসিসের কথা শুনিনি, পরিবেশবিদ্যা নামের বিষয়টিও অজানাই ছিল।

পশ্চিমেও এসব বিষয় ৬০ বছর আগে ততটা গুরুত্ব পায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উন্নত প্রযুক্তি করায়ত্ত হওয়ার ফলে শিল্পোন্নয়নের ত্বরণ গোটা পৃথিবীর দৃশ্যপট পাল্টে দেয়, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটে এবং একই সঙ্গে প্রকৃতি ও পরিবেশের মারাত্মক অবক্ষয়। উন্নয়ন ও দূষণ সন্ধিবদ্ধ বাস্তবতা, যা এড়ানো মানুষের সাধ্যাতীত। জাকের হোসেন জীবনসায়াহ্নে যে বাংলাদেশ দেখেছেন, তা যৌবনে কল্পনাও করেননি। বাংলাদেশের অভিন্ন আয়তনের ভূখণ্ডে জনসংখ্যা এখন ১৬ কোটি, ঢাকায় দেড় কোটি, বনভূমি কমে সাত শতাংশ, জলাভূমি দ্রুত ভরাট হচ্ছে, নদীগুলো দূষিত, জীববৈচিত্র্যের পরিস্থিতি ভয়ংকর, কলকারখানা অনেক ও যত্রতত্র যাতায়াতের উন্নতি অভূতপূর্ব, দূষণ ব্যাপক এবং একই সঙ্গে বিত্তবান বহু লোক, সর্বসাধারণের জীবনযাত্রার মানেরও উন্নতি ঘটেছে। এ অবস্থায় একজন প্রকৃতিপ্রেমীর অসহায়ত্ব সহজবোধ্য।

অধ্যাপক জাকের হোসেন পাখি ও বন্যজন্তুদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন বিজ্ঞান ও ভালোবাসার তাগিদে এবং তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রী ও জনসাধরণকে সে কথাই বলেছেন। কিন্তু আজ আর এটুকু যথেষ্ট নয়। তত্তবকথার পরিবর্তে সংগ্রাম সমাগত। প্রকৃতিসচেতন নতুন প্রজন্ম ভালোই জানে, সমস্যাটির মূল গোটা সভ্যতার গভীরে গ্রোথিত। এতে আছে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, জনমনস্তত্ত্ব, এমনকি মানববিবর্তন ও বংশগতি। জাকের হোসেনের ঐতিহ্য যাঁদের ওপর বর্তেছে, তাঁরা অতঃপর তাঁদের কর্মপরিসর আশা করি অনুধাবন করতে পারছেন। সাসটেইনেবল বা পরিপোষক উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি সভ্যতার বিশাল যান্ত্রিক কাঠামোর যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে অপারগ, তা সহজবোধ্য।

তাহলে কী ঘটবে? যন্ত্রসভ্যতা কি আপন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে, নাকি প্রকৃতি কোনো মহাপ্রলয়ে এই সভ্যতাকে ধ্বংস করবে? আমরা সঠিক কিছুই জানি না। জানি শুধু এটুকু যে আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই। আমাদের শেষ ভরসা—মানুষের শুভবুদ্ধির নিশ্চিত জয়। পৃথিবীর সকল কালের সকল মনীষী তাঁদের মহৎ কর্মকাণ্ডের উপকরণ দিয়ে এই ভরসাস্থল নির্মাণ করে গেছেন। আশা করি, মানুষ 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' থেকে অর্জিত তার বংশানুসৃত স্বার্থপরতা ও প্রতিযোগিতার প্রবণতাগুলো একদিন বর্জন করতে পারবে।

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com